ভালেরিয়া মুখিনা

ব্যক্তিত্বের উন্মেষ

প্রগতি প্রকাশন

ভালেরিয়া মুখিনা

ব্যক্তিত্বের উন্মেষ

ভালেরিয়া মুখিনা

ব্যক্তিত্বের উন্মেষ

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: প্রফুল্ল রায়

В. Мухина

РОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

На языке бенгали

V. Mukhina

GROWING UP HUMAN

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

M $\frac{4305000000-306}{014(01)-87}$ 273—87

সূচি

লেখিকার কথা

মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রারম্ভিক পর্ব সম্পর্কে অনেক বই লেখা হয়েছে, তবুও মানবজীবনের এই পর্যায়টির বিষয়ে আগ্রহ এখনও আগেকার মতোই প্রবল। বিজ্ঞানের কাছে আগ্রহটা এই কারণে যে জীবনের প্রথম বছরগুলিতেই মানুষের মনঃপ্রকৃতি গড়ে ওঠে বিশেষ নিবিড়তায়। বিজ্ঞানের প্রয়াস হল বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতির পরিস্থিতির মধ্যে শিশুর বিকাশের মূল নিয়মগুলি প্রকাশ করা, এবং শিশুদের লালন করার একটা ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য এই নিয়মগুলিকে ব্যবহার করা। বাবা-মার কাছে এই আগ্রহটা জাগে তাঁদের বাড়ন্ত শিশুসন্তানের প্রতি ভালোবাসা থেকে: সে সারা জীবন সুখী, সুস্থ আর সফল হোক, এটাই তাঁরা চান। তাঁদের সন্তান যাতে শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য বড়রা সর্বসাধ্য করতে চেষ্টা করেন। তাই নিজেদের কাজকর্মে পথনির্দেশের জন্য, শিশুর প্রায়শই আপাত ব্যাখ্যাহীন আচরণ, তার ভবিষ্যৎ বিকাশ বুঝতে সাহায্য পাওয়ার জন্য, অবাঞ্ছিত স্বভাববৈশিষ্ট্য যাতে তার মধ্যে

দেখা না দেয় সেজন্য অনেকেই শৈশব-বিষয়ক বিশেষ গ্রন্থাদির শরণাপন্ন হন।

লেখিকা হিসেবে, আমি শিশুর মনঃপ্রকৃতির বিকাশ সম্পর্কে আমার পেশাগত অভিমত তথা মা হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দুটোই জানাতে চাই। এই বইয়ের 'নায়কদ্বয়' হল আমার দুই ছেলে কিরিল আর আন্দ্রেই, জন্ম থেকে ছ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এই বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তারা দুজনেই এখন বড় হয়ে গেছে— কিরিল একজন মনোবিদ্ আর আন্দ্রেই জীববিজ্ঞানী। একেবারে একইভাবে লালিত হলেও, আজ তারা দুজনে একেবারে আলাদা মানুষ। সেটা এই জন্য নয় যে তারা দুজনে সদৃশ যমজ নয়, বরং এই কারণে যে দুজনেই শৈশবে চারপাশের জীবন সম্পর্কে নিজের অবস্থান আর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছে। একটি শিশু প্রথমত ও প্রধানত এমন একটি সত্তা যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত ও উন্নত হয়, এবং সেই হেতু সে অনন্য। একজন পেশাদার মনোবিদ্ ও আগ্রহী প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমি এই মত পোষণ করি যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুধু সহজাত চারিত্রবৈশিষ্ট্য দিয়ে (আলোচ্য বিষয়টি যদি হয় সুস্থ একটি মন) আর শুধু সামাজিক অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, সেটা নির্ধারিত হয় শিশুটি খুব ছোট থাকার অবস্থাতেই মনুষ্যজগৎ আর বস্তুজগৎ সম্পর্কে গড়ে ওঠা সবিশেষ মনোভাব দিয়ে। প্রতিটি শিশুই তার নিজের ও চারপাশের লোকেদের সম্পর্কে তার নিজস্ব মত স্থির

করে নেয় এবং তার অনুসরণ শুরু করে। স্নেহ-ভালোবাসা আর শাসনের একই রকম পরিবেশে পরিবেষ্টিত দুটি শিশুর ক্রমান্বিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জনের পরিচয় এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। শিশুর আন্তর 'আমি'-র কীভাবে প্রভেদন ঘটে, তার নিজের সম্পর্কে চৈতন্য কীভাবে বিকাশলাভ করে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন করে, পাঠক তা লক্ষ করতে সমর্থ হবেন।

এই বইটি সাধারণভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন সম্পর্কিত নয়, বরং **একটি শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের জন্ম** সম্পর্কে। ব্যক্তিত্ব আকারলাভ করে পৃথিবীর — ব্যবহারিক কার্যকলাপ ও মেলামেশার সঙ্গে ব্যক্তির দ্বিবিধ সম্পর্কের ফলে। আর এই সম্পর্কের বিকাশের জন্য দরকার হয় দীর্ঘ সময়।

প্রথম পর্যায়ে, ব্যক্তিত্বের গঠন একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া, চৈতন্যের দ্বারা তা চালিত নয়। এই পর্যায়টিই আত্ম-সচেতন ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় জন্মের ভিত্তি স্থাপন করে। একজন মানুষের ক্রিয়ার বহুবিধ প্রেষণা ও সমন্বয় যখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তখনই আত্মপ্রকাশ করে সচেতন ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় জন্ম জড়িত জীবন সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি আর প্রাতিস্বিক ধ্যানধারণার একটা সুসংলগ্ন ব্যবস্থা নির্মাণের সঙ্গে।

আমরা মনে করি, ব্যক্তিত্বের দুই-পর্যায়গত জন্মের ধারণাটা শুধু বয়ঃগোষ্ঠীমূলক মনস্তত্ত্বের পক্ষেই নয়, সামগ্রিকভাবে পদ্ধতিতত্ত্বের পক্ষেও ফলপ্রসূ। এই ধারণাটা লালন ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নির্ধারণ করে, এবং যে

ধরনের স্বভাববৈশিষ্ট্য শিশুর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের বিষয়গত বাস্তবতা গড়ে তোলে সেই স্বভাববৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ও এতে প্রয়োজন হয়।

ব্যক্তিত্বের প্রথম জন্ম শিশুর মানসিক জীবনে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উপর নির্ভর করে। প্রারম্ভে, শিশু নিজেকে আলাদা করে বেছে নেয় একজন ব্যক্তি হিসেবে। কাঠামোটির ভিত্তিতে রয়েছে একটি বিশেষ নামের ধারক হিসেবে (নিজের নাম, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম 'আমি' এবং দৈহিক চেহারা) নিজেকে পৃথক করে চেনা। মনস্তাত্ত্বিক 'আমি'-ভাবমূর্তিটা রূপ পরিগ্রহ করে লোকজনের সম্পর্কে **ভাবাবেগগত** (ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক) মনোভাব থেকে, এবং শুরু হয় শিশুর নিজের **ইচ্ছার** অভিব্যক্তি দিয়ে ('আমি চাই', 'আমি নিজে'), যেটা দেখা দেয় শিশুর একটা বিশেষ চাহিদা হিসেবে। **স্বীকৃতির দাবি** দেখা দেয় শিগগিরই, আর তার বিকাশের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়প্রকার প্রবণতাই থাকে। এই সময়েই গড়ে উঠতে থাকে **ছেলে-মেয়ে বোধ** এবং এটাও ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিশেষ লক্ষণগুলি নির্ধারণ করে।

কালের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে নিজের সম্পর্কে বোধের উন্মেষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশু একবার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে নিজেকে দেখতে শুরু করে নতুনভাবে: তার নিজের বিকাশের দিগন্ত তার সামনে অনাবৃত হয়ে যায়।

এই বইটিতে শিশুর বিকাশের অনেকগুলি নিয়ম সম্পর্কে বহু কথা বলা হবে, যাতে প্রাপ্তবয়স্করা —

শিক্ষাদাতারা ও পিতামাতারা — শিশুর বয়ঃগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যগুলি গণ্য করে কাজ করতে পারেন। আমি বিশেষভাবে জোর দিয়েছি শিশুর প্রথম সামাজিক চাহিদার উপরে। এটা সর্বোপরি ভাবাবেগগত ক্ষুধা — ভালোবাসা পাওয়ার চাহিদা, ভাবাবেগগত উৎসাহলাভের চাহিদা। এই চাহিদা কীভাবে পূরণ হয় তদনুযায়ী শিশু লোকজনকে হয় বিশ্বাস করবে না হয় অবিশ্বাস করবে, সেটা পূর্বনিরূপণ করবে ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিত্ব কীভাবে বিকশিত হবে। দ্বিতীয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল স্বীকৃতির চাহিদা। এই চাহিদা পূরণ বা তার অচরিতার্থতাও শিশু কীভাবে বিকাশলাভ করবে তা নির্ধারণ করে। এই সমস্ত ও অন্য আরও অনেক চাহিদার উদ্ভবের ফলে ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয়প্রকার স্বভাববৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে। এই বইটিতে উভয়েরই উদ্ভব নিয়ামক নিয়মগুলি বিচার করা হয়েছে।

বহু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই বিশুদ্ধ তত্ত্বের বিরোধী নন, তবে তাঁরা সাধারণত নির্দিষ্ট ব্যবহারিক পরামর্শই পেতে চাইবেন। তাই এই বইয়ে থাকবে প্রকৃত পরিস্থিতির এমন অনেক বিবরণ, শিশু আর তার বাবা-মার ক্ষেত্রে যে রকম পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।

ভালেরিয়া মুখিনা

প্রথম ভাগ

আদি-শৈশবে ও অতি শৈশবে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি

অধ্যায় ১। ব্যক্তি-উন্মেষের ক্ষেত্রে মনোগত বিকাশ নির্ধারক মূল নিয়মসমূহ

সোভিয়েত বয়ঃগোষ্ঠীমূলক মনস্তত্ত্বে মনোগত বিকাশের সাধারণ নিয়মগুলির ভিত্তি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব, যার বক্তব্য এই যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক শর্তগুলিই মানব চৈতন্যকে নির্ধারণ করে। সোভিয়েত বয়ঃগোষ্ঠীমূলক মনস্তত্ত্ব এই মার্কসীয় নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে মনোগত বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা সামাজিকভাবে অর্জিত, এবং ব্যক্তির সংস্কৃতি আত্তীকরণ এক সক্রিয় প্রক্রিয়া।

যাত্রাবিন্দুটি হল মনোগত বিকাশের **পূর্বশর্ত** ও **শর্তগুলি** আলাদা করে বেছে নেওয়া। বংশগত লক্ষণ, জীবসত্তার সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি (প্রথমত মস্তিষ্কের গড়ন ও ক্রিয়া) আর পরিণত-হয়ে-ওঠা প্রক্রিয়াগুলিকে মনে করা হয় মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের **পূর্বশর্ত**, আর শিশু যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে দেখতে পায় সেই পরিস্থিতিকে, তার সামাজিক অভিজ্ঞতা 'আত্তীকরণ' ও তার মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপকে মনে করা হয় মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের **শর্ত**

বলে, যেখানে ‘আত্তীকরণ’ ঘটে অপরের সঙ্গে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এবং প্রধান ক্রিয়াকলাপ ও বিশেষ শিক্ষার কালে।

শিশুর মনোগত বিকাশে জীববিদ্যাগত ও সামাজিক উপাদানগুলির ভূমিকা

শিশু মনস্তত্ত্ব শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে প্রভাবিত করার মতো সমস্ত পরিস্থিতিকে আবিষ্কার আর তালিকাবদ্ধ করার চেষ্টাই যে শুধু করে তা নয়, সেগুলির প্রভাব কোথা থেকে আসে এবং এইসব পরিস্থিতির ক্রিয়ায় শিশু কীভাবে বিকাশের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে এগিয়ে যায় তা নির্ণয় করারও চেষ্টা করে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম যে কাজটি বিজ্ঞানের অবশ্যই করা দরকার তা হল যে-সমস্ত সাধারণ পূর্বশর্ত ও শর্ত প্রত্যেক শিশুকে একটি মানুষ করে তোলে, এবং যেগুলি ছাড়া স্বাভাবিক বিকাশ অসম্ভব, সেগুলির গুরুত্ব নির্ণয় করা।

এ কথা প্রতিপন্ন হয়েছে যে শিশু জীবসত্তার গড়ন ও ক্রিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে। জন্মের মুহূর্ত থেকেই সে একটি মানবিক স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী এবং একটি মস্তিষ্কের অধিকারী, যে মস্তিষ্ক হোমো স্যাপিঅ্যানসের বৈশিষ্ট্যসূচক অত্যন্ত জটিল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের ইন্দ্রিয় হয়ে উঠতে সক্ষম।

জীবজগতে আমাদের নিকটতম ‘আত্মীয়’ হল নরাকার বানররা। তাদের অঙ্গভঙ্গি আর অনুকৃতি কখনও কখনও মানুষের অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিলে যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিম্পাঞ্জীদের বৈশিষ্ট্য হল তাদের অফুরন্ত কৌতূহল; তাদের হাতে যেসব জিনিস এসে পড়ে সেগুলিকে খুলে ফেলে, গুটিসুটি মেরে চলা কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে কিংবা মানুষের কাজকর্ম লক্ষ করে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। তাদের সবচেয়ে বিকাশপ্রাপ্ত ক্ষমতাগুলির একটি হল অনুকরণক্ষমতা। মানুষের অনুকরণ করে একটি বানর এক টুকরো কাপড় ভেজাতে পারে, সেটা নিংড়াতে পারে, এবং তা দিয়ে মেঝে মুছতে পারে। এই ক্রিয়ায় আসল ফলটা যে দেখা দেবে না, সেটা আলাদা ব্যাপার, কারণ ক্রিয়াটির শেষে ধুলোটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হয় মাত্র।

যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য চিন্তার দরকার এমন কিছু রীতিমত জটিল ব্যবহারিক কাজ শিম্পাঞ্জীদের দিয়ে করানো এবং তাদের দিয়ে সরলতম হাতিয়ারের মতো বস্তু ব্যবহার করানোর ব্যাপারে পরীক্ষানিরীক্ষায় অনেক বিজ্ঞানী সফল হয়েছেন। চেষ্টা আর ভুল করতে-করতে শেখার মধ্য দিয়ে শিম্পাঞ্জীরা অনেকগুলি বাক্স দিয়ে একটা পিরামিড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যাতে ছাত থেকে ঝোলানো কলার নাগাল পাওয়া যায়, একটা লাঠির বাড়ি মেরে কলাটা নামিয়ে আনতে শিখেছে, এমন কি দুটো ছোট-ছোট লাঠি জুড়ে একটা লম্বা লাঠি করতেও শিখেছে। যে বাক্সটির ভিতরে লোভনীয় কোনো জিনিস রাখা আছে, একটা উপযুক্ত আকারের (ত্রিভুজাকৃতি, বৃত্তাকার বা চৌকো ফলা-লাগানো একটি কাঠি) 'চাবি' ব্যবহার করে সেই বাক্সের তালা

খুলতেও শিখেছে। এক-একটি অংশের গড়ন ও মাত্রার পরস্পরসম্পর্কের দিক দিয়ে শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্ক মানব মস্তিষ্কের অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি অন্যান্য প্রাণীর মস্তিষ্কের তুলনায়, যদিও তা অনেক হাল্‌কা ও ক্ষুদ্র।

এ থেকেই এসেছিল ছোট একটা শিম্পাঞ্জীকে মানুষের মতো লালন করা আর অন্তত তাকে কয়েকটি মানবিক গুণ অর্জন করতে শেখানোর চেষ্টা করার চিন্তা। এই ধরনের বহু চেষ্টাই করা হয়েছে। বিশিষ্ট সোভিয়েত পশু মনোবিদ ন. ন. লাদিগিনা-কত্‌স এই রকম একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, ইয়োনি নামে একটি বাচ্চা শিম্পাঞ্জীকে দেড় বছর বয়স থেকে চার বছর বয়স অবধি তিনি লালন করেছিলেন তাঁর পরিবারে। বাচ্চা প্রাণীটি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে; মানব শিশুরা নানান ধরনের যেসব জিনিস আর খেলনা পেয়ে থাকে তাকেও সেসব দেওয়া হয় এবং তাকে এইসব জিনিস ব্যবহার করতে শেখানো আর মুখের কথার মাধ্যমে সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপন করানোর জন্য তার পালিকা 'মাতা' যথাসাধ্য করেন। বানরটির বিকাশের সম্পূর্ণ ধারাটি সযত্নে লক্ষ করা হয় ও ডায়েরিতে লেখা হয়।

কয়েক বছর বাদে লাদিগিনা-কত্‌সের নিজেরই একটি পুত্রসন্তান হয়, তার নাম রুদল্‌ফ (রুদি)। চার বছর বয়স পর্যন্ত তার বিকাশও ঠিক সেই রকম সযত্নে লক্ষ করা হয়।

দুটি শিশুর আচার-আচরণ যখন তুলনা করা হয় তখন অনেক খেলাধুলো আর ভাবাবেগগত বিকাশের ব্যাপারে

অনেকখানি মিল লক্ষ করা যায়। কিন্তু তার পাশাপাশি, নীতিগতভাবে একটা পার্থক্যও ছিল। বানরটি খাড়া দাঁড়িয়ে হাঁটা শিখতে পারে নি এবং সমর্থনের জন্য নিজের হাতদুটি ব্যবহার না করে অবাধে চলাফেরা করতেও শেখে নি। সে মানুষের বহু কাজ নকল করলেও, এই অনুকৃতির ফলে উপকরণাদির ব্যবহার যার সঙ্গে জড়িত এমন সব অভ্যাস যথাযথভাবে আয়ত্ত করা এবং ত্রুটিহীন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি; কাজটির শুধু বাহ্যিক দিকটিই সে ধরতে পেরেছে, তার অর্থটাকে নয়। যেমন, ইয়োনি প্রায়ই হাতুড়ি দিয়ে একটা পেরেক ঠোকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু, হয় সে যথেষ্ট জোর লাগাত না, না হয় পেরেকটা সোজা করে ধরত না, অথবা পেরেকটা পুরোপুরি ফস্‌কে যেত। ফলটা ছিল এই যে, প্রচুর 'অনুশীলন' সত্ত্বেও, ইয়োনি কখনও একটা পেরেক ঠুকতে পারে নি। সৃষ্টিশীল বা গঠনমূলক যেসব খেলা, সেগুলিও এই শিশু বানরটির নাগালের বাইরে থেকে গেল। সবশেষে, মৌখিক কথার ধ্বনি নকল করা বা শব্দ আয়ত্ত করার আদৌ কোনো প্রবণতাই সে দেখাল না, যদিও সে নিরন্তর বিশেষ তালিম পেয়েছিল। এক মার্কিন দম্পতি এল. এ. ও ডবলিউ. এন. কেল্লগও একটি বাচ্চা বানরের 'পালক পিতামাতা' ছিলেন, তাঁরাও বলতে গেলে এই একই ফল পান।*

সাম্প্রতিকতম সমীক্ষায় (আর. এ. গার্ডনার, বি. টি. গার্ডনার, ডি. প্রিমাক ইত্যাদি) দেখা গেছে যে

* Kellogg L. A., Kelogg W.N. The Ape and the Child.—New York, 1933.

একজন মানুষের দ্বারা দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ শিক্ষার মধ্য দিয়ে উন্নততর ধরনের নরাকার বানর সেইসব বস্তুর প্রতিকল্প হিসেবে ইশারা বা সংকেতচিহ্ন ব্যবহার করতে সক্ষম, যেগুলি তাদের সামনে উপস্থিত নেই।* ভাষাবিজ্ঞানী ব. ভ. ইয়াকুশিন মনে করেন যে 'পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বানরদের শেখা সংকেতচিহ্নের ব্যবস্থাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূক-বধিরদের ব্যবহৃত ভাষার কিছুটা রূপান্তরিত রূপ, এবং ভাষা বিকাশের (ফাইলোজেনেসিসে বা প্রজাতির বিকাশের ইতিহাসে ও অণ্টোজেনেসিসে বা ব্যক্তি উন্মেষে, উভয় ক্ষেত্রে) প্রারম্ভিক স্তরের সঙ্গে মেলে, এই স্তরটিকে সাধারণত বলা হয় শব্দ-বাক্যের স্তর, এবং এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তা সংকেতচিহ্নগুলিরই জটিল 'বুনটের' দরুন তার জটিল আভ্যন্তরিক সম্পর্কাবলী সহ মানুষের মুখের ভাষায় বিকাশলাভ করতে পারে না। বিকাশের এই ধারাটি, প্রতীকীকরণের সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে যেটি রুদ্ধপথ, অবশ্যই প্রতিস্থাপিত হতে হবে ধ্বনিবিশিষ্ট একটি ভাষা দিয়ে, কিন্তু বানরদের পক্ষে তা অসম্ভব।'**

---

* Gardner R. A., Gardner B. T. 'Two-Way Communication with an Infant Chimpanzee', in: Behaviour of Nonhuman Primates. Eds. Shrier A., et al., Vol. 4.—New York: Academemie Press, 1971.

Premack D. 'Language in the Chimpanzee?' in: 'Science', 1971.

** ইয়াকুশিন ব. ভ.। 'ভাষার মন্দিরপথে শিম্পাঞ্জী'। Linden U. Apes, Men and Language গ্রন্থের রুশ অনুবাদ, উত্তরভাষ।—মস্কো: মির, ১৯৮১,২৬৬ পৃঃ।

মানব মস্তিষ্ক না থাকলে মানুষের মানসিক গুণাবলীর উদ্ভব অসম্ভব। কিন্তু আবার সমানভাবে, হোমো স্যাপিঅ্যান-সের পক্ষে জীবনযাপনের যে সাধারণ অবস্থা বৈশিষ্ট্যসূচক, সেই সাধারণ অবস্থা বহির্ভূত মস্তিষ্ক মানব মনের জন্ম দিতে পারে না। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের একটি ঘটনা আছে, সেটি সুপ্রামাণ্য: একটি ভারতীয় গ্রামের কাছে মানুষের মতো দেখতে দুটি অদ্ভুত প্রাণীকে দেখা যায়, কিন্তু তারা চলছিল চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে। তাদের বাসস্থলের সন্ধান পাওয়া গেল একটা নেকড়ের বাসায়, এবং দেখা গেল তারা দুটি মেয়ে, একজনের বয়স প্রায় আট বছর, অন্যজনের প্রায় দেড় বছর। তাদের সেখান থেকে নিয়ে আসা হল, চেষ্টা হল মানুষের পরিবেশে তাদের বড় করে তুলতে। তারা চার হাত-পায়ে হাঁটতে, কাউকে দেখলেই ভীতি প্রকাশ করতে আর লুকোবার চেষ্টা করত, লোককে কামড়াতে যেত, আর রাতে নেকড়ের মতো আওয়াজ করত। অমলা নামের ছোট মেয়েটি এক বছরের মধ্যে মারা যায়। বড়টি, কমলা, আরও কয়েক বছর বেঁচে ছিল, এই সময়ে মূলত সফলভাবেই তার নেকড়েসুলভ অভ্যাস ছাড়ানো গিয়েছিল; তা হলেও, যখনই তার কোনো তাড়াহুড়ো থাকত, তখনই সে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলতে চাইত। অনর্গলভাবে সে কথা বলতে পারত না, অনেক কষ্টে মাত্র চল্লিশটি শব্দ ঠিকভাবে ব্যবহার করতে শিখেছিল।

অতএব, একটি শিশুর মানুষ হয়ে ওঠার জন্য মস্তিষ্কের গড়ন আর জীবনযাপনের সুনির্দিষ্ট অবস্থা, লালন-পালন,

এই সবই অত্যাবশ্যক। কিন্তু, গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রত্যেকটি পৃথক। ইয়োনি আর কমলার দৃষ্টান্ত এই অর্থে খুবই শিক্ষাপ্রদ: মানুষের দ্বারা লালিত বানর; আর নেকড়ের দ্বারা লালিত মানবশিশু। ইয়োনি বড় হয়ে উঠেছিল বানর হিসেবেই, সেই সঙ্গে ছিল শিম্পাঞ্জীর আচরণের সমস্ত সহজাত চারিত্রবৈশিষ্ট্য। কমলা মানুষ হিসেবে বড় হয়ে ওঠে নি, হয়েছিল স্বভাবসিদ্ধ নেকড়েসুলভ অভ্যাসবিশিষ্ট একটি প্রাণী। ফলত, বানরসুলভ আচরণের লক্ষণগুলি অনেকখানি পরিমাণে স্থাপিত থাকে প্রাণীটির মস্তিষ্কের মধ্যে, বংশগতি দিয়ে যা পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু, মনুষ্যসুলভ আচরণের লক্ষণগুলি এবং মানবিক মনোগত গুণাবলী শিশুর মস্তিষ্কে সহজাতভাবেই উপস্থিত থাকে না। তার বদলে আছে অন্য কিছু — যে অবস্থায় সে বাস করে এবং যে শিক্ষা পায় সেখান থেকে আসা কোনো কিছুকে আয়ত্ত করার সামর্থ্য, এমন কি সেটা যদি রাতে নেকড়ের মতো আওয়াজ করার 'সামর্থ্য' হয়, তাও।

অসাধারণ নমনীয়তা, শিখবার সামর্থ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক আর পশুর মস্তিষ্কের তফাৎ করা যায়। পশুদের বেলায়, মস্তিষ্ক পদার্থের বৃহত্তর অংশটা জন্মের মুহূর্ত থেকেই 'অধিকৃত' থাকে; সহজপ্রবৃত্তিগত বন্দোবস্তটা অর্থাৎ বংশগতির দ্বারা সঞ্চারিত আচরণের রূপগুলি তখন থেকেই রয়েছে। শিশুর বেলায়, মস্তিষ্কের বেশ বড় একটা অংশ 'পরিচ্ছন্ন', জীবন আর শিক্ষা তাকে যে জ্ঞান দেয় তা গ্রহণ

ও ধারণ করার জন্য সে অংশটা প্রস্তুত। অধিকন্তু, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে পশুর মস্তিষ্কের বেলায় গঠনের প্রক্রিয়াটা বলতে গেলে জন্মের মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু হোমো স্যাপিঅ্যানসের বেলায় তা জন্মের পরেও চলতে থাকে, এবং শিশুর বিকাশ কোন অবস্থায় ঘটে তার উপরে নির্ভর করে।

মানুষের কথা বলতে গেলে, জীববিদ্যাগত ক্রমবিকাশের নিয়মগুলি আর বলবৎ নেই। প্রাকৃতিক নির্বাচন, যোগ্যতমের উদ্বর্তন, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সবচেয়ে সক্ষমের টিকে থাকা —— এগুলি আর ক্রিয়াশীল নেই, কারণ মানুষ নিজে শিখেছে পরিবেশকে কীভাবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী শুধরে নিতে হয়, হাতিয়ার আর শ্রম ব্যবহার করে কীভাবে তাকে রূপান্তরিত করতে হয়।

বহু সহস্র বছর আগে যারা বাস করত আমাদের সেই পূর্বপুরুষ, ক্রোম্যানিয়ঁর সময় থেকে মানুষের মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটেছে সামান্যই। মানুষকে যদি প্রকৃতির কাছ থেকে তার মনস্তাত্ত্বিক গুণাবলী গ্রহণ করতে হত, তা হলে এখনও আমরা ঠাসাঠাসি করে গুহাতেই থাকতাম, রাখতাম আগুন জ্বালিয়ে।

পশু জগতে যেখানে জীবসত্তার কাঠামোটার মতো আচরণের বিকাশপ্রাপ্ত স্তরটি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে চলে আসে জীববিদ্যাগত উত্তরাধিকার মারফৎ, সেখানে মানুষের বেলায় তার বৈশিষ্ট্যসূচক কাজকর্মের ধরনগুলি এবং সেই ধরনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা আর মনোগত গুণাবলী চলে আসে একেবারে

ভিন্ন একটা পথ দিয়ে — সামাজিক উত্তরাধিকার আত্তীকরণের পথে।

প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, দক্ষতা আর মনোগত গুণাবলী প্রকাশ করে তার শ্রমের উৎপাদে, যাকে বলা হয় বৈষয়িক সংস্কৃতি তার উৎপাদ (আমাদের চারপাশের বস্তুনিচয়, বাড়ি, যন্ত্র ইত্যাদি) এবং যাকে বলা হয় আত্মিক সংস্কৃতি তার উৎপাদ (ভাষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা)। প্রত্যেক নতুন প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলির কাছ থেকে পায় আগে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সেই সবই এবং পৃথিবীতে প্রবেশ করে মানবজাতির ক্রিয়াকলাপ নিজের মধ্যে 'আত্মভূত' করে নিয়ে।

এই পৃথিবী আর মানব সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে গিয়ে শিশুরা ক্রমে ক্রমে অর্জন করে তার মধ্যে মূর্ত সামাজিক অভিজ্ঞতা — মানুষের একান্ত বৈশিষ্ট্যসূচক জ্ঞান, দক্ষতা আর মনোগত গুণাবলী। একেই বলা হয় সামাজিক উত্তরাধিকার। অবশ্য, শিশু নিজে থেকে মানব সংস্কৃতির কৃতিত্বগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না; সেটা সে করে প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ত সাহায্য আর পথনির্দেশনা মারফৎ, তার লালিত হওয়া ও তালিম পাওয়ার সময়ে।

এখন এমন কিছু উপজাতি আছে, যারা আদিম জীবন যাপন করে, ধাতুর ব্যবহার জানে না, জীবনধারণের সামগ্রী লাভ করে সরলতম পাথুরে হাতিয়ারের সাহায্যে। এই সমস্ত উপজাতির প্রতিনিধিদের সম্পর্কে সমীক্ষা থেকে তাদের মনঃপ্রকৃতি আর আধুনিক সভ্যতায় লালিত একজন ব্যক্তির মনঃপ্রকৃতির মধ্যে দারুণ পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু

এই পার্থক্যগুলি আদৌ কোনো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে না। এই ধরনের একটি উপজাতির ভিতর থেকে একটি শিশুকে নিয়ে আধুনিক সভ্য একটি পরিবারে বড় করে তুলুন, সেই শিশুটি তখন আমাদের কারও থেকেই আলাদা হবে না।

এ থেকে আমরা দেখতে পারি যে শিশুর জন্মগত চারিত্রবৈশিষ্ট্য, মনোগত গুণাবলীর জন্ম না দিলেও, সেগুলি গঠিত হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় অবস্থা সৃষ্টি করে। এই গুণাবলী উদ্ভূত হয় সামাজিক উত্তরাধিকারের দরুন। যেমন, মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানসিক গুণাবলীর অন্যতম হল ভাষার ধ্বনি (ফোনিমিক) শ্রবণের সামর্থ্য, যা ভাষার ধ্বনি আলাদা করার ও চেনার সামর্থ্য যোগায়। কোনো পশুর এটা নেই। প্রতিপন্ন হয়েছে যে পশুরা কোনো মৌখিক আদেশে যখন সাড়া দেয় তখন শব্দগুলির দৈর্ঘ্য আর বলার সুরটাই শুধু ধরতে পারে, সুনির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনিগুলি আলাদা করতে পারে না। শিশু প্রকৃতির কাছ থেকে পায় একটি শ্রবণেন্দ্রিয় এবং নার্ভতন্ত্রের তৎসংশ্লিষ্ট একটি অংশ, যেটি ভাষার ধ্বনি আলাদা করে বুঝতে পারে। কিন্তু ভাষার ধ্বনি শোনার সামর্থ্যটাই বিকাশলাভ করে শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের নির্দেশনায় একটা ভাষা আয়ত্ত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে, তাতে এই শ্রবণ বিশেষ করে নিজের ভাষাটির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানিয়ে নেয়।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বৈশিষ্ট্যসূচক আচরণের কোনো রূপ শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পায় না। কিন্তু কয়েকটি

সরলতম রূপ — অ-সাপেক্ষ প্রতিবর্তসমূহ — সহজাত ও আবশ্যিক শিশুর বেঁচে থাকার জন্যও বটে, আরও মানসিক বিকাশের জন্যও বটে। শিশু জন্মায় একপ্রস্ত জৈব চাহিদা নিয়ে: অক্সিজেনের প্রয়োজন, চারপাশের আবহাওয়ায় বিশেষ একটা তাপমাত্রার প্রয়োজন, খাদ্যের প্রয়োজন ইত্যাদি নিয়ে, সেই সঙ্গে এই চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারার মতো একটা প্রতিবর্ত বন্দোবস্ত নিয়ে। চারপাশের পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার প্রভাব আত্মরক্ষামূলক ও অভিমুখীনতামূলক প্রতিবর্তের জন্ম দেয়। অধিকতর মানসিক বিকাশের পক্ষে শেষোক্তগুলি বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেগুলি হল বাহ্যিক প্রভাবগুলি গ্রহণ ও আত্মভূত করার স্বাভাবিক বনিয়াদ।

যে সমস্ত শর্তাবদ্ধ প্রতিবর্তের ফলে বাহ্যিক প্রভাবে সাড়ার প্রসার ও সেগুলির জটিলতা ঘটে, তার জন্ম হয় খুবই অল্প বয়সে অ-সাপেক্ষ প্রতিবর্তের ভিত্তিতে। প্রাথমিক অ-সাপেক্ষ ও শর্তাবদ্ধ প্রতিবর্ত ব্যবস্থা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে শিশুর প্রারম্ভিক যোগসূত্রকে নিশ্চিত করে, এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও নানান ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করার দিকে উত্তরণের অবস্থা সৃষ্টি করে। শিশুর ব্যক্তিত্বের মানসিক গুণাবলী ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে এরই প্রভাবে।

শিশু সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে, এক একটি প্রতিবর্ত ব্যবস্থা একীভূত হয়ে জটিল ক্রিয়াগত ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এমন প্রতিটি ব্যবস্থা কাজ করে এক একটি সমগ্র হিসেবে এবং সম্পন্ন করে একটি

নতুন ক্রিয়া যেটি তার অঙ্গীয় গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া থেকে একেবারে আলাদা: এটাই আমাদের দেয় ভাষা ও সংগীত শ্রবণশক্তি, যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তা ও হোমো স্যাপিঅ্যানসের বৈশিষ্ট্যসূচক অন্যান্য মানসিক গুণ।

শৈশবকালে দেহযন্ত্রের, বিশেষত নার্ভতন্ত্র ও মস্তিষ্কের নিবিড় পরিপক্কভবন ঘটে। জীবনের প্রথম সাত বছরে মস্তিষ্কের ভর বৃদ্ধি পায় প্রায় সাড়ে তিন গুণ, এবং তার ক্রিয়া ত্রুটিহীন হয়। মস্তিষ্কের পরিপক্কভবন মানসিক বিকাশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারই কল্যাণে বিভিন্ন কাজ আয়ত্ত করার ক্ষমতা বাড়ে, শিশু আরও কর্মদক্ষ হয়ে ওঠে, এবং সৃষ্টি হয় এমন অবস্থা যেগুলি তার ক্রমবর্ধমানরূপে অধিকতর প্রণালীবদ্ধ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ শিক্ষা ও লালনকে সহজতর করে।

পরিপক্কভবনের গতি নির্ভর করে শিশুটি যথেষ্ট বাহ্যিক উদ্দীপক পায় কিনা তার উপরে এবং প্রাপ্তবয়স্করা মস্তিষ্কের সক্রিয় প্রয়োগের জন্য আবশ্যকীয় লালন-পালনের অবস্থা যোগায় কিনা তার উপরে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে মস্তিষ্কের যে অংশগুলির প্রয়োগ হয় না, সেগুলি স্বাভাবিকভাবে পরিপক্ক হয়ে ওঠে না, এমন কি তা ক্রিয়া করার সামর্থ্যও হারাতে পারে। বিকাশের গোড়ার পর্যায়ে এটা বিশেষভাবেই সত্যি। লক্ষ করা গেছে যে, জন্ম থেকে যেসব শিশু ব্যক্তিগত পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, চমৎকার খাওয়ানো-দাওয়ানো আর যত্ন সত্ত্বেও, ঘন ঘন অসুস্থ হয় এবং বিকাশে অনেক পিছিয়ে থাকে। তাদের ক্রিয়াকর্ম গড়ে উঠতে দেরি হয়, এবং তারা

কথা বলতে আরম্ভ করে না। এটা কাটিয়ে ওঠা যায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক আর প্রতিটি আলাদা শিশুর মধ্যে প্রণালীবদ্ধ লেনদেন শুরু করে, শিশুটিকে খেলার জিনিস, সাড়া দেওয়ার মতো জিনিস নিয়ে কাজকর্ম করানো প্রভৃতি দিয়ে।

শিশুর পরিপক্ব হতে-থাকা মস্তিষ্ক দীর্ঘকাল ধরে একঘেয়ে কাজকর্ম-জনিত অতিরিক্ত বোঝার চাপের ব্যাপারে বিশেষভাবে সংবেদনশীল। শিক্ষামূলক প্রভাবগুলি ভাগ-ভাগ করে দেওয়া এবং সেগুলির বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশিষ্ট সোভিয়েত মনোবিদ্ আকাদেমিশিয়ান আ. র. লুরিয়া এক তরুণ দম্পতির দুর্ভাগ্যজনক দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন: এরা তাদের শিশু সন্তানের দিকে নজর দিতে পারত না বলে যখনই তাকে একা ফেলে কোথাও যেত, তখনই রেডিওটা চালিয়ে রেখে যেত। এর ফলে ছেলেটির মস্তিষ্কের যে অংশগুলি শ্রবণশক্তির অধিকারী সেগুলিতে ধীরে ধীরে বাধ গড়ে ওঠে এবং বধিরতা দেখা দেয়।

বিকাশশীল দেহযন্ত্র হল শিক্ষার সবচেয়ে উপযোগী জমি। শৈশবে যেসব ঘটনা ঘটেছে আমাদের উপরে তার ছাপ তথা আমাদের পরবর্তী জীবন জুড়ে সেগুলি প্রায়শই যে প্রভাব বিস্তার করে, সে বিষয়ে আমরা সম্যকভাবেই অবহিত। ছেলেবেলায় শিক্ষাদান মানসিক গুণাবলীর বিকাশের উপরে যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে তা একজন প্রাপ্তবয়স্ককে শিক্ষাদানের তুলনায় অনেক বেশি।

সুতরাং, শিশুর মধ্যে মনোগত বিকাশের বিভিন্ন অবস্থা এই বিকাশে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। জন্মগত চারিত্রবৈশিষ্ট্যগুলি — দেহযন্ত্রের কাঠামো, তার ক্রিয়া ও পরিপক্কভবন — সবই মানসিক বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, এগুলি ছাড়া তা ঘটতে পারে না; কিন্তু ঠিক কোন কোন মনোগত গুণ শিশুটির মধ্যে বিকাশলাভ করবে সেগুলি তা নির্ধারণ করে দেয় না। তা নির্ভর করে জীবনযাপনের অবস্থা আর লালন-পালনের উপরে, যেগুলির প্রভাবে শিশু সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

সামাজিক অভিজ্ঞতা হল মনোগত বিকাশের উৎস, যেখানে শিশু একজন মধ্যস্থ (প্রাপ্তবয়স্ক) মারফৎ মনোগত গুণাবলী ও ব্যক্তিগত চারিত্রবৈশিষ্ট্য বিকশিত করার মালমশলা লাভ করে।

আদান-প্রদান ও ক্রিয়াকর্মে ব্যক্তির মনোগত বিকাশ

মানুষ হয়ে ওঠার অর্থ চারপাশের লোকজন ও বস্তুনিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে কাজ করতে শেখা এবং নিজেদের মানিয়ে নেওয়া ঠিক সেইভাবে, যেটা মানুষেরই বৈশিষ্ট্যসূচক। আমরা যখন বলি যে প্রাপ্তবয়স্কদের নির্দেশনায় শিশুটি সামাজিক অভিজ্ঞতা ও মানব সংস্কৃতি আয়ত্ত করে, তখন আমরা বোঝাতে চাইছি ভাষার মারফৎ অন্য লোকের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার দক্ষতা আয়ত্ত করার কথা, মানুষের হাতের সৃষ্ট সামগ্রীগুলি ঠিকভাবে ব্যবহার করার দক্ষতা, সামাজিক প্রথা অনুযায়ী আচরণ করার দক্ষতা আয়ত্ত করার কথা।

মানবিক ক্রিয়াকলাপ ও মানবিক আচরণ আয়ত্ত করার ঠিক এই প্রক্রিয়া চলাকালেই শিশু অর্জন করে আবশ্যিক মানসিক গুণাবলী এবং ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি।

প্রাক্-স্কুল বছরগুলিতে শিশু কাজকর্মের কতকগুলি ধরন আয়ত্ত করে। সেগুলির মধ্যে আছে তিনটি মূল, প্রধান ধরনের কাজকর্ম: **আদান-প্রদান, বস্তু নিয়ে কাজকর্ম ও খেলা**।

মনোবিদ্যায় 'আদান-প্রদান' ধারণাটা 'ব্যক্তিত্ব' ধারণার সঙ্গে পরস্পরসম্পর্কিত মানুষের অস্তিত্বের সামাজিক ধরনের দরুন, কেননা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ব্যক্তির বিপ্রতীপে নয়, বরং প্রতিটি ব্যক্তির নির্যাস, তার নিজস্ব চারিত্রবৈশিষ্ট্য ও তার মূল্যবোধ। সামাজিক জীবন যাপন করা, অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার সুস্থিত প্রণোদনা ব্যক্তিত্বের মধ্যে গড়ে ওঠে তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

সোভিয়েত মনস্তত্ত্ব আদান-প্রদানকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিষয়ে গবেষণার অন্যতম নীতি বলে স্বীকার করে। দুই ধরনের আদান-প্রদান আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়। 'তার প্রথমটি হল ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করার উপায়; এই ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হিসেবে আমরা নিই ক্রিয়াকলাপ চালাতে-চালাতে আদান-প্রদানের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া। ...দ্বিতীয় ধরনের আদান-প্রদান জড়িত থাকে মানুষের একজন সঙ্গী-মানুষের জন্য বিশেষ আত্মিক চাহিদা পূরণের সঙ্গে। আদান-প্রদান হল ব্যক্তিমানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ গঠনের অন্যতম',

লিখেছেন ডক্টর অব ফিলসফি ল. ই. আন্‌ৎসিফেরভা।*
আদান-প্রদানের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রয়াস পায় নিজের দাবি কার্যকর করতে, নিজের অবস্থান রক্ষা করতে এবং পৃথিবী সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সংজ্ঞায়িত করতে। বিকশিত হওয়া ও নিজেকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ব তার মূল্য-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিটা সৃষ্টি করে এবং যা কিছু পরক, প্রত্যক্ষ আদান-প্রদানের প্রক্রিয়ায় তার আন্তর জগতে যা কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবেশ করেছে সেই সব কিছুকে বর্জন করে। বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার যে, ব্যক্তিত্ব যেমন-যেমন বিকাশ লাভ করে, ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আচরণের ধরনে প্রতিক্রিয়া হিসেবে গঠিত তার বৈশিষ্ট্যের কাঠামোয় সেই সমস্ত বিশিষ্টতা আরও বড় স্থান দখল করতে শুরু করে। এই বক্তব্যটা একবার গৃহীত হয়ে গেলে, আমরা বলি যে বিকাশশীল ব্যক্তিত্ব ব্যক্তি-উন্মেষের গোড়ার পর্যায়ে তার নিজস্ব বিকাশের যুক্তি ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে; তা নিজেই নিজের বিকাশের পরিবেশের জন্ম দিতে শুরু করে, জাগিয়ে তোলে তার চারপাশের লোকজনের মধ্যে নিজের প্রতি এক সবিশেষ ধরনের মনোভাব।

আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে শিশু সর্বোপরি তার নিজের ইতিবাচক ভাবাবেগের চাহিদা পূরণ করে, তারও পরে তাকে সে ব্যবহার করতে শুরু করে সামাজিক

---

* আন্‌ৎসিফেরভা ল. ই.। মনোবিদ্যায় পদ্ধতিতত্ত্বগত নীতি ও সমস্যাবলী। — 'মনোবিদ্যা বিষয়ক পত্রিকা', খন্ড ৩, সংখ্যা ২, ১৯৮২, পৃঃ ১৩ (রুশ ভাষায়)।

ক্রিয়াকলাপ আয়ত্ত করার জন্য।

শিশু বস্তু দিয়ে এমন কি সরলতম কাজকর্ম সম্পন্ন করতে পারার আগেই শিশু আর প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ভাবাবেগগত আদান-প্রদান ঘটে। শিশু তখনও প্রাপ্তবয়স্কের কথা বা আচরণ বোঝে না বটে, তা হলেও প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গলাভেই সে সন্তুষ্ট, একজন প্রাপ্তবয়স্কের দিকে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে প্রস্তুত, এবং তাকে উদ্দেশ করে কথা আর হাসিতে সাড়া দিতে সে প্রস্তুত। এই সময়ে বস্তুসমূহ সাধারণত শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে সেগুলি বস্তু বলেই নয়, বরং একজন প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে আসা উদ্দীপকে সাড়া হিসেবে (একজন প্রাপ্তবয়স্ক যখন শিশুকে সেগুলি দেখায় অথবা শিশুর হাতে সেগুলি দেয়)।

খুব কম বয়সেই, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি প্রদর্শিত আগ্রহ স্থানান্তরিত হয়ে যায় বস্তুসমূহের প্রতিও, অর্থাৎ শিশু হয়ে যায় বস্তুসমূহ নিয়ে কাজকর্মের পাত্র। বস্তুসমূহ ব্যবহার করতে সক্ষম হলেই শিশু আরও স্বাধীন হয়ে যায়, প্রাপ্তবয়স্কের ক্রিয়াকলাপ নকল করার, প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে কাজ করার এবং নিজের কাজের দ্বারা তার প্রতি অন্যদের ইচ্ছাকৃতভাবে একটা নির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ করাবার (মনোযোগ বা অনুমোদন দাবি করার) সামর্থ্য অর্জন করে।

পরের ধাপটি হল ভূমিকা পালনে উত্তরণ। শিশু একজন প্রাপ্তবয়স্কের ভূমিকা পালন, এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক যেভাবে করে ঠিক সেইভাবে জিনিস ও ঘটনা নিয়ন্ত্রণের

চেষ্টা করার মতো যথেষ্ট স্বাধীন হয়ে ওঠে, যদিও শিশুরা এ সবই করতে পারে শুধু 'আসলের ভান করে,' খেলনাকে আসল জিনিস বলে ধরে নিয়ে এবং কল্পিত কাজকে আসল কাজ বলে ধরে নিয়ে।

এইভাবে শিশুর চাহিদা আর আগ্রহ নিয়তই প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সংযুক্ত। শিশুর সামর্থ্যের প্রসার সাপেক্ষে এই সংযোগ নতুন নতুন রূপ লাভ করে। নতুন নতুন চলন-চালন আয়ত্ত করায় তার সামর্থ্য বাড়ে এবং সেটা প্রধান কাজের নতুন নতুন রূপের আত্মপ্রকাশের একটা পূর্বশর্ত। কিন্তু নতুন নতুন চলন-চালন আয়ত্ত হলেই নতুন ধরনের কাজ দেখা দেয় না। একটি শিশুকে খেলনা দিয়ে বিশেষ বিশেষ গতিবিধির কাজ শেখানো যেতে পারে (পুতুলকে দোলানো, তাকে বিছানায় শোয়ানো, পোশাক পরানো কিংবা একটা ট্রাককে ব্লক দিয়ে বোঝাই করা, সেটাকে টানা ইত্যাদি), কিন্তু তার চারপাশের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের ব্যাপারটায় একটা আগ্রহ, প্রাপ্তবয়স্কের (মা, ধাইমা, বাবা, ড্রাইভার) ক্রিয়াগুলি করার তীব্র বাসনা যদি তার মধ্যে গড়ে না ওঠে, তা হলে এই সমস্ত কাজের ফলে ভূমিকা পালনের ক্রিয়াটি ঘটে না।

মনোগত বিকাশ ও শিক্ষণ

একটি শিশুর সমগ্র জীবন নির্ভর করে প্রাপ্তবয়স্কদের উপরে, তা সংগঠিত ও পরিচালিত প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা; একেবারে ছোট বয়স থেকেই শিশু শিখতে আরম্ভ করে প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে। সে যে শুধু ঠিকভাবে হাঁটা,

কথা বলা, জিনিসপত্র ব্যবহার করা শেখে তাই নয়, চিন্তা করতে, অনুভব করতে এবং নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতেও শেখে। ভাষান্তরে, শিক্ষণের ফলে শিশু ব্যবহারিক ও মনোগত উভয় প্রকার কাজকর্মেই ব্যাপৃত হতে শুরু করে। আর এই শিক্ষণ যে সব সময়েই সচেতন, মোটেই তা নয়। প্রায়শই প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের শিক্ষা দেয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তারা ঠিক কী করছে সেটা লক্ষ না করেই। এমন একটা চিন্তাও প্রচলিত আছে যে বস্তুতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্কের সহায়তা ছাড়াই শিশু স্বাধীনভাবে আঁকতে, পড়তে, গুণতে আর অঙ্ক করতে পারে। কিন্তু এটা শোচনীয়ভাবে ভুল। শিশু যদি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রভাব থেকে, সমাজের প্রভাব থেকে বঞ্চিত হয় তা হলে কী ঘটে, তা তো আমরা জানিই।

অবশ্য, এটাই সবাই শ্রেয় মনে করে যে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষা না দিয়ে, যুক্তিসংগতভাবে, উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়া হোক, শিশুর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য যা দরকার তা তাকে দেওয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু এটা করতে হলে জানা দরকার শিক্ষণ আর বিকাশ কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, এবং এই সম্পর্কসূত্র থেকে এগিয়ে স্থির করা দরকার শৈশবের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুকে কী শেখাতে হবে এবং কীভাবে শেখাতে হবে।

স্বাভাবিক, দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ দেখায় যে শিশু যত ছোট শেখার ক্ষমতা তার তত কম, এবং যেসব শিক্ষা

ও দক্ষতা সে আয়ত্ত করে সেগুলি তত সরল আর প্রাথমিক। দুই বছর বয়সের শিশুকে অক্ষর লেখার কায়দা দেখানো, বা চার বছরের শিশুকে পরমাণুর নিউক্লিয়সের কাঠামো সম্পর্কে কিছু বলা অর্থহীন। শিক্ষণ পদ্ধতিকেও বয়সের সঙ্গে মানানসই করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিন বছর বয়সের একটি শিশু কীভাবে একটা মানুষ আঁকতে হবে তার মৌখিক বর্ণনা বুঝতে পারে না, কিন্তু তাকে যদি দেখিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সে নকল করার চেষ্টা করে (যদিও প্রারম্ভিকভাবে বিশেষ কোনো সাফল্য পায় না)।

যা বলা হল তা থেকে মনে হবে যে শিক্ষণ সফল হতে পারে একমাত্র তখনই যখন তা শিশুটি মানসিক বিকাশের যে-স্তরে পৌঁছেছে সেই স্তরের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু, পর্যবেক্ষণগুলি এমনিতে বিতর্কাতীত হলেও এই সিদ্ধান্তটা ঘটনাক্রমে আমূল ভুল, কেননা এর নিহিতার্থ এই যে মানসিক বিকাশ ঘটে আপনা থেকেই, শিক্ষণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে। কিন্তু আসলে তা ঘটে না। শিশু বিকাশলাভ করে সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে-করতে এবং মানুষের বিশেষত্বসূচক বিভিন্ন কাজকর্ম আয়ত্ত করতে-করতে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তার মধ্যে সঞ্চারিত করে, এই সমস্ত কাজকর্ম তার মধ্যে গঠন করে দেয় প্রাপ্তবয়স্করা শিক্ষণপ্রক্রিয়া চলাকালেই। তার মানে এই যে শিক্ষণকে বিকাশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় না। বিকাশের উপনীত স্তরটি শিক্ষণ গণ্য করে, সেটা এই স্তরে থামানোর জন্য নয় বরং অধিকতর বিকাশ কোন দিকে চালিত করতে হবে

এবং পরবর্তী পদক্ষেপটা কী হওয়া উচিত তা বোঝার জন্য। শিক্ষণ মানসিক বিকাশকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় এবং সেই বিকাশকে নিজের পিছন-পিছন টেনে আনে। এই বিষয়টা বোঝাই শিশুর ব্যবহারিক লালন-পালন ও শিক্ষার চাবিকাঠি। প্রতিভাদীপ্ত সোভিয়েত মনোবিদ্ ল. স. ভিগোত্স্কি দেখিয়েছেন যে সমস্ত শিক্ষার পক্ষে একটা অনুকূলতম কালপর্ব আছে। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষণ শুরু হওয়ার জন্য শিশুর কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তার কিছু কিছু গুণ ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য কিছুটা মাত্রায় পরিপক্ক হতেই হবে। কিন্তু এগুলিই বিকাশের একমাত্র নির্ধারক নয়; যে সমস্ত চারিত্রবৈশিষ্ট্য এখনও পরিপক্ক হওয়ার স্তরে রয়েছে, সেগুলির উপরেও তা নির্ভর করে। আর এগুলিকে ভিগোত্স্কি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন: 'অত্যন্ত বিলম্বে, পরিপক্ক হওয়ার সময়টা যখন ইতিমধ্যেই কেটে গেছে সেই সময়ে, শুরু হওয়া যে কোনো শিক্ষণ তখনও অসম্পূর্ণ এই সমস্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করার সম্ভাবনা হারায়, সেগুলিকে সংগঠিত করার, কোনো বিশেষ একভাবে বিন্যস্ত করা প্রভৃতির সম্ভাবনা হারায়।'* মনস্তত্ত্বে ইতিমধ্যেই উপনীত পরিপক্কতার স্তরকে সাধারণত অভিহিত করা হয় **প্রকৃত বিকাশের স্তর** বলে, আর যে প্রক্রিয়াগুলি এখনও পরিপক্ক হচ্ছে, সেগুলি হল **শিশুর আশু বিকাশের এলাকা।**

---

* ভিগোত্স্কি ল. স.। শেখার প্রক্রিয়ায় শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশ। -- মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯৩৫, পৃঃ ২৪ (রুশ ভাষায়)।

মানসিক বিকাশে শিক্ষণের প্রধান ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায় এই ঘটনায় যে নতুন নতুন ক্রিয়াকলাপ আয়ত্ত করতে-করতে শিশু প্রারম্ভিকভাবে সেগুলি সম্পন্ন করতে শেখে প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ও সাহায্য পেয়ে, তার পরে সে তা করে স্বাধীনভাবে। শিশু প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে মিলিতভাবে যা করতে পারে (তার কাজকর্মে প্রাপ্তবয়স্ক যা দেখিয়ে দেয়, পরিচালনা করে এবং শুধরে দেয় সেগুলি সহ), আর স্বাধীনভাবে সে যা অর্জন করতে পারে, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটাই হল শিশুর আশু বিকাশের এলাকা, তার শিক্ষাগ্রহণযোগ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক, এই নির্দিষ্ট মুহূর্তে বিকাশের যে বাড়তি ক্ষমতার সে অধিকারী তার এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

আশু বিকাশের এলাকাকে কাজে লাগিয়ে শেখার ক্ষেত্রে প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ একই সময়ে সৃষ্টি করে এক নতুন এলাকা, যেটা অধিকতর শিক্ষার একটা পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়ায়। শিশুকে কথা বলতে শেখানোর সময়ে আমরা কর্ণগোচর ও দৃষ্টিগোচর উপলব্ধি, প্রাপ্তবয়স্কের অনুকরণ ও বোধশক্তি, তার ভিতরে গড়ে উঠতে থাকা সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগাই। কথা বলতে পারাটা আবার মনোগত বিকাশে একটা গুণগত উন্নয়ন ঘটায়, যেটা নতুন নতুন ধরনের শেখার দিকে একটা অগ্র-পদক্ষেপকে সহজতর করে। বাক্‌শক্তির প্রভাবে যে উপলব্ধি আর চিন্তা আরও পরিপক্ক হয়ে উঠেছে, এগুলির ভিত্তি হবে সেটাই। কিন্তু, শিক্ষণের এমন সব ধরনও থাকতে পারে যা আশু বিকাশের

এলাকাকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। এটা ঘটবে তখন, যখন শিশুকে নানান ধরনের শিক্ষা আর তথ্য দিয়ে তালগোল পাকিয়ে ঠেসে শেখানো হয়। যেসব শিশু প্রাক্-স্কুলগামী শিশুর কাছে সাধারণত অপরিচিত সব ধরনের জিনিস সম্পর্কে অবলীলাক্রমে গাদা-গাদা জ্ঞান উগরে দেয়, যারা দীর্ঘতম কবিতা আর গল্প মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে পারে, কিংবা যারা পাঁচ-ছয় বছর বয়সে 'বড়দের' খবরের কাগজ থেকে প্রবন্ধ পড়ে শোনায়, তাদের খুব চালাক চতুর ও সু-বিকাশপ্রাপ্ত মনে হয়। কিন্তু এইসব 'শিশু প্রতিভার' অনেকেই সরলতম যে অংক করতে স্বাধীন যুক্তিবুদ্ধির দরকার তা করতে প্রায়শই শুধু যে অপারগ তাই নয়, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যদি দেখিয়ে দেয় তা হলেও তা করার উপায় আয়ত্ত করতেও অক্ষম।

শিক্ষণ যেহেতু মানসিক বিকাশকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় এবং তার পথ তৈরি করে, সেই হেতু মানসিক প্রক্রিয়াগুলি কোন দিকে বিকাশলাভ করতে পারে তা স্থির করে দিতে পারে, এবং বিশেষ বিশেষ মনোগত গুণাবলী গঠনে ও ইতিপূর্বে গড়ে ওঠা গুণগুলিকে নবরূপদানে সহায়তা করতে পারে।

প্রত্যেক বয়সের বিশিষ্টতা হল পছন্দমতো বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা গ্রহণক্ষমতা বেড়ে ওঠা। কতকগুলি বয়ঃকাল আছে যে সময়ে কিছু কিছু শিক্ষাগত প্রভাব মানসিক বিকাশের উপরে সর্বাধিক অভিঘাত সৃষ্টি করে। এই কালপর্বগুলিকে বলা হয় **সুবেদী**। এ কথা সুবিদিত যে

কথা বলার শক্তি অর্জনের সুবেদী কালপর্বটি হল দেড় থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে। এই সময়ে বাক্‌শক্তি আয়ত্ত হয় বিশেষ সহজতায় এবং তার সঙ্গে শিশুর আচরণ ও মনোগত প্রক্রিয়ায়, যেমন উপলব্ধি, চিন্তা প্রভৃতিতে আসে আমূল পরিবর্তন। শিশু যদি কোনো কারণে তিন বছর বয়সের মধ্যে কথা বলতে শুরু না করে, তা হলে ভবিষ্যতে কথা-বলা আয়ত্ত করা তার পক্ষে আরও অনেক কঠিন হবে। বাক্‌শক্তি না থাকার দরুন মনোগত বিকাশের ক্ষেত্রে ত্রুটির বিশেষ ক্ষতিপূরণ দরকার। মূক-বধির যেসব শিশু তিন বছর বয়সের পর কথা বলতে শেখে তাদের ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখা গেছে বহুধরনের কাজকর্মে এবং মানসিক প্রক্রিয়া ও গুণাবলীর বিকাশে তারা পিছিয়ে থাকে: ভূমিকা পালন বিকাশলাভ করে না, তারা বস্তুর ছবি আঁকে না আর উপলব্ধি ও চিন্তা প্রক্রিয়ার বিকাশ বিলম্বিত হয়। এই সমস্ত অপ্রতুলতা কাটিয়ে ওঠা যায় প্রচুর পরিমাণ শিক্ষাবিজ্ঞানগত প্রচেষ্টা দিয়ে, যে প্রচেষ্টা চালিত করতে হয় শুধু তাদের দিয়ে বাক্‌শক্তি আয়ত্ত করানোর দিকেই নয়, বিকাশের অন্যান্য দিক অভিমুখেও।

বিকাশের সুবেদী কালপর্বগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার কারণ এই যে, যে-সমস্ত মনোগত গুণ সবে গড়ে উঠতে শুরু করছে, সেগুলির উপরে শিক্ষণের প্রভাব সর্বাধিক। এই সময়েই সেগুলি সবচেয়ে নমনীয় ও রূপদানযোগ্য, এবং যে কোনো দিকে তাদের 'ঘোরানো' যায়। ইতিমধ্যেই বিকশিত হয়ে-যাওয়া গুণাবলীকে

বদলানো বা ঢেলে-সাজা অপেক্ষাকৃত দুষ্কর।

সব ধরনের শিক্ষণের পক্ষে সুবেদী কালপর্বগুলি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হলেও, এমন অনেক তথ্য আছে যা দেখায় যে প্রাক্-স্কুল বয়সটাই হল সেইসব ধরনের শিক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সুবেদী, যেগুলি উপলব্ধি, কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশকে প্রভাবিত করে।

জানা আছে যে মনোগত বিকাশের মূল অন্তর্বস্তু হল **আভ্যন্তরিক**, মনোগতভাবে অভিমুখী ক্রিয়াকলাপ, যেগুলি উদ্ভূত হয় **বাহ্যিক** অভিমুখী ক্রিয়াকলাপ থেকে। শিশুর পক্ষে কোনো কাজ আয়ত্ত করার জন্য এটা দরকার যাতে সেটা শিশুর চাহিদা ও কৌতূহলের উপযুক্ত কাজকর্মের ধরনগুলির একটির অংশ হয়। এই সমস্ত নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের সক্ষম করে তোলে এমন অবস্থা নির্ধারণ করতে যাতে শিক্ষণ শিশুর মানসিক বিকাশকে সর্বাধিকভাবে সহায়তা দেয়, অর্থাৎ সেটা বিকাশশীল হয়।

বিকাশমূলক শিক্ষণকে অবশ্যই প্রতিটি বয়ঃকালের পক্ষে একান্ত বিশিষ্ট শিশুসুলভ কাজকর্মের ধরনগুলির সর্বাধিক ব্যবহার করতে হবে। তার মানে, শিশুর প্রাক্-স্কুল শিক্ষায় কেন্দ্রীয় উপাদানটি হল সেইসব ক্রিয়া গঠন, যেগুলি বস্তু নিয়ে কাজকর্মের অভিমুখীনতামূলক অংশে প্রবেশ করে। এগুলি হল সেই ক্রিয়া যেগুলি বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্য ও কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে; বস্তুসমূহ, ব্যাপারসমূহ, ঘটনাবলী এবং খেলা আর ছবি আঁকায় প্রতিফলিত মানব আচরণ বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে।

মনোগত বিকাশের শর্ত হিসেবে সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায় শিশুর স্থান

শিশু যে অবস্থার মধ্যে বাস করে ও বিকাশ লাভ করে এবং তার চারপাশের লোকেরা তার প্রতি যে মনোভাব গ্রহণ করে, মনস্তত্ত্বে তাকেই ব্যক্তিত্বের বিকাশের শর্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

পরিস্থিতি শিশুকে স্থাপন করে এক উন্নত সামাজিক কাঠামোবিশিষ্ট ও ক্রিয়াশীল জাতীয় ঐতিহ্যসম্পন্ন এক বিশেষ সামাজিক পরিবেশে। শিশুর সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে এই পরিবেশ সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায় তার স্থানের এক বাহ্যিক বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়, এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিশেষতাগুলি নির্ধারণ করে। একজন লোক কোথায় বাস করে তা একটা বাহ্যিক বিষয় হতে পারে: অতি ছোট একটি পার্বত্য গ্রাম, বড় গ্রাম বা লক্ষ লক্ষ লোকের একটি শহরের অধিবাসীরা তাদের অস্তিত্ব ও বিকাশের অবস্থার ছাপ বহন করে। সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায় শিশুর স্থান নির্ণীত হয় স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদন দিয়েও। পুরুষ ও নারীর সামাজিক ভূমিকা শিশুর কাছে সামাজিক মান হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং শিশু সাধারণত সেই সব ভূমিকাই অধিকার করতে চেষ্টা করে যেগুলি তার সহজাত সত্তার সঙ্গে মেলে। এই অভিমুখীনতাই একজন পুরুষের বা নারীর ব্যক্তিগত গুণাবলী গঠন করে, প্রতিটি ব্যক্তিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রদান করে। শিশুর নিজের জন্মগত ও অর্জিত চারিত্রবৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায় তার স্থানকে প্রভাবিত করে।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে শিশু প্রবেশ করে মানবিক সম্পর্ক ও বস্তুর বিস্তৃত জগতে। সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায় শিশুর স্থান পরিবর্তিত হয় বাহ্যিক সামাজিক কারণসমূহের ফলে এবং নিজের সম্পর্কে ও অপরের সম্পর্কে শিশুর আন্তর মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে। তার বুনিয়াদী জীবনের সম্পর্কগুলি পুনর্গঠিত হয় যদি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে (হঠাৎ সে বড় ভাই হয়ে গেল) অথবা প্রাক্-স্কুল শৈশব থেকে সে চলে গেল পরবর্তী স্তরে — স্কুলে — যখন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থাটাই পুনর্নির্মিত হয়। এখন তার দায়দায়িত্ব যে শুধু পিতামাতা আর শিক্ষকদের প্রতিই নয়, এই বিষয়টা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গতভাবে এগুলি এখন সমাজের প্রতি নতুন দায়দায়িত্ব। জীবনে তার অবস্থান, তার সামাজিক ক্রিয়া ও ভূমিকা নির্ভর করবে এই সমস্ত দায়দায়িত্ব সে কীভাবে পালন করে তার উপরে। ভবিষ্যৎ জীবনে অন্যদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তমান ব্যক্তির স্থান ব্যক্তিত্বের বিকাশের ও তার পরিবর্তনের অবস্থা সৃষ্টি করে, এই পরিবর্তন নির্ভর করে সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায় তার স্থানের বাহ্যিক বিষয়টির উপরে।

বাহ্যিক বিষয় ছাড়া, স্থানের আভ্যন্তরিক বিষয়টিকে — ব্যক্তির নিজের আভ্যন্তরিক মনোভাব, তার নিজের প্রতি ও মনুষ্যজগতের প্রতি তার মনোভাবকেও মনস্তত্ত্ব স্বীকৃতি দেয়। ব্যক্তির আভ্যন্তরিক মনোভাবের একটি বৈশিষ্ট্য হল গতিশীলতা, তা নির্ধারিত হয় এই ঘটনা দিয়ে যে ব্যক্তিত্ব নিয়ত বিকাশলাভ করছে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন ঘটে তার ভিতরে গড়ে-ওঠা চারিত্রবৈশিষ্ট্য ও মূল্যাভিমুখীনতা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, তার চারপাশের মানুষের জীবন ও কাজকর্মের অবস্থা ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, এবং প্রকৃতিতে ও সমাজে মানুষের স্থান সম্পর্কে বোধের মধ্য দিয়ে।

শিশুর আভ্যন্তরিক মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করে অন্যান্য লোকের সঙ্গে ভাবাবেগগত আদান-প্রদানে জীবনের একেবারে প্রথম বছরগুলি থেকে এবং যে মুহূর্তে সে সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করে তার নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তার নিজের ইচ্ছা আর তার নিজের দাবি, সেই মুহূর্ত থেকে।

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরস্পরবিরোধী প্রবণতা

শিশুর বিকাশের সাধারণ নিয়মগুলি আবিষ্কারের ফলে মনস্তত্ত্ব মানুষের আচরণের সামাজিক রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বহু প্রলক্ষণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারে।

জীবনে মানবসমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যমানগুলি কীভাবে ব্যক্তিত্বের জন্য গুরুত্ব অর্জন করে এবং ব্যক্তিত্বের সদর্থক গুণগুলিকে নির্ধারিত করে এবং ব্যক্তি-উন্মেষে নঞর্থক প্রলক্ষণগুলি — অর্থাৎ আচরণের অসামাজিক রূপগুলি ও ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলি — কীভাবে দেখা দেয় তা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ প্রায়শই আমাদের সাধারণভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতায় অনুপস্থিত থাকে। এই ধরনের

প্রলক্ষণগুলি সারগতভাবে ব্যক্তিত্বের সামাজিক বিকাশের ফল এবং তার জন্য বিশেষ অধ্যয়ন দরকার।

আমরা মনে করি ব্যক্তিত্বের সদর্থক গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে নঞর্থক প্রলক্ষণগুলিও থাকতে পারে। সামাজিক বিকাশের সময়ে সদর্থক গুণগুলির উদ্ভব পরীক্ষা করে দেখা যাক।

আমরা অগ্রসর হই সোভিয়েত শিশু মনস্তত্ত্বে স্বীকৃত এই অবস্থান থেকে যে শিশুর মনের বিকাশ নির্ধারিত হয় সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায় অবস্থানের বিষয়টি দিয়ে এবং প্রধান কাজকর্মের চরিত্র দিয়ে। মানুষের মধ্যে বসবাস করার অবস্থায় শিশুর সামাজিক বিকাশ অগ্রসর হয় দুই দিকে: মানব সম্পর্কের রীতিপ্রথা আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে এবং নিজের আর স্থায়ী বস্তুসমূহের জগতে বিষয়টির মধ্যেকার মিথষ্ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। এই প্রক্রিয়াটি ঘটে একজন মধ্যস্থ (বয়স্কতর ব্যক্তি) ও সামাজিক রীতিপ্রথা আত্তীকরণের কাজে অংশগ্রহণকারীর (সমবয়স্ক ব্যক্তি) মারফৎ। এইভাবে, সামাজিক বিকাশ দেখা দেয় এমন একটা পরিস্থিতি হিসেবে যেখানে সম্পর্ক আয়ত্ত করা হয়: মধ্যস্থের (বয়স্কতর) সঙ্গে, সামাজিক রীতিপ্রথা আত্তীকরণের কাজে অংশগ্রহণকারীর (সমবয়স্ক) সঙ্গে এবং স্থায়ী বস্তুসমূহের জগতের সঙ্গে। সুতরাং বিষয়ীর তিন ধরনের নির্ভরশীলতা চিহ্নিত করা যায়, তার প্রত্যেকটিরই আছে নিজস্ব বিশিষ্ট চরিত্র এবং অন্যরা তার মধ্যস্থতাও করে।

শিশুর মধ্যে ব্যক্তি-উন্মেষে বয়স্কতরের সঙ্গে সম্পর্কবোধ

জাগ্রত হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, অথচ তার সমসাময়িকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় সামান্য কিছু পরে। শিশু যত বড় হতে থাকে, উভয় ধরনের আচরণ মিশে এক হয়ে যায়, সেটা সম্পূর্ণতা পায় প্রত্যক্ষ আদান-প্রদানের বিষয়ের উপরে নির্ভরশীলতা হিসেবে।

শিশু তার বয়োজ্যেষ্ঠদের উপরে নির্ভরশীল। এমন কি একেবারে শৈশবাবস্থাতেই সে নিয়ত সম্পর্ক গড়ে তুলছে একটা 'যোগ' চিহ্ন দিয়ে। একটা 'যোগ' চিহ্ন দিয়ে সম্পর্কের উপস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠদের উপরে শিশুর সরাসরি নির্ভরশীলতার পটভূমিতে ঘটে সামাজিক রীতিপ্রথা আয়ত্ত করার ঘটনা। এই সময়ে প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে স্বীকৃতিলাভের দাবিও বিকাশলাভ করছে। শিশু যখন ছোট, তখন এই চাহিদাটা খোলাখুলি ব্যক্ত হয়। প্রাপ্তবয়স্ককে সরাসরি সম্বোধন করে শিশু বলে: 'দেখ, কীভাবে আমি খাচ্ছি! দেখ, কীভাবে কাজটা করছি!' এই রকম করার সময়ে সে যেভাবে খাচ্ছে, কোনো একটা কিছু যেভাবে করছে, তার জন্য শিশু প্রশংসা প্রত্যাশা করে এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সাধারণত তাকে হতাশ করে না। শিশুর শিক্ষা গড়ে ওঠে স্বীকৃতির জন্য তার দাবির উপরে: 'তুমি ভারি চমৎকার ছেলে! খুব সুন্দর করছে!' এই ভাবে, দৈনন্দিন জীবনে শিশুর কাছে প্রাপ্তবয়স্ক সুনির্দিষ্ট দাবি করে, এবং প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য শিশু এই সমস্ত দাবি পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। স্বীকৃতির দাবি শিশুর কাছে একটা প্রয়োজন

হয়ে ওঠে এবং কত সফলভাবে সে বিকাশ লাভ করবে তা নির্ধারণ করে।

বিশদ রূপে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় খুব কম বয়সে, যখন শিশু বস্তুসমূহ নিয়ে ক্রিয়াকর্মে জড়িত হয়ে গেছে এবং এক প্রস্ত প্রাথমিক সামাজিক রীতি-প্রথা আয়ত্ত করতে পারছে। এই সমস্ত রীতি স্মৃতিতে রক্ষিত হয়, আত্তীকৃত হয় এবং বহু দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে ক্রিয়ার নির্দেশিকা হয়ে ওঠে।

শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায় সে যে-স্থান অধিকার করে তার উপরে, যে সমস্ত বিষয়গত অবস্থা তার আচরণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে সেগুলির উপরে, এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিশিষ্ট বিষয়গুলির উপরে। অল্প বয়সে সে অধিকার করে এক বিশেষ স্থান: মনস্তত্ত্বগতভাবে সে স্থায়ী বস্তুসমূহের জগতে প্রবেশ করে; প্রাপ্তবয়স্করা তাকে প্রদান করে সদর্থক ভাবাবেগ। শিশুর প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের মনোভাব এবং প্রধান কাজের চরিত্র সৃষ্টি করে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত এক সদর্থক আত্ম-মূল্যায়ন: 'আমি ভালো ছেলে', প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে স্বীকৃতির দাবি, আচরণের নিয়ম সম্পর্কে বিচারে সর্বাধিক মাত্রার দিকে একটা ঝোঁক, এবং বস্তুসমূহকে তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করার ঐকান্তিক প্রেরণা। পুরো অজ্ঞতা থেকে শিশু প্রবেশ করে সবিশেষ সম্পর্কের জগতে, স্থায়ী বস্তুসমূহের জগতে।

প্রাক্-স্কুল বয়সে শিশুর আচরণ পরিবর্তিত হয়:

তার বিকাশ নির্ধারিত হয় এক নতুন সামাজিক পরিস্থিতি দিয়ে।

প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করাটা শিশুর সামাজিক বিকাশ নিরূপণের ক্ষেত্রে অন্যতম মূল বিষয়। স্বীকৃতির দাবির আরও বিকাশ ঘটে প্রাপ্তবয়স্কের উপরে শিশুর ভাবাবেগগত নির্ভরতার পটভূমিতে। প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে আদান-প্রদান চলাকালে স্বীকৃতির যে চাহিদা দেখা দেয়, সেটা পরবর্তীকালে তার সমবয়স্কদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও চলে আসে, সেখানে তা বিকাশলাভ করে একেবারে নতুন বনিয়াদের উপরে: প্রাপ্তবয়স্ক যেখানে শিশুকে তার অধিগত বিদ্যায় সমর্থন দিতে চেষ্টা করে, সেখানে তার সমবয়স্কদের সঙ্গে প্রকাশ পায় সমর্থন আর প্রতিযোগিতার জটিল বিবদমান সম্পর্ক। প্রাক্-স্কুল বয়সে প্রধান কাজটা খেলা বলে দাবিগুলি প্রারম্ভিকভাবে গড়ে ওঠে খেলার মধ্যে এবং খেলার সঙ্গে জড়িত বাস্তব পরিস্থিতিগুলির মধ্যে।

খেলায় স্বীকৃতির চাহিদা প্রকাশ পায় দুটি স্তরে। শিশু চায় একাধারে 'সকলের মতো হতে', আবার 'অন্য যে কারো চাইতে ভালো হতে'। এই বাসনাগুলি তার বিকাশকে উদ্দীপিত করে এবং তার সমস্ত কাজে সাফল্য নির্ধারিত করে।

শিশু স্কুলে যেতে শুরু করলে নতুন নতুন ধরনের সম্পর্ক দেখা দেয়: তার চাহিদার পরিধির সোপানবৎ বিন্যাস নীতিগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটা নতুন প্রধান কাজ, স্কুলের পড়াশোনা, যখন দেখা দেয়, তখন

তার স্বীকৃতির চাহিদার সারমর্ম বদলে যায়, লেখাপড়ায় সাফল্যলাভই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিশু তার প্রচেষ্টার জন্য যে 'মার্ক' বা 'গ্রেড' পায় সেটা তার শিক্ষার্জনের একটা বিষয়গত পরিমাপ, তার স্কুলের দায়দায়িত্ব পালনের পরিমাপ। স্বীকৃতির চাহিদা এখন নতুনভাবে শিশুর সামাজিক সক্রিয়তার বিকাশকে নির্ধারিত করে।

আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে, স্বীকৃতির যে চাহিদা বিকাশের সময়ে অর্জিত হয় এবং যা ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের ইতিবাচক ধারাকে নির্ধারিত করে, সেই চাহিদাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: শিশু যে-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেটা অর্জনের দিকে শিশুকে তা চালিত করে।

আমরা বলি যে স্বীকৃতির দিকে অভিমুখীনতার সবচেয়ে প্রগতিশীল রূপ হল সেটিই যেটি সমতার দিকে মনোযোগ চালিত করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে সমস্ত সামাজিক পরিস্থিতিতে কৃতিত্ব অর্জনের প্রেরণা গড়ে তোলে। এখানে স্বীকৃতির দাবি শিশুর পক্ষে এক বিশেষ ব্যক্তিগত তাৎপর্য অর্জন করে: সমবয়স্কদের সঙ্গে সমান হিসেবে থাকা ও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রেরণা, এবং খেলায় আর স্কুলে দুই ক্ষেত্রেই সফল হওয়ার প্রেরণা। এই সবই শিশুর কাছে দেখা দেয় তার স্বীকৃতির দাবি চরিতার্থ হওয়ার উপায় হিসেবে।

তা সত্ত্বেও, শিশুরা অসামাজিক আচরণেরও পরিচয় দেয়। মানবিক সম্পর্ক-ব্যবস্থায় শিশুর অবস্থানের বিষয়টির

দ্বারা নির্ধারিত সম্ভাব্য শর্তগুলি এখানে আলোচনা না করে আমরা বিকাশের নীতির দিকে মনোযোগ দেব। আমরা মনে করি যে শিশু তার জীবনের প্রথম মাসগুলি থেকেই অচেতনভাবে চেষ্টা করতে শুরু করে মনোগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সর্বাধিক স্তরগুলি অর্জন করতে, যে স্বাচ্ছন্দ্য প্রারম্ভিকভাবে সে পায় তার প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের ভাবাবেগগত মনোভাবের দ্বারা। এটা হল প্রাপ্তবয়স্কের তরফ থেকে স্বীকৃতির একটা সূচক।

স্বীকৃতির বিকাশমান দাবির পটভূমিতে ব্যক্তিত্বের সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রলক্ষণগুলির ক্রমবিকাশের মনোগত দিকগুলি আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

ব্যক্তিত্বের সামাজিক বিকাশ যখন পর্যন্ত জীবনে একটা অবস্থানের স্তরে (বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি) গিয়ে পৌঁছয় না, তখন পর্যন্ত এই দাবি আদায় হয় মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার স্তরে। কিন্তু তা হলেও, শিক্ষকদের নিজেদের প্রত্যাশা সত্ত্বেও, নেতিবাচক প্রলক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে ইতিবাচক প্রলক্ষণগুলির পাশাপাশি।

স্বীকৃতিলাভের চাহিদার দ্বারা চালিত না হলে শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথা খেলায়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়, লেখাপড়ায় আর কাজে তাদের সমবয়স্কদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সফল হতে পারে না। কিন্তু সবচেয়ে মানবিক এই চাহিদার সঙ্গে প্রায়শই থাকে মিথ্যা কথা বলা আর ঈর্ষার মতো নেতিবাচক লক্ষণগুলি। আমরা বোঝাতে চাইছি অসদুদ্দেশ্যে সত্যের ইচ্ছাকৃত

বিকৃতি হিসেবে মিথ্যা কথা বলা এবং অপরের সমৃদ্ধি বা সাফল্যে উদ্রিক্ত ক্রোধ হিসেবে ঈর্ষার কথা। এই প্রলক্ষণগুলি এই চাহিদাটিরই আবশ্যিক অঙ্গ, কিন্তু ব্যক্তি-উন্মেষে শিশুর আভ্যন্তরিক মনোভাব যখন সমাজ-নির্ধারিত প্রধান কাজের কাঠামোর মধ্যে সবে রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করছে, তখন সেগুলির সঙ্গে স্বীকৃতির জন্য সামাজিক চাহিদাও থাকতে পারে।

মনোগত বিকাশের কালপর্যায়ভাগ এবং বয়ঃগত স্তর

শিশুদের মনোগত বিকাশ সমানভাবে অগ্রসর হয় না। অপেক্ষাকৃত মন্থর, ক্রমান্বিত পরিবর্তনের কিছু কালপর্ব থাকে, যখন শিশু দীর্ঘকাল একই মনোগত দিকগুলিকে বজায় রাখে এবং থাকে অনেক বেশি তীক্ষ্ন, আকস্মিক পরিবর্তনের কালপর্ব, যখন পুরনো মনোগত বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিয়ে গিয়ে দেখা দেয় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য, যাতে কখনও কখনও শিশুর চারপাশের লোকজন আক্ষরিকভাবেই তাকে চিনতেই পারে না। এই সব আকস্মিক আবেগগত উত্তরণকে বলা হয় বিকাশের সংকট। অনুরূপ অবস্থায় বসবাসকারী সমস্ত শিশুই মোটামুটি একই বয়সে সেই সংকটগুলির মধ্য দিয়ে যায়, তার ফলে শৈশবকালকে কতকগুলি বয়সের স্তরে ভাগ করা সম্ভব হয়।

জন্মগ্রহণ আর স্কুলে যাওয়া (সোভিয়েত ইউনিয়নে সাত বছর বয়সে) এই সময়টার মধ্যে শিশু যায় তিনটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তের ভিতর দিয়ে (আমরা যদি জন্মেরই

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংকটের কথা বাদ দিই, যেটা নবজাতকের অস্তিত্বের অবস্থা প্রচণ্ডভাবে পরিবর্তিত করে): এক, তিন ও সাত বছর বয়সে। এই কালপর্বে পৃথক করা হয় তিনটি বয়সের স্তর: একেবারে শিশু অবস্থা (জীবনের প্রথম বছর), গোড়ার শৈশব (এক থেকে তিন বছর), এবং প্রাক্-স্কুল শৈশব (তিন থেকে সাত বছর)।

যে সমস্ত বুনিয়াদী মনোগত বৈশিষ্ট্য মনোগত বিকাশের একই বয়সের স্তরের শিশুদের একই বর্গে স্থাপন করে, সেগুলি হল পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, তাদের চাহিদা, দাবি আর আগ্রহ।

মনোগত বিকাশের বয়ঃগত স্তরগুলি জৈবিক বিকাশের সমরূপ নয়! সেগুলির উদ্ভব ঐতিহাসিক। অবশ্য, মানুষের শারীরিক বিকাশের একটি কালপর্ব হিসেবে শৈশব এক স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ব্যাপার, কিন্তু তার দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ যে সময়ে শিশু সামাজিক শ্রমে ব্যাপৃত হয় না, শুধু তার জন্য প্রস্তুত হয় সেই সময়টা এবং এই প্রস্তুতি যে সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করে সেই রূপগুলি নির্ভর করে সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থার উপরে।

বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিটি বয়ঃগত স্তরের বৈশিষ্ট্যসূচক মনোগত লক্ষণগুলি যে সমাজে শিশুর স্থানের উপরে নির্ভর করে, এই ঘটনাটা দিয়ে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উত্তরণের ব্যাখ্যা করা যায় না। এই উত্তরণের আগে দেখা দেয় অন্যদের মধ্যে নিজের অবস্থান সম্পর্কে শিশুর অসন্তোষ, এবং এই অবস্থান বদলানোর আকাঙ্ক্ষা। এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন সেই নির্দিষ্ট স্তরে ঘটমান

বিকাশ বাড়িয়ে তোলে তার সামর্থ্যগুলিকে — জ্ঞান, দক্ষতা, মনোগত গুণাবলী, এবং তার আগেকার জীবনধারা, তার কাজের আগেকার ধরন এবং তার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে তার আগেকার সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধ বাধতে শুরু করে। শিশু তার নতুন সামর্থ্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং অতি সম্প্রতিও যেসব কাজ তাকে আকর্ষণ করত সেগুলির প্রতি আগ্রহ হারায়। সে প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক চাইতে শুরু করে। এই বিরোধ অভিব্যক্তি লাভ করে একটা সংকটের রূপে: পুরনো আর শিশুর পছন্দসই হয় না, এবং নতুনটা এখনও রূপ পরিগ্রহ করে নি।

এই সময়েই শিশুর লালন-পালনে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়: প্রাপ্তবয়স্কদের অনুরোধে তার প্রতিক্রিয়া হয় প্রতিকূল, সে একগুঁয়ে অথবা নেতিবাচক হয়ে উঠতে পারে। এই সমস্ত অসুবিধা কত বিরাট হবে এবং কতদিন সেগুলি থাকবে সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে প্রাপ্তবয়স্কদের উপরে। নতুন নতুন ধরনের কাজকর্ম ও সম্পর্কের জন্য শিশুর কামনা তাদের তাড়াতাড়ি আবিষ্কার করা ও তাতে সাড়া দেওয়া দরকার, শিশুকে সাহায্য করা দরকার। সর্বপ্রথমে, শিশুর প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের নিজেদের মনোভাবই বদলাতে হবে: তাকে আরও স্বাধীনতা দিতে হবে; তার বর্ধিষ্ণু সামর্থ্যগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং নতুন নতুন ধরনের কাজকর্মের দৃষ্টান্ত যোগাতে হবে, যেসমস্ত কাজে তার সামর্থ্যগুলি চরিতার্থ হতে পারে।

মনোগত বিকাশের সময়ে যে সমস্ত বিরোধ দেখা দেয়

এবং যেগুলির ফলে নতুন নতুন চাহিদা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং নতুন নতুন ধরনের কাজকর্ম আয়ত্ত হয়, সেগুলিই মনোগত বিকাশের চালিকা শক্তি।

এই অধ্যায়ে আমরা সূত্রায়িত করেছি সেই সমস্ত বুনিয়াদী নিয়ম, যেগুলি থেকে শিশুর মনের বিকাশ ও তার ব্যক্তিত্ব গঠনের সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ল. স. ভিগোত্স্কি এক সময়ে লিখেছিলেন যে ইতিমধ্যেই জানা অল্প কিছু তথ্য সম্পর্কে একটা অভিমত লাভ করার চেয়ে এক হাজার নতুন তথ্য আত্মস্থ করা সহজ। ব্যক্তি-উন্মেষের কালে ব্যক্তিত্বের মানসিক বিকাশ-নির্ধারক বুনিয়াদী নিয়মগুলিই শিশুর মনোগত জীবনের তথ্যাদি সম্পর্কে একটা দৃষ্টিকোণস্বরূপ। যে কোনো ব্যাপারেই, নির্দিষ্ট প্রারম্ভিক অবস্থায় যথেষ্ট নিয়মিতভাবে যার পুনরাবৃত্তি ঘটে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। বর্ণিত নিয়মিত বিষয়গুলিই শিশু মনস্তত্ত্ব-প্রণালীকে গঠন করে। শিশুর মনের বিকাশের মূল নিয়মের ভিত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা শিশুর ব্যক্তিত্বের সমগ্র ক্রমবিকাশ, তার নিজের 'আমি'-কে চরিতার্থ করার কামনা, তার স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার, তার প্রত্যাশাগুলি প্রতিপন্ন করার, তার নিজের প্রাতিস্বিকতার অধিকার তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা বিচার করে দেখব।

সূর্যালোকিত দিন। ইয়ানা, ৫ বছর

মাতৃত্বের মাধুর্য

শিশুদের নিয়ে মায়েদের ভ্রমণ। নেল্লি, ৬ বছর

আমি সবচেয়ে সুন্দরী! গালিয়া, ৫ বছর

অধ্যায় ২। নবজাত অবস্থা

শিশুর দেহযন্ত্রে জন্মগ্রহণ একটা বিরাট ধাক্কা। তুলনামূলকভাবে সুস্থিত এক পরিবেশে (মায়ের দেহ) উদ্ভিদসুলভ এক অক্রিয় অস্তিত্ব থেকে তার হঠাৎ অধঃক্ষেপ হয় বায়ু-শ্বসনের এক পরিবেশের সম্পূর্ণ নতুন অবস্থায়, যেখানে থাকে ঘনঘন পরিবর্তমান অসংখ্য পরিমাণ অস্বস্তিদায়ক উপাদান, অধঃক্ষেপ হয় এমন এক পৃথিবীতে যেখানে সে অসহায় জীব হিসেবে তার এখনকার দশা থেকে বড় হয়ে মানুষ হয়ে ওঠার সমস্যার সম্মুখীন হয়।

নবজাতকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণসমূহ

নতুন পরিবেশে শিশুর জীবন নিশ্চিত হয় সহজাত দেহযন্ত্রগত বন্দোবস্তগুলি দিয়ে। জন্মের সময়ে তার স্নায়ুতন্ত্র বাহ্যিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। দেহের মূল কর্মপ্রণালীগুলির কাজ (নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, রক্ত সঞ্চালন) যার দ্বারা নিশ্চিত হয় সেই সমস্ত প্রতিবর্ত জন্মের অব্যবহিত পরেই চালু হয়ে যায়।

জীবনের প্রথম দিনগুলিতে লক্ষ করা যেতে পারে যে

ত্বকের অস্বস্তি ঘটলে শিশু কুঁকড়ে যায়, তার মুখের সামনে কিছুর ঝলকানি হলে সে তির্যকদৃষ্টিতে তাকায়, আর আলোর ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ বেড়ে গেলে তার চোখের তারা সংকুচিত হয়। এগুলি হল **রক্ষণমূলক** প্রতিবর্ত, যার কাজ হল অস্বস্তিদায়ক উপাদানটির ক্রিয়া সীমিত করা।

রক্ষণমূলক প্রতিক্রিয়া ছাড়াও নবজাতকের এমন কিছু প্রতিক্রিয়া থাকে যেগুলি অস্বস্তিদায়ক উপাদানটির সঙ্গে সংস্পর্শ নিশ্চিত করে। এগুলি হল **অভিমুখীনতাগত** প্রতিবর্ত। গবেষণা প্রতিপন্ন করেছে যে জীবনের প্রথম তিন দিনে আলোর কোনো জোরালো উৎসের দিকে শিশু মাথা ঘোরাবে: এক প্রসূতিসদনের নার্সারিতে কোনো সূর্যালোকিত দিনে বেশির ভাগ নবজাতকের মাথাই সূর্যমুখী ফুলের মতো আলোর দিকে ফেরানো ছিল। এও দেখা গেছে যে জীবনের প্রথম কয়েক দিনে শিশুর পক্ষে কোনো ধীর-গামী আলোর উৎসের দিকে তাকানোটা স্বভাবসিদ্ধ।

কিন্তু, দৃশ্যগত বিশ্লেষকটিই এই ধরনের একমাত্র প্রত্যঙ্গ যা জন্মের মুহূর্ত থেকেই অভিমুখীনতাগত প্রতিক্রিয়ার পরিচয় দেয়। সমীক্ষায় দেখা যায় সে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া (দর্শন, শ্রবণ, ত্বকের সংবেদনশীলতা) সর্বপ্রথমে রক্ষণমূলক প্রতিবর্তগুলির কেন্দ্রগুলির সেবা করে, যার প্রকাশ ঘটে কান্না, গতিবিধির নেতিবাচক ভাবাবেগগত অনুকরণ, শিউরে ওঠা, অস্বস্তিদায়ক উপাদানটি থেকে সরে যাওয়া ইত্যাদির রূপে।

অভিমুখীনতাগত ক্রিয়াকলাপ সহজাত নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সংস্পর্শের সময়ে শিশু অর্জন করে বিশেষভাবেই মানবিক কতকগুলি গুণ, যেমন — কৌতূহল, জ্ঞানতৃষ্ণা আর সত্য প্রতিপাদনের বাসনা। বিকাশের গোড়ার দিককার স্তরগুলিতেই গড়ে ওঠে অভিমুখীনতাগত ক্রিয়া, প্রথম, সহজাত রক্ষণমূলক প্রতিবর্তগুলির ভিত্তিতে; দ্বিতীয়, বাহ্য জগতের কাছ থেকে পাওয়া ছাপগুলির ভিত্তিতে; এবং তৃতীয়, প্রাপ্ত-বয়স্কদের দ্বারা সংগঠিত বিশেষ ক্রিয়াগুলির (মনোনিবেশ, অভিমুখীনতাগত অনুসন্ধান ও অন্বেষণ, ইত্যাদি) ভিত্তিতে। সহজাত রক্ষণমূলক প্রতিবর্তগুলি ক্ষতিকর আর নির্দোষ অস্বস্তিকর উপাদানগুলির মধ্যে প্রভেদন ঘটায়, এবং অভিমুখীনতাগত ও অনুসন্ধানমূলক ক্রিয়ার প্রারম্ভিক ভিত্তি তখনই স্থির হয়ে যায়। কিন্তু, পৃথিবীর সমস্ত সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে প্রাপ্তবয়স্ক যেমন দেখতে পায়, নবজাত শিশু তেমন সমগ্রভাবে তা পায় না। তার জগৎ তার ইন্দ্রিয়গুলির সামর্থ্যের দ্বারা সীমিত। এটা হল ‘দ্রুত ধাবমান ছাপ’-এর কালপর্ব, সেইজন্য সে জগৎ বিচিত্রদৃক্ ও অনির্দিষ্ট। কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে আরও সম্পৃক্ত ও বিচিত্র। প্রসঙ্গত, অনুধাবন ক্ষমতা স্নায়ুতন্ত্রের পরিপক্বতার ফলে যতটা বর্ধিত হয় তার চেয়ে বেশি বাড়ে প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষ থেকে অনুধাবন-শক্তির বিকাশ সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে। প্রাপ্তবয়স্ক যে সংগঠিত সূত্রপাতের ব্যবস্থা করে দেয় তার কল্যাণে, শিশুর পৃথিবী ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্ট হয়ে যায়: শিশুকে

প্রাপ্তবয়স্ক যুগিয়ে দেয় সংবেদজ উদ্দীপনা এবং সেটা করার দ্বারা তার মনোগত বিকাশ সংগঠিত করে। এইভাবে, অভিমুখীনতাগত আচরণের কিছু কিছু ভিত্তিকে নবজাত শিশুর গুণ বলা যেতে পারে, যদিও যথার্থ মানবিক অভিমুখীনতাগত কাজকর্ম তা নয়।

খাদ্য-অভিমুখী প্রতিবর্তগুলিকে স্থানীয় সহজাত প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। ঠোঁটের কোণায় অথবা গালে একটুখানি স্পর্শ করলে ক্ষুধার্ত শিশুর মধ্যে একটা সন্ধানী প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে: সে মাথা ফেরায় সেই উদ্দীপকটির দিকে এবং হাঁ করে। আরও কতকগুলি সহজাত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়: স্তন্যপান প্রতিবর্ত — শিশু তার মুখের ভিতর কোনো জিনিস রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি চুষতে শুরু করে; আঁকড়ে ধরার প্রতিবর্ত — হাতের চেটো স্পর্শ করলে আঁকড়ে-ধরার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; পায়ের তলায় স্পর্শ করলে ঠেলে দেওয়ার (গুটিসুটি মারার) প্রতিবর্ত দেখা দেয়।

এইভাবে, শিশু সঙ্গে নিয়ে আসে কতকগুলি অ-সাপেক্ষ প্রতিবর্ত যেগুলি জীবনের প্রারম্ভিক দিনগুলিতে দেখা দেয়। অধিকাংশ সহজাত প্রতিক্রিয়াই শিশুকে তার অস্তিত্বের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। এই প্রতিক্রিয়াগুলি নবজাতককে সক্ষম করে তোলে নতুন ধরনের শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে এবং আহার্য গ্রহণ করতে। জন্মের আগে ভ্রূণ বিকাশলাভ করে মায়ের দেহযন্ত্রের কৃপায় (অমরা শিরাগুলির ভিতর দিয়ে পুষ্টি আর

অক্সিজেন মায়ের রক্ত থেকে চলে যায় ভ্রূণের রক্তে), আর জন্মের পরে শিশুর দেহযন্ত্র ফুসফুসগত নিশ্বাসপ্রশ্বাস আর মৌখিক আহার্যগ্রহণের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই মানিয়ে-নেওয়াটা ঘটে একটা প্রতিবর্ত হিসেবে। ফুসফুস বায়ুতে পূর্ণ হয়ে গেলেই সমগ্র পেশীতন্ত্র যোগ দেয় ছন্দঃপূর্ণ নিশ্বাসপ্রশ্বাসে। আহার্য গ্রহণ চলে স্তন্যপান প্রতিবর্ত মারফৎ। যে সহজ প্রবৃত্তিগত গতিবিধি স্তন্যপান প্রতিবর্তে অন্তর্ভুক্ত, সেগুলি প্রথমে ভালোভাবে সমন্বিত থাকে না: স্তন্যপানের সময়ে শিশুর দম আটকে যেতে শুরু করে, নিশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁসফাঁস করে এবং তার শক্তি খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের একটা প্রতিবর্তী স্বয়ংক্রিয়তা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: শিশুর দেহযন্ত্র তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রমেই আরও ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী কালটাই একজন ব্যক্তির জীবনে একমাত্র সময় যখন জৈব চাহিদা পূরণের দিকে চালিত সহজপ্রবৃত্তিজাত ধরনের আচরণের প্রকাশ লক্ষ করা যায় সেগুলির বিশুদ্ধ রূপে। কিন্তু এই সমস্ত চাহিদা মনোগত বিকাশের বনিয়াদ হতে পারে না, শিশুর বেঁচে থাকা নিশ্চিত করতে পারে শুধু।

জটিল এক প্রস্ত অ-সাপেক্ষ প্রতিবর্ত পশুশাবককে সক্ষম করে তোলে তার স্বাভাবিক অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সক্রিয় রক্ষণমূলক, শিকারসংক্রান্ত, জননী-সুলভ ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়া সহ একটি প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণী হয়ে উঠতে। কিন্তু শিশুর অ-সাপেক্ষ প্রতিবর্তগুলি

মানবিক ধরনের আচরণের আবির্ভাবকে নিশ্চিত করে না।

মানবশিশু তাই আরও বেশি অসহায়, কারণ পশুশাবকের চেয়ে অনেক কম এক প্রস্থ সহজাত প্রতিক্রিয়া সে সঙ্গে করে আনে। মানবিক আচরণের সমস্ত ধরনগুলি এখনও বিকশিত হওয়া বাকি। কিন্তু, শিশু যে অনেকগুলি সহজাত ধরনের আচরণের অধিকারী নয়, এই ঘটনাটাই তার শক্তি, দুর্বলতা নয়।

মনোবিদ্যাগত গবেষণা প্রতিপন্ন করেছে যে নবজাত শিশুর মূল বৈশিষ্ট্য হল তার নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করার ও মানুষের পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক আচরণের ধরনধারন আয়ত্ত করার সীমাহীন ক্ষমতা। জৈব চাহিদাগুলি যথেষ্টভাবে পূরণ হলে সেগুলির প্রাথমিক গুরুত্ব অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়, আর লালন-পালন যখন সঠিকভাবে হয় তখন গড়ে ওঠে নতুন নতুন চাহিদা (নানা জিনিসের ছাপ বা ধারণা পাওয়া, গতিবিধি, প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে আদান-প্রদান): মনোগত বিকাশ ঘটে এই বনিয়াদের উপরে।

ধারণা পাওয়ার চাহিদা তার গোড়ায় যুক্ত থাকে অভিমুখীনতাগত প্রতিবর্তগুলির সঙ্গে এবং তা বিকশিত হয় এই সমস্ত ধারণা বা ছাপ গ্রহণ করার জন্য শিশুর সংবেদজ ইন্দ্রিয়গুলির প্রস্তুতাবস্থা অনুযায়ী। দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় জীবনের প্রথম দিন থেকে কাজ করতে থাকলেও, সেগুলির ক্রিয়া অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। দৃশ্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় একমাত্র অত্যন্ত কাছাকাছি কোনো আলোর উৎস দ্বারা, আর শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রতিক্রিয়া হয় শুধু

তীব্র কোনো শব্দে। জীবনের প্রারম্ভিক সপ্তাহ ও মাসগুলিতে দর্শন ও শ্রবণ ত্রুটিহীন থাকে। শিশু চলমান বস্তুগুলিকে অনুসরণ করতে শুরু করে তার চোখ দিয়ে, তারপর স্থির বস্তুগুলির উপরে তার দৃষ্টি থেমে যেতে শুরু করে। অপেক্ষাকৃত কম তীব্র শব্দে তার প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করে, বিশেষ করে কোনো প্রাপ্তবয়স্কের কণ্ঠস্বরে। দৃশ্য ও শ্রাব্য অস্বস্তিদায়ক উপাদানগুলির সাড়ায় বাহু, পা আর মাথার আবেগতাড়িত নড়াচড়ায় একটু স্তব্ধতা ঘটে, যদিও তখনও সেটা খুবই সামান্য স্তব্ধতা: কান্না বন্ধ হয়ে যায়, দেখা দেয় দর্শন ও শ্রবণের একটা কেন্দ্রীভবন।

শিশু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মুখের দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে দৃশ্য লক্ষণগুলি থেকে শিশু বিভিন্ন মডেল আলাদা করে বুঝতে পারে; আকৃতিহীন অনেকগুলি রঙিন দাগের চেয়ে একটা সাদা-কালো চেহারার দিকে সে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকবে; মানুষের মুখের দৃশ্য অবয়ব সমেত ডিম্বাকৃতি একটি বস্তুর দিকে সে একই রকম অবয়বের একটা এলো-মেলো বিন্যাসের দিকের চেয়ে অনেক বেশি ঘন ঘন তাকিয়ে দেখবে।

বলতে গেলে, জন্মের পর প্রথম দিনগুলি থেকেই শিশু নানা ধরনের শব্দ আর গন্ধ আলাদা করতে পারে। নবজাত শিশুদের কান খুব তীক্ষ্ম। নিচুস্বরে কথাবার্তা আর গান তাদের আকর্ষণ করে। প্রাপ্তবয়স্কের কণ্ঠস্বরের প্রবোধমূলক শব্দে তারা শান্ত হয়ে যায় এবং মনোনিবেশ

করে। উচ্চ-স্বরে গোলমাল বা কণ্ঠস্বরের নেতিবাচক সুর শিশুকে ভীত করে, তাকে কম্পিত করে ও কাঁদায়।

নবজাত শিশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে তার দর্শন ও শ্রবণশক্তি তার দেহের নড়াচড়ার চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি বিকাশলাভ করে। পশুশাবকের থেকে মানবশিশুর তফাৎটা এইখানেই, পশুশাবকের নড়াচড়া ত্রুটিহীন হয় সর্বপ্রথমে।

দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকাশ আর বাহ্যিক উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াগুলির ত্রুটিহীনতা ঘটে শিশুর নার্ভ-তন্ত্রের, প্রথমত তার মস্তিষ্কের পরিপক্বতাপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। একটি নবজাত শিশুর মস্তিষ্কের ওজন একজন প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্কের ওজনের এক-চতুর্থাংশ। প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্কে যত নার্ভ কোষ আছে তারও ততগুলি নার্ভ কোষ থাকলেও, সেই কোষগুলি পর্যাপ্তভাবে বিকাশপ্রাপ্ত নয়। তা হলেও, জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী কালে (এমন কি যথাকালের পূর্বেই জন্মানো শিশুদের মধ্যেও) শর্তাবদ্ধ প্রতিবর্তগুলির বিকাশ খুবই সম্ভব। এতে প্রমাণ হয় যে মস্তিষ্কের উচ্চতর অংশগুলি, গুরু মস্তিষ্কের ধূসর বাহ্যাংশ ব্যবহৃত হয় বাহ্য পৃথিবীর সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়। জীবনের প্রথম দিন থেকে মস্তিষ্কের ওজন দ্রুত বাড়তে থাকে এবং নার্ভের তন্তুগুলি বেড়ে ওঠে ও নার্ভ-তন্তু-আবরক ঝিল্লিতে আবৃত হয়। যে সমস্ত অংশ বাহ্যিক ছাপ গ্রহণের কাজে জড়িত, সেগুলি বিশেষ দ্রুততায় বিবর্ধিত হয়: দুই

সপ্তাহের মধ্যে, গুরু মস্তিষ্কের ধূসর বাহ্যাংশে দৃষ্টিকেন্দ্রের অধিকৃত এলাকাটা ১,৫ গুণ বেড়ে যায়।

কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে মস্তিষ্কের পরিণতিপ্রাপ্তি নিজে থেকেই শিশুর সংবেদজ ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে। এই বিকাশ প্রভাবিত হয় শিশুর বাইরে থেকে পাওয়া ছাপ দিয়ে। অধিকন্তু এই সমস্ত ছাপ ছাড়া মস্তিষ্কের পরিণতিপ্রাপ্তি অসম্ভব। জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী কালে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক পরিণতিপ্রাপ্তির জন্য একটি আবশ্যিক শর্ত হল সংবেদজ ইন্দ্রিয়গুলির (বিশ্লেষকগুলির) চালনা এবং বাহ্যিক পৃথিবীর কাছ থেকে সেগুলির মধ্য দিয়ে পাওয়া নানা ধরনের সংকেতের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ। শিশুকে যদি সংবেদজ বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় (যথেষ্ট সংখ্যক বাহ্যিক ছাপ না থাকার অবস্থায়) রাখা হয়, তা হলে শিশুর বিকাশে গুরুতর প্রতিবন্ধ ঘটে। অন্য দিকে, শিশু যদি যথেষ্ট ছাপ পায় তা হলে অভিমুখীনতাগত প্রতিবর্তগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটে, তা প্রকাশ পায় দেখা আর শোনাকে কেন্দ্রীভূত করার সামর্থ্যের মধ্যে এবং পরবর্তী কালে অঙ্গ-সঞ্চালন আয়ত্ত করা আর মনোগত প্রক্রিয়া ও গুণাবলী গড়ে ওঠার ভিত্তি সৃষ্টি হয়। শিশুর স্নায়ুতন্ত্র ও সংবেদজ ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক সেইসব দৃশ্য ও শ্রাব্য ছাপগুলির উৎস হয়ে ওঠে প্রাপ্তবয়স্করা, এবং যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, প্রাপ্তবয়স্করাই এই সব ছাপের সংগঠক। প্রাপ্তবয়স্কই

শিশুর কাছে বস্তুসমূহ নিয়ে আসে, তার উপরে ঝুঁকে পড়ে, তার উদ্দেশে কথা বলে এবং এইভাবে তার অভিমুখীনতাগত প্রতিক্রিয়াগুলিকে সক্রিয় করে তোলে।

আদান-প্রদানের চাহিদা

নবজাত শিশু তার জীবন শুরু করে চিৎকার দিয়ে। জীবনের প্রথম দিনগুলিতে খাদ্য, নিদ্রা আর উষ্ণতার চাহিদার সঙ্গে জড়িত অপ্রিয় অনুভূতিগুলিতে শিশু তার প্রতিক্রিয়া দেখায় চিৎকার দিয়ে: ক্ষুধা, ভিজে কাঁথা প্রভৃতি কাজ করে কান্নার কারণ হিসেবে। স্বাভাবিক লালন-পালনের সঙ্গে সঙ্গে নবজাত শিশুর কান ফাটানো 'ওঁয়া ওঁয়া' অলক্ষে পরিবর্তিত হয়ে যায় নেতিবাচক ভাবাবেগের অপেক্ষাকৃত কম প্রচণ্ড একটা অভিব্যক্তিতে — কান্নায়। কান্না হয়ে ওঠে সব ধরনের কষ্টভোগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, তা সে শারীরিক বেদনাই হোক, অথবা (অবশ্য অনেক পরে) মানসিক যন্ত্রণাই হোক।

হাসি সদর্থক ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটায়, সেটা দেখা দেয় কান্নার চেয়ে পরে। হাসির আকারে সর্বপ্রথম সদর্থক ভাবাবেগের যথেষ্ট স্পষ্ট প্রকাশ আমরা লক্ষ করতে পেরেছি জীবনের প্রথম মাসের শেষ আর দ্বিতীয় মাসের গোড়ার দিকে, যখন কোনো একটি বস্তুর দিকে শিশুটির দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার পর, অথবা শিশুর উদ্দেশে একজন প্রাপ্তবয়স্কের আদরের মিষ্টি-কথা আর হাসির জবাবে শিশুর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে

আসা যায় যে সদর্থক ভাবাবেগ জাগ্রত করার জন্য নিছক জৈব চাহিদা পূরণ করাই যথেষ্ট নয়। তা শুধু নেতিবাচক ভাবাবেগকে দূর করে এবং এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যেখানে শিশু একটা আনন্দপূর্ণ অনুভূতি ভোগ করতে পারে। কিন্তু এই অনুভূতিটাই জাগ্রত হয় প্রাপ্ত ছাপগুলির দ্বারা, মুখ্যত একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাপগুলির দ্বারা।

শিশুর মধ্যে এক বিশেষ ভাবাবেগ-চালক প্রতিক্রিয়া একটু একটু করে গড়ে ওঠে, সেটি চালিত হয় একজন প্রাপ্তবয়স্কের দিকে, এবং যাকে আমরা বলি একটা উচ্ছল হওয়ার অবস্থা। শিশু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার উপরে ঝুঁকে-পড়া ব্যক্তিটির মুখে, তার দিকে তাকিয়ে হাসে, নিজের হাত পা নাড়ায় এবং মৃদুস্বরে কল্‌কল্‌ করে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে সংস্পর্শের চাহিদার এই অভিব্যক্তিই শিশুর প্রথম সামাজিক চাহিদা। উচ্ছল হওয়ার অবস্থা হল সেই উপায়, যার দ্বারা শিশু একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে অবস্থিতিগত-ব্যক্তিগত আদান-প্রদান চালায়।

আদান-প্রদানগুলি একজন ব্যক্তির আরেক জন ব্যক্তির জন্য চাহিদাকে পূরণ করে। এই চাহিদাটা সরল চাহিদা নয়, বরং তাতে থাকে আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে এক ব্যক্তির বহুবিধ মনোভাব এবং অন্যজনকে স্বীকার করার প্রস্তুতাবস্থা; রক্ষার বাসনা ও রক্ষা করার ইচ্ছুকতা; নিজেকে অপরের বিপরীতে স্থাপন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা; আরেকজনের জন্য এক ব্যক্তির আন্তর

চাহিদাকে পূরণ করার বাসনা। ল. ই. আন্ৎসিফেরভা আদান-প্রদানের একটা কৌতূহলোদ্দীপক ধারণা উপস্থিত করেন: 'আদান-প্রদান হল ব্যক্তিত্বের কথোপকথন প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি; যে ব্যক্তিত্বের অন্তর্জগৎ ক্রিয়া করে সামাজিক মডেলগুলির কাঠামোয় গঠিত আভ্যন্তরিক শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে একজন মানুষের গূঢ় কথোপকথন হিসেবে।'* এইসমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী বা একেক জন কথোপকথকের সামনে ব্যক্তিত্ব এক বিশেষ অবস্থান গ্রহণ করে এবং তার মধ্যে নিজেকে চরিতার্থ করতে চেষ্টা করে। আদান-প্রদানের জন্য দরকার হয় অন্তত দুজন অংশগ্রাহী।

প্রাপ্তবয়স্ক আর শিশুর মধ্যে আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করে দুজনেই। প্রাপ্তবয়স্ক শেখে শিশুটির সঙ্গে ভাব-বিনিময় করতে, ঠিক যেমন শিশুটিকেও শিখতে হয় প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে।

এ কথা সুবিদিত যে কমবয়সী মায়েরা নিজেদের সম্পর্কে অত্যন্ত অনিশ্চিত বোধ করে। পৃথিবীতে শিশুর আবির্ভাবের বাস্তব ঘটনাটা একজন নারীর কাছে এসে পৌঁছয় সে প্রসূতিসদন থেকে ফিরে আসার পরেই এবং তার শিশুসন্তানের সঙ্গে নিজেকে একা অবস্থায় পাওয়ার পরেই। অধিকাংশ জননীই যখন প্রথমে উপলব্ধি করে যে এই ক্ষুদে প্রাণীটির জীবনের সমস্ত দায়িত্ব তাদেরই

---

* আন্ৎসিফেরভা ল. ই.। মনোবিদ্যার পদ্ধতিতত্ত্বগত নীতিসমূহ ও সমস্যাবলী। — 'মনোবিদ্যা বিষয়ক পত্রিকা,' খণ্ড ৩, সংখ্যা ২, ১৯৮২, পৃঃ ১৩ (রুশ ভাষায়)।

উপরে তখন তাদের কিছুটা ভয় হয় এবং তাদের মধ্যে জাগতে শুরু করে অ-পর্যাপ্ততা আর অনিশ্চয়তাবোধ। শিশুসন্তানটির প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি আসে নানানভাবে। কোনো কোনো জননীর মধ্যে শিশুর জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই মাতৃস্নেহের বিপুল প্লাবন দেখা দেয়, আবার অন্যদের কাছে এই ভাবাবেগ সঙ্গে সঙ্গেই আসে না।

নিজের কথা বলতে গেলে, আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের পুত্রদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে আমার মধ্য থেকে কোনো বিশেষ উৎসাহ নিঃসৃত হয় নি। তাদের যখন বাড়িতে নিয়ে এসে মোড়ক খোলা হল, তখন তাদের সর্বব্যাপী সক্রিয়তা দেখে আমার অদ্ভুত লেগেছিল। আমি এমন কথা বলতে পারছি না যে চারটা হাত আর চারটা পায়ের নিরন্তর নড়াচড়া আর দুটি মুখের অন্তহীন মুখবিকৃতি দেখে আমার মধ্যে মাতৃস্নেহের বান ডেকেছিল। নবজাতকদের আমি এই প্রথম দেখছিলাম, এবং তাদের অসাধারণভাবে চিত্তাকর্ষক বলে আমার মনে হয় নি।

মাতৃসুলভ ভাবাবেগ বিকশিত হয় ক্রমে ক্রমে। মাকে তার শিশুসন্তানের যত্ন নিতে হয়, সে কাজটা মাকে করতে হয় দিনে চব্বিশ ঘণ্টা। শিশু দিন-রাতের প্রভেদ করতে না পেরে, এবং যখন তখন 'ওঁয়া ওঁয়া' করে মাকে আহ্বান করে কমবয়সী মাকে বিব্রত করতে পারে। শিশুর প্রতি মনস্তাত্ত্বিক অভিনিবেশ মাকে বিশ্রাম নিতে, অথবা নিজের কথা ভাবতে দেয় না। এবং তা মনে মনে চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং তাকে বিরক্ত করে তোলে। তা সত্ত্বেও,

অসহায় জীবটির জন্য উদ্বেগ সঙ্গে করে নিয়ে আসে তার জন্য একটা আশঙ্কাবোধ, তার প্রতি বেদনাদায়ক স্নেহবোধ, তার প্রতি নজর রাখা এবং তাকে আনন্দ ও স্বস্তি দেওয়ার বাসনা। মাতৃস্নেহ ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়।

প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে আদান-প্রদানের কোনো উপায়ই নবজাত শিশুর নেই। জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহে শিশুর আচরণ সম্পর্কে গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে জন্ম-পরবর্তী প্রারম্ভিক কালপর্বে শিশুর মধ্যে তার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আদান-প্রদানের চাহিদার কোনো বিকাশপ্রাপ্ত রূপ থাকে না। পরবর্তীকালে, আদান-প্রদানের চাহিদা গড়ে ওঠে সুনির্দিষ্ট অবস্থার প্রভাবে।

প্রথম, চারপাশের লোকজনের যত্ন আর উদ্বেগের জন্য শিশুর বিষয়গত চাহিদা। শিশু তার ঘনিষ্ঠতম প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ত সহায়তার মধ্য দিয়েই শুধু টিকে থাকতে পারে সেই সময়টায়, যখন সে স্বাধীনভাবে নিজের জৈব চাহিদাগুলি পূরণ করতে অপারগ থাকে। প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি এই আগ্রহ এখনও পর্যন্ত আদান-প্রদানের জন্য চাহিদা নয়। আমরা ভালোভাবেই জানি, শিশু জন্ম-পরবর্তী প্রথম কয়েক দিন অস্বস্তি দূর করার জন্য এবং তার যা দরকার তা পাওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ককে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে শেখে নানা ধরনের কান্না, ফোঁপানি, মুখবিকৃতি এবং সারা দেহ দিয়ে নির্দিষ্ট আকারহীন অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে।

দ্বিতীয়, শারীরিক সংস্পর্শের, কিংবা মার্কিন মনোবিদ হ্যারি হারলো যাকে বলেন 'সান্ত্বনাদায়ক সংস্পর্শ' তার

জন্য একটা চাহিদা। শিশু স্পর্শলাভের প্রয়োজন বোধ করে, তাকে কোলে তুলে নিলে, কেউ তাকে নিজের শরীরে জড়িয়ে ধরলে কিংবা ঠোঁট দিয়ে তাকে ছুঁলে সান্ত্বনা পায়। এখনও পর্যন্ত এটা আদান-প্রদান নয়। প্রথম স্তরে শারীরিক সংস্পর্শের এই চাহিদা বানরশাবকের চাহিদার অনুরূপ। হারলোর গবেষণা দেখিয়েছে যে 'সান্ত্বনাদায়ক সংস্পর্শ' যারা পায় নি (তাদের মায়েরা তাদের গ্রহণ করে নি এবং শারীরিক সুরক্ষার পরিচয় দেয় নি) সেই সব পশুশাবক বড় হয়ে উঠেছে কিছুটা নিকৃষ্ট ধরনের প্রাপ্তবয়স্ক পশু হিসেবে। যেখানে 'সংস্পর্শের' স্তরে খুব কমই মনোযোগ দেওয়া হয় সেইসব শিশুভবনে যেসব শিশু বড় হয়ে ওঠে, তারাও তাদের বিকাশের দিক দিয়ে কিছুটা অনগ্রসর।

আদান-প্রদানের চাহিদার এই সমস্ত পূর্বশর্ত বিকাশলাভ করে শিশুটির সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্কের কাজকর্মের ভিত্তিতে।

তৃতীয়, একজন প্রাপ্তবয়স্কের আচরণ। শিশু অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ভাবাবেগগত সংস্পর্শের প্রয়োজনটাই শুধু বোধ করে। আদান-প্রদানের কোনো উপায় তার নেই, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুর উদ্দেশে কথা বলে নিয়তই এমন একটা সাড়া সন্ধান করে যার দ্বারা সে বুঝতে পারে শিশুটি এই আদান-প্রদানে যোগ দিচ্ছে কি না। প্রাপ্তবয়স্ক (বিশেষত মা!) মনোযোগ বা হাসির অভিব্যক্তির অনুরূপ মুখের যে কোনো অভিব্যক্তিকে — এবং জীবনের একেবারে প্রথম দিনেই এগুলি ঘটে — সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় শিশুর পক্ষ থেকে আদান-প্রদানের শুরু হিসেবে।

তাই শিশুর প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক এমন আচরণ করতে শুরু করে যেন সে তখনই আদান-প্রদানের শুরু করতে সক্ষম। এরই কল্যাণে শিশু আকৃষ্ট হয় বিনিময়ের মধ্যে আর ক্রমে ক্রমে তা হয়ে ওঠে একটা মৌল প্রয়োজন।

শিশু অপরের সঙ্গে আদান-প্রদানের উপায়ের বিকাশ ঘটায়। শৈশবে আদান-প্রদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল অভিব্যক্তিপূর্ণ চালক-প্রতিক্রিয়াগুলি। শিশুর ভাবাবেগগত স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার জন্য তার আদান-প্রদানের জন্য আবেদনে অবশ্যই সাড়া দেওয়া দরকার। যে সমস্ত শিশু ভাবাবেগগত উৎসাহ পায় না, তারা পরে তাদের নিজস্ব প্রত্যক্ষ ক্রিয়া নিজেদের মধ্যেই গুটিয়ে রাখে, ভবিষ্যতে আদান-প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে না। নিজের প্রতি আস্থা, নিজের প্রতি আস্থাহানির মতোই, ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের ভাবাবেগগত ভিত্তি সৃষ্টি করে।

শিশুদের সঙ্গে আদান-প্রদান সংগঠিত করার সময়ে প্রাপ্তবয়স্ককে প্রথমে অবশ্যই জানতে হবে যে জীবনের বিভিন্ন স্তরে শিশুর দরকার হয় বিভিন্ন ধরনের আদান-প্রদান। দু-মাস অথবা তিন মাস বয়সের বাচ্চার পক্ষে আদান-প্রদানের অভিব্যক্তিপূর্ণ দিকটি গুরুত্বপূর্ণ: ছোঁয়া, মৃদু থাবড়ানো এবং ভাবাবেগগতভাবে বর্ণাঢ্য কথাবার্তা। এক বছর বয়সের শিশুরা শারীরিক সান্ত্বনাপ্রদানে সন্তুষ্ট হয় না, আর থাবড়ালে তাদের অস্বস্তি হতে থাকে। এই বয়সে শিশুরা আকৃষ্ট হয় সম্মিলিত বিষয়ী ক্রিয়ার ভিত্তিতে আদান-প্রদানের দ্বারা, এবং আদান-

প্রদানের অভিব্যক্তিপূর্ণ দিকটি একটা সম্মিলিত আনন্দানুভূতির রূপ পরিগ্রহ করে একটি বস্তু আয়ত্ত করার দরুন, এবং সংস্পর্শকে উৎসাহিত করার মধ্যে।

নবজাতকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

জন্মের ঠিক পরেই শিশুর মনোগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত পার্থক্য লক্ষ করি, যেটা প্রথমত প্রত্যেক শিশুর জন্মগত চারিত্রবৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত। এমন কি অ-সাপেক্ষ প্রতিবর্তগুলিও নবজাত শিশুদের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। সেগুলির অনেকগুলির বহিঃপ্রকাশেই আমার দুই শিশুপুত্র এই সময়টায় পরস্পরের থেকে রীতিমত আলাদা ছিল।

যমজ শিশুদুটির জন্ম হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ তারিখে। প্রথমে যেটি জন্মায় তার নাম রাখা হয় কিরিল (ঘরোয়া নাম কিরিউশা) এবং ছোটটির আন্দ্রেই (ঘরোয়া নাম আন্দ্রিউশা)। কিরিউশা ৫৫ মিনিটের বড়। তার ওজন ছিল ২ কিলোগ্রাম ৬৫০ গ্রাম, তার ভাইয়ের — ৩ কিলোগ্রাম ১০০ গ্রাম; তাদের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৪৯ ও ৫১ সেণ্টিমিটার।

দুটি বাচ্চারই গায়ের রঙ ছিল গাঢ়, ভ্রূ আর পক্ষ্মগুলি স্পষ্ট-চিহ্নিত, এবং ঘন আর দীর্ঘ কালো চুল। মুখের গড়ন ছিল সব নবজাতকেরই সচরাচর যেমন থাকে তেমন: চওড়া কপাল, বড় বড় নাসারন্ধ্রসহ ছোট নাক, নিচের চোয়াল ছোট আর নিচের ঠোঁটটা ভিতর দিকে ঢোকানো।

5—1997

তাদের মাথা আর শরীর ছিল বড়, হাত-পা ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট আর ছন্দঃময়ভাবে গতিশীল। শিশুদুটির চালক-প্রতিক্রিয়ার সমাপতন ঘটেছিল, যেন তাদের ভিতরে একই যন্ত্র কাজ করছিল।

শরীরের গঠনে একটা লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল: কিরিউশার কাঁধদুটি ছিল সোজা, আর আন্দ্রিউশার ঢালু। আন্দ্রিউশা স্তন্যপান করত বেশি সক্রিয়ভাবে, জেগে থাকত বেশিক্ষণ আর ঘুমন্ত অবস্থায় প্রায় নিথর হয়ে থাকত। কিরিউশা ছিল মন্থর ধরনের, স্তন্যপান করত দুর্বলভাবে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব কিছু করাতে হত, ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতে হত এবং ঘুমন্ত অবস্থায় সব সময়ে ছটফট করত।

২১শ* দিন। আমার শিশুসন্তানদের আমি রোজ লক্ষ করছি। ঘুম, খাওয়া, স্নান করা, কাঁথা বদলানো, শিশুর জাগতিক অস্তিত্ব যেসব বাহ্যিক বিষয় দিয়ে গঠিত সেই সবগুলিই। কিছুই বদলেছে বলে মনে হয় না। জড়ানো জামা-কাপড় খুলে ফেলা অবস্থায় শিশুদুটি এখনও হাত, পা আর মাথা নাড়াচ্ছে ছন্দঃময়ভাবে। এই নড়াচড়ার মধ্যে নিজস্ব এক ধরনের সমন্বয় রয়েছে, হাত-পা আর মাথার নড়াচড়া একটিমাত্র ছন্দে সংগঠিত। হাত আর পা প্রায় সব সময়েই অর্ধেক বাঁকানো, পুরোপুরি সোজা হয় খুবই কদাচিৎ।

কিরিউশা আগের মতোই মন্থর। ডাক্তার দুঘণ্টা অন্তর খাওয়ানোর সুপারিশ করেন।

---

* মাসে এবং দিনে বয়সের হিসাব দেওয়া হয়েছে।

হাতের চেটোয় স্পর্শজনিত উত্তেজনা ঘটলে তাদের দুজনের মধ্যেই আঁকড়ে ধরার প্রতিবর্ত দেখা দেয়। কিন্তু, এই প্রতিবর্ত যেভাবে অভিব্যক্ত হয় সেই মাত্রার মধ্যে একটা তফাৎ আছে: কিরিউশা তার আঙুলগুলি শুধু বাঁকায় একটুখানি, জিনিসটাকে তার হাতে ধরে না; আন্দ্রিউশা আঁকড়ে ধরে সজোরে। কিরিউশার হাতের চেটোয় কেউ তার আঙুল রাখলে সে হাল্কাভাবে তা ধরে কিন্তু তারপর সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দেয়। আন্দ্রিউশা এমন শক্ত করে আঁকড়ে ধরে যে তার শিশুশয্যা থেকে সামান্য একটু উঁচুতে তাকে তুলে ফেলা যায়। আমি ওদের দুজনের সঙ্গেই রোজ এই অনুশীলনটা করি। একেবারে নতুন নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যতবারই কেউ তাদের কাছে গিয়ে কথা বলতে শুরু করে, ততবারই তারা তাদের চালক-ক্রিয়া থামিয়ে দেয়। এক মুহূর্তের জন্য তারা থেমে যায়, তারপরই আবার গতানুগতিক নড়াচড়া চালিয়ে যায়।

তারা নিথর বস্তুগুলির দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে শুরু করেছে। সেই সমস্ত মুহূর্তে কৌতূহলোদ্দীপক সব চালক-প্রতিক্রিয়া ঘটে। কখনও নড়াচড়া এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে যায়: শিশুটি তখন পুরোপুরি ধ্যানস্থ। পর মুহূর্তেই, সেই বিষয়টির প্রতি একাগ্র মনোনিবেশের মুহূর্তটির আগে হাত-পায়ের নড়াচড়া যেমন ছিল তার চেয়ে দ্রুততর হয়ে যায়। যে জিনিসটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, এই সমস্ত নড়াচড়ায় সেই জিনিসটির প্রতি একটা প্রবণতা দেখতে পেলে আমি সত্যিই খুশী হতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখনও পর্যন্ত তা আমি দেখতে পাচ্ছি না।

আন্দ্রিউশা জিনিসটিকে তার দৃষ্টি দিয়ে অপেক্ষাকৃত যথাযথভাবে ধরে থাকে। কিরিউশার বেলায়, ক্রিয়াটা প্রায়শই শেষ হয় ব্যর্থতার মধ্যে। একটা জিনিসের দিকে কিরিলের তাকিয়ে থাকার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণের বিশদ একটি বিবরণ আমি দেব।

সে ধীরস্থির। তার হাত-পা নড়াচড়া করে গতানুগতিক ভঙ্গিতে। তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায়, কোনো জিনিসের উপরে স্থির হয়ে থাকে না। দাঁড়ান! তার দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে এল একটা উজ্জ্বল ঝুম্‌ঝুমি। সে স্থির হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য জিনিসটির দিকে দৃষ্টির অক্ষরেখায় একটা প্রতিসম সংকোচন আমি দেখতে পেলাম। কিন্তু এই সমকেন্দ্রাভিমুখতা শিগগিরই ভেঙে গেল, চোখ দুটি অন্যদিকে সরে গেল আর শিশুর দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে জিনিসটি হারিয়ে গেল। এই মুহূর্তেই শুরু হয়ে যায় হাত পায়ের চঞ্চল, গতানুগতিক নড়াচড়া, ক্রমে ক্রমে তা কমে আসে কিন্তু একেবারে থেমে যায় না। শিশুটির নজর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। আবার অপ্রত্যাশিতভাবে তা একই খেলনার উপরে এসে পড়ে। সে স্তব্ধ হয়ে যায়। দুই চোখই প্রসারিত হয়ে থাকে সেই জিনিসটির দিকে। হাত পায়ের একটু-একটু নড়াচড়া শুরু হয়।... বাঁ চোখটা একদিকে সরে যায়। জিনিসটি ধরে রাখা আছে এক চোখে। শরীর নিশ্চল। চোখটা আবার ফিরে আসে। দাঁড়ান! দুটো চোখই জিনিসটির প্রতি নিবদ্ধ। হাত পা একটু-একটু নড়াচড়া করছে।... বাঁ চোখটা নাকের দিকে সরে যেতে থাকে। দ্বিতীয় চোখটিও তার দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে

খেলনাটিকে হারিয়েছে। চাঞ্চল্যপূর্ণ চালক-প্রতিক্রিয়া... একটু কমে যায়... খেলনাটি আবার তার দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে এসেছে। তাকিয়ে আছে এবং হাত পা নাড়াচ্ছে। এবারে তার দৃষ্টি থেকে জিনিসটি হারিয়ে গেল।

এইবারে সে একই জিনিসটির প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য পনেরোবার প্রচেষ্টা চালাল, তারপর কাঁদতে শুরু করল (হয়তো তার শীত করছিল, হয়তো সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; মনে হয় তাকিয়ে থাকতে শেখাটা খুবই কঠিন কাজ)।

একাগ্র মনোনিবেশের সময়ে আন্দ্রিউশারও একই রকম চালক-প্রতিক্রিয়া হয়, কিন্তু তার চোখ সরে যায় না বা টেরা হয় না।

১·০। আজ যমজ শিশুদুটির এক মাস বয়স হল। কিরিউশা এই প্রথম চোখের জল ফেলল। আন্দ্রিউশা 'ভিজে' কান্না কাঁদতে শুরু করেছিল ২৭ দিনের মাথায়। জাগ্রত অবস্থায় তারা 'মুখ ভেঙচিয়ে' চলেছে।

শিশুদুটিকে আমি রোজ স্নান করাই। তারা তাদের ছোট্ট স্নানের গামলায় শান্তভাবে শুয়ে থাকে, তাদের চোখ বিস্ফারিত আর তাদের হাত শরীরের সঙ্গে আকুলভাবে চাপা থাকে। আমি যখন তাদের স্নান করাই এবং জামা-কাপড়ে জড়িয়ে দিই তখন তারা সব সময়েই চুপ করে থাকে। কিরিউশা একটা আবিষ্কার করে ফেলেছে — আবিষ্কার করেছে তার দুটো হাত আছে। হাত দুটি যখন তার দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে আসে সেই মুহূর্তেই হাত দুটির গতানুগতিক নড়াচড়া প্রায়শই বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতটা

তার মুখের উপরে এসে থেমে যায়, আর তার নজর আটকে থাকে হাতের চেটোতে (এই মুহূর্তে তার মুখের অভিব্যক্তি ভারি মজার: ভ্রূদুটি উপরে ওঠানো, চোখদুটি বিস্ফারিত আর অধরোষ্ঠ একসঙ্গে শক্ত করে চেপে-ধরা)।

তারা দুজনেই একটি জিনিসের দিকে আরও সঠিকভাবে দৃষ্টি স্থির করে রাখতে শুরু করেছে। মনোনিবেশ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এখনও থাকছে নড়াচড়ার ক্ষণিক আস্তে হয়ে যাওয়া এবং তার পরেই চাঞ্চল্যপূর্ণ চালক-প্রতিক্রিয়া। শিশুটি কখনও কখনও তার হাত পা সোজা করছে এবং হাত পা দিয়ে একটা ঝোলানো খেলনায় ধাক্কা দিতে পারছে।

কিরিউশা তার জড়ানো কাপড়চোপরের ভিতর থেকে তার বাহু মুক্ত করে আনতে শিখেছে এবং তার হাতের মুঠিদুটি সে নিজের মুখ পর্যন্ত টেনে আনতে পারে। দুটি মুঠিই যদি একসঙ্গে তার মুখে এসে পেঁছিয়, সে বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং কাঁদতে শুরু করে সে দুটো তার মুখে ঢুকছে না বলে। আমি চেষ্টা করি এই নড়াচড়া যাতে স্থিরনির্দিষ্ট হয়ে না যায়, তাই তাকে আঁটো করে জড়িয়ে দিই। আন্দ্রিউশা এই প্রতিক্রিয়া দেখায় নি একবারও।

আমি লক্ষ করে আসছি, স্নান করানো আর খাওয়ানোর পর আন্দ্রিউশা কেমনভাবে তার শিশুশয্যায় শান্ত হয়ে থাকে বাতিটার দিকে তাকিয়ে । সে প্রায়শই সেইভাবে শুয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অথচ কিরিউশা ঘুমিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে!

আঁকড়ে ধরার প্রতিবর্তের ভিত্তিতে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছি আমি। কিরিউশার মধ্যে যাতে আঁকড়ে ধরার প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠে তার জন্য চেষ্টা করে চলেছি অসফলভাবে। আমি আমার আঙুলগুলি দিয়ে আন্দ্রিউশাকে তার শয্যা থেকে কিছুটা উঁচুতে তুলে ধরি, সে অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঝুলে থাকে। সে উদ্বেগের লক্ষণ দেখালেই আমি তাকে শয্যায় শুইয়ে দিই।

ওদের সঙ্গে আমি শারীরিক ব্যায়াম করছি। তাদের শক্তসমর্থ শিশু করে তোলার চেষ্টা করছি, সবই ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী।

১·৬। শিশুদুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রোগনির্ণয় — নিউমোনিয়া। সেখানে তারা দুই মাস কাটাল। পরে দেখা গেল তাদের নিউমোনিয়া হয় নি। তাদের সঙ্গে শারীরিক ব্যায়াম ডাক্তাররা চালিয়ে গেলেন, এবং সব কিছুতেই খুব কড়া কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চললেন। এমন কি তাদের দিনে দুবার বসন্তের রোদে বাইরে নিয়ে আসা হতে লাগল। দুজনেই চটপট বড় হয়ে এবং সেরে উঠতে লাগল। আড়াই মাস বয়সে তারা সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকাতে শুরু করল এবং হাসা শুরু করল।

তাদের অনেকদিন ধরে হাসপাতালে রাখা হয়েছিল কিরিউশার দরুন: তার দেহের উঁচু তাপমাত্রার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। বিশেষজ্ঞদের ডাকা হল।

দেখা গেল কিরিউশার থার্মোনিউরসিস আছে। তার

শরীরের উচ্চ তাপ অসুস্থতার লক্ষণ নয়। ব্যাপারটা শুধু এই যে তার তাপ অসংগতিপূর্ণ এমন কি যখন একই সময়ে দেহের বিভিন্ন অংশে নেওয়া হয় তখনও। তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল, আর আমাকে কড়া আদেশ দেওয়া হল তার দেহের তাপ যেন আমি না নিই।

৩·৮। শিশুদুটি আবার বাড়িতে। এখন তাদের চেহারা আমার ভালো লাগছে: তাদের শরীর আরও বলিষ্ঠ, তাদের দৃষ্টি কোনো জিনিসের দিকে নিয়মিতভাবে চালিত। তারা দুজনেই তাদের হাত মন দিয়ে দেখে, মুখের উপরে ধরে রাখা একটি হাতের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। এমন কি হাত বরাবর তাকানো চোখের নড়াচড়াও লক্ষ করা যায়।

দুর্ভাগ্যবশত কিরিউশা এখনও টেরিয়ে থাকে।

আমরা খেলনা ঝুলিয়ে রাখলে শিশুদুটি তখনই সেগুলির দিকে তাদের নজর ফেরায় এবং খেলনাগুলির দিকে নড়াচড়া চালায়। কখনও তারা খেলনা আঁকড়ে ধরে, কিছুক্ষণ সেটাকে গতিহীন অবস্থায় ধরে রাখে অথবা আঁকড়ে ধরা জিনিসগুলি নিয়ে তাদের হাত ঝাঁকায় সহজপ্রবৃত্তিবশে।

তারা আর অনুভূতিশূন্য প্রাণী নয়। তাদের উপরে ঝুঁকে-পড়া প্রাপ্তবয়স্কদের দিকে চেয়ে তারা হাসে।

আমি তাদের হাতের শক্তি পরীক্ষা করি। প্রথমে আমি আমার আঙুল রাখি কিরিউশার হাতের চেটোতে। সে আঁকড়ে ধরে, নিজেকে একটুখানি তুলে ধরে, তারপরেই আমার আঙুল ছেড়ে দেয়।

আন্দ্রিউশার সঙ্গেও একই রকম করি। তার হাতের চেটোদুটি শক্তভাবে মুঠো হয়, সে নিজেকে উঁচু করে তোলে আমার হাত আঁকড়ে ধরে। বসে পড়ল, উঠে দাঁড়াল। তার চোখ গোল, ভ্রূ কুঞ্চিত। আমার নিজের দুঃসাহসে ভয় পেয়ে আন্দ্রিউশাকে আমি শুইয়ে দিলাম। একটু পরে আবার ব্যায়ামটা করি, শুধু এইবারে একটা লাঠি ব্যবহার করি। সে কিছুক্ষণ সেটা ধরে ঝোলে, তার বাহুদুটি বিস্তৃত, পা দুটি ভাঁজ করা। তাড়াতাড়ি আমি তাকে নামিয়ে শুইয়ে দিই, এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই সে আবার সেটি ধরে ঝুলে থাকে।

সোফায় শুয়ে শুয়ে শিশুদুটি 'একটু হাঁটে'। আমি তাদের একটা উজ্জ্বল খেলনা দেখাই। সেটির দিকে তারা তাকিয়ে দেখে। দুজনেই চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং ছন্দপূর্ণভাবে হাত পা নাড়ায়। নড়াচড়াগুলি জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী কালে যে রকম ছিল, এখনও ঠিক সেই রকম হলেও, নবজাত শিশুর এলোমেলো নড়াচড়ার তুলনায় সেগুলির মধ্যে একটা নির্দিষ্টতর ছন্দ আছে।

খেলনাটি আমি আস্তে আস্তে সরাতে থাকি, শিশুদুটি সেটিকে অনুসরণ করে মাথা ফেরায়। তাদের হাত পার নড়াচড়া ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। যেন নির্দেশক্রমে, তাদের মাথা খেলনাটিকে অনুসরণ করতে করতে প্রথমে বাঁ দিকে তারপরে ডান দিকে ফেরে। একটা শব্দের উৎসকে সরিয়ে নিলেও একই জিনিস ঘটে।

শিশুদুটি যে ঘরে আছে সেই ঘরে আমরা কথা বলতে

শুরু করলে, তারা শব্দের দিকে মাথা ফেরাতে চেষ্টা করে।

খাদ্য তারা বেশ ভালোভাবেই আলাদা করে বুঝতে পারে, এবং প্রত্যেকেরই একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। গাজরের রস তারা চামচে করে খায় সাগ্রহে, কিন্তু কমলালেবুর রস বা কড-লিভার অয়েল খাবে না কিছুতেই। তারা মাথা পিছন দিকে সরিয়ে নেয়, ঠোঁট টিপে থাকে, জিভ দিয়ে তা বার করে দেয়।

পেটের উপরে ভর দিয়ে শুয়ে থাকতে তারা ওস্তাদ। কিরিউশা তার মাথাটি বিশেষভাবে উঁচুতে তুলে ধরে। আন্দ্রিউশা ঠিক ততটা পারদর্শী নয়। তাদের পায়ের তলায় যদি কোনো ঠেকনোর সমর্থন রাখা হয়, তা হলে যমজ শিশুদুটি তাদের পায়ে ঠেলা দিয়ে সরে যেতে থাকে, যে টেবিলের উপরে তাদের রাখা হয়েছে তার উপরভাগে তাদের মাথা ঠুকে যায়।

আগেকার মতোই স্নান করতে তারা এখনও ভালোবাসে, জলের তাপমাত্রার পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়। স্নান করার সময়ে তাদের মুখের অভিব্যক্তিটা পরম সুখের। তাদের মুখ ধুইয়ে দেওয়ার সময়ে কেউই চোখ বন্ধ করতে চায় না, বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে, এ নিয়ে কিছুই করার নেই।

সন্ধ্যায় তারা একই ভাবে ঘুমোয় না। কিরিউশা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়ে। আন্দ্রিউশা চুপচাপ শুয়ে থাকে ঘণ্টা-দুয়েকের মতো, তারপর কাঁদতে শুরু করে। সে এত চেঁচামেচি করে যে তার শয্যা থেকে তাকে

তুলে নিয়ে আমি করিডোরে চলে যাই। সেখানে তাকে আমরা পালা করে কোলে রাখি — তার বাবা, দিদিমা আর আমি। কী করা যায়? এই চ্যাঁচানে বাচ্চাটা তার ভাইকে জাগিয়ে দিতে পারে। এমন কি আমাদের কোলেও সে সর্বশক্তি দিয়ে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে।

এইভাবে, অনন্যরূপে মানুষ হয়ে ওঠার জন্য আরও দুটি প্রার্থী পৃথিবীতে আবির্ভূত হল। অনেক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নবজাত শিশুরা একজন অপরজনের থেকে পৃথক বাহ্যিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে ক্রিয়ার মাত্রায়, বিভিন্ন উদ্দীপক উপাদানে তাদের সংবেদনশীলতায়, মেজাজে এবং তাদের ভাবাবেগগত প্রত্যাশার প্রকৃতিতে।

অধ্যায় ৩। আদি-শৈশবাবস্থায় শিশুর মানসিক বিকাশ

শিশুর জীবন নির্ভর করে পুরোপুরি একজন প্রাপ্তবয়স্কের উপরে, যে তার জৈব চাহিদা পূরণ করে, তাকে খাইয়ে দেয়, স্নান করিয়ে দেয় এবং পাশ ফিরিয়ে দেয়। তার নানা ধরনের ছাপের জন্য চাহিদা পূরণ করে দেয় প্রাপ্তবয়স্কই: শিশুটিকে যখন কোলে তুলে নেওয়া হয় তখন সে লক্ষণীয়ভাবেই উচ্ছল হয়ে ওঠে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের কল্যাণে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে শিশু অনেক বেশি পরিমাণ বস্তু দেখতে সক্ষম হয়, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে রাখা বস্তু দেখতে পায় এবং তারপরে সেগুলিকে নাড়াচাড়া করতেও পারে। একই ভাবে মূল শ্রবণগত ও স্পর্শগত ছাপও আসে প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে।

শিশুর সাধারণ চারিত্রবৈশিষ্ট্য

উচ্ছল হওয়ার অবস্থার মধ্যে লক্ষ করা যায় প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি শিশুর ইতিবাচক ভাবাবেগগত সম্পর্ক, এবং তার সঙ্গে সংস্পর্শ থেকে শিশুর স্পষ্টগোচর

সন্তুষ্টি। সমগ্র শৈশবকাল ধরে এই সম্পর্ক প্রসারিত হয়ে চলে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে ভাবাবেগগত বিনিময়ের বিরাট প্রভাব পড়ে শিশুর ভালো মেজাজের উপরে। শিশুটি যদি খেয়ালি হয়, খেলতে চায় না, তা হলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শুধু হাজির হয়েই শিশুটির মেজাজ ভালো করে দিতে পারে, তারপর আবার একা অবস্থায় সেই শিশুটি আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেই সমস্ত খেলনা নিয়েই, যেগুলিতে তার আর আগ্রহ ছিল না। চতুর্থ বা পঞ্চম মাস নাগাদ প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সম্পর্কটা হয়ে ওঠে বাছাইমূলক। শিশু 'তার আপন' আর অপরিচিত জনের মধ্যে প্রভেদ করতে শুরু করে, একজন পরিচিত প্রাপ্তবয়স্ককে দেখলে সে আনন্দিত হয়, অথচ একজন অপরিচিত নবাগতকে দেখে সে ভয় পেতে পারে।

শিশুর বিকাশের পক্ষে যে ভাবাবেগগত সংস্পর্শের এরূপ বিরাট ইতিবাচক গুরুত্ব, সেই ভাবাবেগগত সংস্পর্শের ফলে কিন্তু নেতিবাচক প্রলক্ষণও দেখা দিতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক যদি সর্বদাই শিশুর সঙ্গে থাকে, তা হলে শিশুটি নিয়ত মনোযোগ দাবি করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে, খেলনায় কোনো আগ্রহ দেখায় না, এবং একা থাকলে, এমন কি এক মিনিটের জন্য হলেও, কান্না শুরু করে।

লালন-পালনের সঠিক পদ্ধতিতে জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী কালের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান (নিজের খাতিরেই আদান-প্রদান) নানা বস্তু ও খেলনার দরুন আদান-প্রদানকে স্থান করে দেয়, এবং তা পরিণতি

লাভ করে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর যুক্ত ক্রিয়ায়। প্রাপ্তবয়স্ক যেন শিশুটিকে বস্তুগত জগতের মধ্যে নিয়ে আসে, বস্তুসমূহের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেগুলির সঙ্গে ক্রিয়ার সম্ভাব্য সর্বপ্রকার উপায় সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়, এবং অহরহই শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে তার অঙ্গ-সঞ্চালনকে পরিচালিত করে একটি কাজ সম্পন্ন করতে।

গোটা শৈশবকাল ধরে প্রাপ্তবয়স্কের ক্রিয়াকলাপ নকল করার যে ক্ষমতা গড়ে ওঠে, প্রাপ্তবয়স্ক আর শিশুর যুক্ত কাজকর্মে তার গুরুত্ব বিরাট — শেখার নিয়ত প্রসার্যমাণ সম্ভাবনাকে তা উন্মুক্ত করে।

প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর যুক্ত কাজকর্ম সারগতভাবে প্রাপ্তবয়স্কের দিক থেকে শিশুর ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করার ব্যাপার, এবং নিজে একটি ক্রিয়া সম্পন্ন করতে অপারগ যে শিশু, সে প্রাপ্তবয়স্কের শরণাপন্ন হয় সাহায্যের জন্য।

আবার ডায়েরির পৃষ্ঠায় ফিরে আসা যাক।

৪·২২। শিশু কিভাবে জিনিসপত্র ধরে, তার ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করাটা কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা যখন তাদের খেলনা নিয়ে খেলি, শিশুদুটি সমনোযোগে লক্ষ করে, এবং কখনও কখনও প্রাপ্তবয়স্কের কাজ নকল করতে সফল হয়। যমজ শিশুদুটি একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিসের সঙ্গে ঠুকে দেয়, একটা বড় জিনিস ধরে দুই হাত দিয়ে, কখনও বা পা অথবা মুখ দিয়ে (নির্ভর করে ভঙ্গির উপরে: চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে পা দুটি

সাহায্য করে; বসে থাকলে জিনিসটি তাদের হাত থেকে ফস্কে পড়ে যেতে পারে তখন তারা চেষ্টা করে তাদের মুখ দিয়ে সেটাকে ধরতে, সেটাকে 'কামড়াতে')।

নিজের আনাড়িপনায় জিনিসটি ধরে রাখার ব্যাপারে যদি ব্যাঘাত দেখা দেয় তা হলে শিশু সেটি নিজের কাছ থেকে চলে যেতে দেয়, তারপর প্রাপ্তবয়স্কের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। তাকানোয় কাজ না হলে শিশু ঘোঁত-ঘোঁত বা অন্য রকম আওয়াজ শুরু করে — অন্য কথায়, সাহায্য চাইতে শুরু করে। বুদ্ধিবৃত্তিগত দিক দিয়ে যমজদুটির বিকাশ সমরূপ হলেও, আমি তাদের পার্থক্য দেখে ক্রমেই বেশি বিস্মিত হচ্ছি। এমন কি খেলনা সম্পর্কে মনোভাবেও তারা আচরণ করে আলাদাভাবে।

৫·০। লক্ষ করছি, যমজদুটি একই পরিস্থিতিতে ভিন্নরূপ আচরণ করে। আমি তাদের পাশাপাশি বসিয়ে, দুজনের প্রত্যেককে একই ধরনের এক প্রস্ত খেলনা দিই। কিরিউশা ঝুম্‌ঝুমিটা নিয়ে ঝাঁকাতে শুরু করে। কিন্তু আন্দ্রিউশা সাধারণত তার সামনের খেলনা নেয় না, সে লম্বা করে হাত বাড়িয়ে দেয় কিরিউশার খেলনাটির দিকে, তার সবল আঙুলে সেটি ধরে নিয়ে নাড়াতে থাকে। কিরিউশা নিরীহভাবে তার কাছে পড়ে থাকা আরেকটা খেলনা নেয়, নিজের হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে... আন্দ্রিউশা তৎক্ষণাৎ তার আঙুল ঢিলে করে দেয়, ভাইয়ের কাছ থেকে এইমাত্র যে খেলনাটি নিয়েছিল সেটি ফেলে দেয় এবং কিরিউশার হাতে অন্য যেটিকে দেখতে পায় সেটি নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায়। ফলে সমস্ত খেলনাই

শেষ পর্যন্ত আন্দ্রিউশার সামনে স্তূপীকৃত হয়। কিরিউশা এ সবই শান্তভাবে মেনে নেয়।

আদান-প্রদানের চাহিদা মানুষের মুখের কথার ধ্বনি অনুকরণ করার ভিত্তি সৃষ্টি করে। শিশু বেশ ছোট অবস্থাতেই কোনো প্রাপ্তবয়স্ক তার উদ্দেশে কথা বলতে শুরু করলে শান্ত হয়ে যায় এবং তা শুনতে শুরু করে। তিনমাস পরে, শিশুর মেজাজ যখন খুশি থাকে, সে সবসময়ে নানারকম আওয়াজ করে, কলকলানি করে। কোনো প্রাপ্তবয়স্ক যখন শিশুর উপরে ঝুঁকে পড়ে তখন সেই কলকলানি প্রায়শই আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এই সব আওয়াজ করার সময়ে শিশু সেগুলি শোনেও। মাঝে মাঝে সে স্পষ্টভাবে নিজেকেই অনুকরণ করবে: গোড়ায় যে সব আওয়াজ সে আকস্মিকভাবে উচ্চারণ করে ফেলেছে সেই সব শব্দ সে অনেকক্ষণ ধরে আবার উচ্চারণ করতে থাকবে। কিছু পরে (প্রায় চার মাস বয়সে) শিশু উচ্চারিত আওয়াজগুলির ছন্দ রীতিমত স্পষ্টভাবে অনুকরণ করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিরিউশাকে যখন দোলানি দিয়ে ঘুম পাড়ানো হত আর সেই সঙ্গে কেউ যখন গুনগুন করত 'আ-আ-আ! আ-আ-আ!' বলে, সে তখন যে ঠিক সেই আওয়াজটাই হুবহু করত তাই নয়, বরং তার ছন্দটা প্রকাশ করত (আওয়াজটা অন্যরকম হতে পারে: 'ই-ই-ই!' অথবা 'ও-ও-ও!')। আমার দুই পুত্র পাশাপাশি শুয়ে প্রায়শই গুঞ্জন করত নিজের নিজের মতো করে। একজন আরেকজনের আওয়াজ শুনছে — এমনটা দেখা যেত কদাচিৎ।

৫·২৩। আন্দ্রিউশা বিড়বিড় করে বলতে শুরু করেছে 'ম্‌ল্লা-ম্‌ল্লা-ম্‌ল্লা'। কিরিউশা সমনোযোগে তাকাল, তাকাল আন্দ্রিউশার মুখের দিকে তারপর হঠাৎ বলতে শুরু করল: 'ম্লা-ম্লা-ম্লা'। এই দ্বৈতসংগীত চলল কিছুক্ষণ ধরে।

প্রথম অর্ধ-বর্ষেই একজনের উপরে আরেকজনের প্রভাব দেখতে পাওয়া সম্ভব।

উল্লেখযোগ্য যে প্রাপ্তবয়স্করা যখনই একজন শিশুর কাছে আসে, তখনই তার সঙ্গে আদান-প্রদান করতে শুরু করে মিষ্টি কথা বলতে শুরু করে। মৌখিক আদান-প্রদান ছাড়া জীবন কল্পনা করতে অক্ষম মানুষেরা অচেতনভাবে শিশুর মধ্যে একটা জবাবী সাড়া জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। বলা দরকার যে শিশু এর পক্ষে অসাধারণ ভালো উপকরণ। শিশু খুব তাড়াতাড়িই কথার ভাবাবেগগত সুরে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। ইতিবাচক ভাবাবেগগুলি সাধারণ সক্রিয়তা উদ্রেক করে। জীবনের প্রথম বছরের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে-ওঠা, সুস্থ শিশু সুস্পষ্ট সন্তোষের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কলকল করবে: বিভিন্ন শব্দাংশ সে উচ্চারণ করে যাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, চেষ্টা করবে কোনো প্রাপ্তবয়স্কের উচ্চারিত শব্দাংশটি অনুকরণ করতে।

কলকল করার মধ্য দিয়ে শিশু তার আদান-প্রদান করার আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়: কলকল করতে করতে সে আরও বেশি নতুন নতুন মুখের কথার ধ্বনি উচ্চারণ করতে ও প্রভেদ করতে শুরু করে। এই সমস্ত ধ্বনির উচ্চারণ শিশুকে আনন্দ দেয়, তাই কখনও কখনও

যতক্ষণ সে জেগে থাকে ততক্ষণই সে কলকল করে। শিশুর বাক্‌শক্তির বিকাশের জন্য এই কলকলানির গুরুত্ব অপরিসীম: ঠোঁট, জিহ্বা আর নিশ্বাসের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে ত্রুটিহীন হয়। এই রকম প্রস্তুতি নিয়েই পরবর্তীকালে শিশু যে কোনো ভাষার ধ্বনি আয়ত্ত করতে পারে।

শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক মাসে প্রাপ্তবয়স্করা যদি তাদের ভাবাবেগগত মেজাজ শিশুকে বোঝাবার জন্য মুখের ভাষা ব্যবহার করে, তা হলে মোটামুটি শৈশবাবস্থার মাঝামাঝি তারা কথা বোঝার ক্ষমতা বিকাশের জন্য বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করে। দৃশ্যগত অনুধাবনের ভিত্তিতে শিশুকে কথা বুঝতে শেখানোর প্রক্রিয়াটা সাধারণত দাঁড়ায় এই রকম। প্রাপ্তবয়স্ক জিজ্ঞাসা করে শিশুকে: 'অমুক জিনিসটা কোথায়?' প্রশ্নটা শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তোলে প্রাপ্তবয়স্কের আচরণের প্রতি এক অভিমুখীনতাগত প্রতিক্রিয়া। সাধারণত যে জিনিসটির নাম করা হয় সেটিকে এই সময়ে দেখানো হয়ে থাকে। অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তির ফলে প্রাপ্তবয়স্কের উচ্চারিত শব্দটি আর নির্দেশিত জিনিসটির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। এই সম্পর্ক গঠনের ব্যাপারটা শুরু হয় জিনিসটা সাধারণত যেখানে দেখতে পাওয়া যাবে সেই দিকটির প্রতি এবং প্রশ্নটার সুরের প্রতি একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া দিয়ে। শৈশবে শিশুর উদ্দেশে করা প্রশ্নের সুরই কথা বোঝার বিষয়টি নির্ধারণ করে।

৫·১৫। যমজ শিশুদুটি 'আমার কাছে এসো' শব্দগুলিতে প্রতিক্রিয়া দেখায় (স্বভাবতই, শব্দগুলি

সবসময়ে একই সুরে উচ্চারিত হয় না)। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাহু বাড়িয়ে দেয়। একবার আমি ইচ্ছা করেই একটি শিশুকে রাগত স্বরে সম্বোধন করে বলেছিলাম: 'আমার কাছে এসো।' শিশুটি ঠোঁট ফোলাতে শুরু করল, যে কোনো মুহূর্তে কান্নায় ফেটে পড়বে। আমি তখনই আমার গলার সুর পালটে দিলাম। আদরের স্বরে বলা সেই একই শব্দাবলীতে দেখা দিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া: সে হাসতে শুরু করল, তারপর দুই বাহু বাড়িয়ে দিল।

১০·০—১১·০। বহু শব্দ সম্পর্কে শিশুদুটির এক অক্রিয় জ্ঞান হয়েছে — তাদের প্রায় সমস্ত খেলনার নাম: হাতি, ঘণ্টা, মেয়ে, ছেলে ইত্যাদি। নানান জিনিস যেমন বাতি, ঘড়ি, চামচ, কাপ ইত্যাদি এবং লোকের পরিচয়সূচক শব্দ: মা, দিদা, বাচ্চা, কাকি, কাকা। এছাড়া আছে আদেশসূচক শব্দ: 'আমাকে ওটা দাও! বন্ধ করে দাও! এখানে এসো! নাও! খুঁজে বার করো!' যমজ শিশুদুটি গার্হস্থ্য-জীবনের অনেক জিনিস এবং পোশাকআসাক চেনে এবং জিজ্ঞাসা করলে দেখিয়ে দেয়।

শিশুদুটিকে আমি উজ্জ্বল রঙের ছবিওয়ালা বই দেখাই। একটা ছবির জিনিসগুলির নাম একবার বা দুবার বলে দেওয়ার পর তারা সহজেই সেগুলি চিনতে পারে।

এই ছবিটা একটা নেকড়ে আর একটা ছোট্ট ছাগলের। ইচ্ছাকৃত কর্কশ স্বরে আমি বলি: 'এটা নেকড়ে'। আর মোলায়েম, মিষ্টি স্বরে: 'ছোট্ট একটা ছাগল।' আগের মতো সমান সুরে আমি প্রশ্ন করি: 'নেকড়েটা কোথায়?' তারা আমাকে ঠিকই দেখিয়ে দেয়। 'ছোট্ট ছাগলটা কোথায়?'

এবারেও তারা ঠিক। আমি গলার সুর বদলাই। ছাগলটার বেলায় গোড়ায় আমি যে সুর ব্যবহার করেছিলাম সেই সুরে আমি নেকড়ে সম্পর্কে প্রশ্ন করি। শিশুদুটি ছাগলটাকে দেখিয়ে দেয়। এবারে, ঠিক একই সুরে আমি বলি ছাগলটা কোথায় তা দেখাতে। তারা ছাগলটাকে দেখায়। কর্কশ গলার সুরে ছাগলটা সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তারা দেখিয়ে দেয় নেকড়েটাকে।

প্রথম বছরের শেষ দিক নাগাদ একটি জিনিসের নাম এবং খাস সেই জিনিসটির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। সম্পর্কটা প্রকাশ পায় জিনিসটি খোঁজা আর খুঁজে পাওয়ার মধ্যে। এটাই হল মুখের কথা বোঝার প্রারম্ভিক রূপ।

১০·০। মেঝেতে খেলনা ছড়ানো রয়েছে। একটা বেড়াল, ছেলে, ফুঁয়ো-বল ইত্যাদি দেখাতে বলি আমি।

বলি: 'কিরিউশা, আমাকে একটা পুষি বেড়াল দেখাও তো', — সে দেখিয়ে দেয়। 'একটা ফুঁয়ো-বল'। সেদিকে দেখিয়ে দেয় সে। 'আরেকটা', — সেটাও দেখায় (এরকম বল আছে দুটো)। 'একটা পুতুল দেখাও',—সে ঠিকমতো দেখিয়ে দেয়। 'আরেকটা দেখাও', — সে দুই চোখ দিয়ে সেটা খোঁজে, কিন্তু দেখতে পায় না। খেলনাদুটির একটি রয়েছে অপরটি থেকে প্রায় ৩০ সেণ্টিমিটার দূরে, আর সে দেখায় তার কাছের খেলনাটাকে।

কিরিউশাকে আমি বলি: 'আরেকটা পুতুল দেখাও আমাকে', — সে প্রথমটার দিকে আঙুল দেখায়। 'আমাকে আরেকটা দেখাও', — সে চারিদিকে তাকায়, তারপর

আবার প্রথমটির দিকেই আঙুল দেখায়। 'ওটা একটা, আরেকটা কোথায়?' — সে তার চোখ দিয়ে সেটি খুঁজতে থাকে। দ্বিতীয়টির উপরে তার নজর গিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ কিন্তু সেটা সে চিনতে পারে না। তাই আমি তাকে নিজের মতো থাকতে দিলাম। সে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল, বসে পড়ল, তারপর হঠাৎ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, দেখা দিল হাসি, সে আঙুল দেখিয়ে দিল দ্বিতীয় পুতুলটার দিকে। আবার আমি জিজ্ঞাসা করি: 'অন্যটা কোথায়?' — কিরিউশা এদিক-ওদিক তাকায়, প্রথমটাকে দেখতে পায় তারপর আঙুল বাড়িয়ে দেয় সেটার দিকে। সে আঙুল বাড়িয়ে দেখায় প্রথমটাকে, তারপর দ্বিতীয়টাকে, তারপর আবার প্রথমটাকে। তার সারা মুখ খুশিতে ভরা।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যে-জিনিসটার নাম করা হয়, শিশু সেটাকে এমনভাবে খোঁজে না যাতে সে তাকালেই সেটাকে দেখতে পায়; সে সেটাকে অনুসন্ধান করতে থাকে প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে আদান-প্রদান চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রাপ্তবয়স্ক জিজ্ঞাসা করে: 'অমুক জিনিসটা কই?' — আর শিশু জিনিসটার সন্ধান করে এমনভাবে যাতে তার আচরণ দিয়েই সে জবাব দেয়: 'ওই যে!' একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে ভাবাবেগগত আদান-প্রদান এবং তার মুখের কথা বোঝা থেকে শিশু সাধারণত যারপরনাই আনন্দ পায়।

জিনিসটির পরিচয়বাহী শব্দটিতে কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা নির্ভর করে শিশুর সামর্থ্যের বিকাশের উপরে: প্রথম দিকে সে জিনিসটির দিকে তাকায় শুধু, কিন্তু

পরে সেটির দিকে ঝুঁকে পড়ে, এবং সব শেষে, সেই জিনিসটি প্রাপ্তবয়স্কের হাতে তুলে দেয় অথবা দূর থেকে সেটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

শিশুর বয়স যখন এক বছর, সেই সময়টা নাগাদ সে প্রাপ্তবয়স্কের কথার জবাব দিতে পারে মৌখিক ভাষাগত প্রতিক্রিয়া দিয়ে। সাধারণত, 'বাবা কোথায়?' প্রশ্নের জবাবে শিশু তার মাথাটি ঘোরায় বাবার দিকে, তারপর আনন্দের সঙ্গে জানায়: 'বা-বা!'; 'বাচ্চারা কোথায়?', — শিশু চঞ্চল হয়ে ওঠে, বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বলে: 'বা-চ্-চা'। 'টিক্-টিক্ কোথায়?' — শিশু মজা পেয়ে লাফ দেয়, চোখ দিয়ে ঘড়িটা দেখে, বলে: 'টিক্-টিক্'। এক বছর বয়স নাগাদ শিশুরা সাধারণত চার থেকে দশটি কিংবা পনেরটি শব্দ বলতে পারে।

সাত থেকে দশ মাস বয়সে শিশু মন দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কের চলাফেরা ও কথা লক্ষ করে। বেশির ভাগ সময়েই সে তাকে দেখিয়ে দেওয়া একটা কাজ হুবহু নকল করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে নয়, কিছু পরে, এমন কি কখনও বা কয়েক ঘণ্টা পরে। এই অনুকরণটা ঘনঘন আসে অসংখ্যবার দেখানোর পর।

একেবারে শৈশবকাল যখন শেষ হয়ে আসে, শিশুরা তার মধ্যে চমৎকার অনুকরণকারী হয়ে যায়, প্রাপ্তবয়স্কদের বহু ক্রিয়া নকল করতে পারে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, টেবিল কীভাবে ন্যাকড়া দিয়ে মোছা হয় তা দেখার পর, শিশু যে কোনো সুবিধাজনক অবকাশেই হাতের কাছের যে কোনো ন্যাকড়া দিয়ে টেবিল মুছতে শুরু করে।

একজন প্রাপ্তবয়স্কের নির্দেশনাধীনে শিশু যে সমস্ত ক্রিয়া আয়ত্ত করে, সেগুলিই হয়ে ওঠে মনোগত বিকাশের ভিত্তি। এইভাবে, এমন কি একেবারে শৈশবকালেই মানসিক বিকাশের সাধারণ নিয়মানুগতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তার মানে এই যে, জীবনের অবস্থা, লালন-পালন আর শিক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রভাবে তার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াসমূহ ও গুণাবলী।

প্রাপ্তবয়স্কদের উপরে শিশুর নির্ভরশীলতার ফলে বাস্তবের সঙ্গে (এবং নিজের সঙ্গেও) তার সম্পর্কের প্রতিসরণ সর্বদাই ঘটে আরেকজনের সঙ্গে তার সম্পর্কের ত্রিশির কাচের ভিতর দিয়ে। অন্য কথায়, বাস্তবের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক একেবারে শুরু থেকেই এক সামাজিক সম্পর্ক।

শিশুর ভাবাবেগগত মঙ্গল যখন সুনিশ্চিত হয়, প্রাপ্তবয়স্ক যখন তার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা দেখায়, তার সাফল্যে উৎসাহ দেয় এবং সে যাতে নিজের সঙ্গে ও তার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের ভিতরে বিশ্বাস আর আশাবাদ গড়ে তুলতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে, তখন, এমন কি একেবারে শৈশবকালেই একটা আশাবাদী 'আমি'-র ধারণা গঠিত হওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়।

আমার দুই ছেলে সংসারের প্রিয়পাত্র ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে দাঁড়াল, সেটাই প্রত্যাশিত। স্নেহময় প্রাপ্তবয়স্কের দ্বারা পরিবৃত যমজ শিশুদুটি ছিল সুখী,

সুবুদ্ধিপূর্ণ এবং উদ্যোগে ভরা। শিগগিরই তারা সত্যিকার রসবোধের পরিচয় দিতে শুরু করল।

১১·১০। আদান-প্রদানের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ে। শিশুদুটি নিজেরাই চায় তাদের কোলে তুলে নেওয়া হোক, তাদের সাধ্যমতো সমস্ত উপায় (অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি) দিয়ে তারা প্রাপ্তবয়স্কদের জানাতে চেষ্টা করে যে তারা চায় তাদের একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসের কাছে নিয়ে যাওয়া হোক, তারপর সেগুলোর নাম তাদের বলে দেওয়া হোক। এখন তাদের বেশির ভাগ সময়ই কাটে দুটি খেলায়।

একটি খেলা হল এই: একজনের কোলে বসে থাকা শিশুটি একটি জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে আর প্রাপ্তবয়স্ক সেটার নাম বলে দেয়। তার পরে, দ্বিতীয় জিনিসটি, তৃতীয় জিনিসটি, চতুর্থ জিনিসটি। প্রাপ্তবয়স্ক সবগুলির নাম বলে। শিশু একই জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে একাধিকবার। প্রাপ্তবয়স্কের কাজ হল জবাব দেওয়া, জবাব দিয়ে চলা। তা না হলে, যমজ শিশুদুটি প্রতিবাদ করে এবং সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের দাবি আদায় করে নেয়।

এই বিনিময়টা কখনও কখনও আরেকটা মোড় নেয়। যমজ শিশুদুটি তাদের মাকে একই সঙ্গে দুটি আলাদা জিনিসের নাম জিজ্ঞাসা করে। মা তাড়াতাড়ি দুজনেরই জবাব দেয়। এই বিনিময়ের দ্রুততা এবং উভয়ের জিজ্ঞাসাতেই সাড়া দেওয়ার এই সুস্পষ্ট ইচ্ছা শিশুদের সুখী করে, আর তারা হাসতে হাসতে তাদের আঙুল দেখায় একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসের দিকে,

উত্তরটা এমন কি ভালোভাবে শোনারও চেষ্টা করে না।

অন্য খেলাটা অন্যরকম। এবারে প্রাপ্তবয়স্কই প্রশ্ন করে: 'বাতিটা কোথায়?', 'ছবিটা কোথায়?', 'ভাল্লুক কোথায়?' ইত্যাদি। শিশুরা জবাব দেয় তাড়াতাড়ি চেনা জিনিসগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে, অথবা সেই কথিত জিনিসগুলি চোখ দিয়ে সন্ধান করে। কখনও, দুষ্টু হাসি হেসে তারা যে জিনিসটার নাম করা হচ্ছে তা থেকে আলাদা একটা জিনিস দেখিয়ে দেয় এবং মজা পেয়ে হাসতে শুরু করে। কৌতূহলের বিষয় যে আমার হাসিখুশি যমজ ছেলেদুটি একে অপরের আচরণ বোঝে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একে অপরের অনুকরণ করে।

অবশ্য, একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে আদান-প্রদানের সময়ে শিশু রসবোধ দেখাবে একমাত্র তখনই যখন সে ভাবাবেগগতভাবে নিরাপদ আর সহজ-স্বচ্ছন্দ। ইতিবাচক ভাবাবেগের চাহিদা শিশুর মধ্যে উদ্যোগ গড়ে তোলে। সু-সম্পর্কের ভিত্তিতে শিশু, প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে একত্রে, তার চারপাশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে।

প্রাপ্তবয়স্ক শুধু যে শিশুর বেড়ে-চলা চাহিদা পূরণ করে ও জিনিসপত্র দিয়ে তাকে কাজ করতে শেখায় তাই নয়। শিশুর আচরণকে সে বিশেষ একভাবে মূল্যায়ন করে, একটু হেসে তাকে উৎসাহ যোগায়, কিংবা শিশু যদি অনুচিত আচরণ করে তা হলে ভ্রু কোঁচকায় এবং আঙুল তুলে মানা করে। এর মধ্য দিয়ে শিশু ক্রমে ক্রমে ভালো অভ্যাস অর্জন করে এবং যথোপযুক্ত আচরণ করতে শেখে।

একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে আদান-প্রদানের জন্য শিশুর চাহিদার সঙ্গে তার আদান-প্রদানের করার সামর্থ্যের সংঘাত বাধবে। এই বিরোধটার নিষ্পত্তি প্রারম্ভিকভাবে হয় মানুষের কথা বোঝার মধ্যে এবং তার পরে সেই কথা-বলা আয়ত্ত করার মধ্যে।

শিশু একবার প্রাপ্তবয়স্কের মুখের কথা বুঝতে শুরু করলো এবং নিজে নিজে প্রথম শব্দগুলি ব্যবহার করতে শিখলেই সে প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে আলাপ শুরু করবে, তার সঙ্গে কথার আদান-প্রদান দাবি করবে, আরও বেশি নতুন নতুন জিনিসের নাম জানতে চাইবে। তাই একেবারে শৈশবকালের শেষদিকে, কথা-বলা আয়ত্ত করার ব্যাপারটি সক্রিয় হয়ে ওঠে; এটি হল প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে শিশুর আদান-প্রদান করার সামর্থ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায়।

শিশু তার প্রথম বছরে এখান থেকে ওখানে নড়াচড়া করার ব্যাপারে এবং জিনিসপত্র নিয়ে সরলতম কাজকর্ম করায় অনেক কিছু শেখে। সে মাথা সোজা করে তুলে ধরতে শেখে, বসতে শেখে, হামাগুড়ি দিতে শেখে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দু-এক পা হাঁটতে শেখে; সে জিনিসপত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে, সেগুলি আঁকড়ে ধরতে এবং ধরে রাখতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি নাড়াচাড়া করতেও শুরু করে: সেগুলিকে দোলায়, ছুঁড়ে ফেলে, নিজের বিছানার উপরে আছড়ায় ইত্যাদি। এই সমস্ত গতিবিধি ও ক্রিয়াকে বলা যেতে পারে

বৈশিষ্ট্যসূচক মানবিক আচরণের রূপগুলি ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করার ধাপ। লালন-পালনের প্রতিকূল অবস্থা থাকলে শিশু ক্রমে ক্রমে এগিয়ে-চলা গতিবিধি ও ক্রিয়ার পাশাপাশি এমন সব ক্রিয়ার বিকাশ ঘটাতে পারে যার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, যেগুলি অধিকতর বিকাশকে সহজতর তো করেই না বরং তাকে বাধা দেয়। এইসব কাজের মধ্যে আছে বুড়ো-আঙুল চোষা, নিজের মুখের সামনে ধরে-থাকা হাতের দিকে অন্তহীনভাবে তাকিয়ে থাকা, হাতদুটি নিয়ে আনাড়ির মতো চালনা করা, হামাগুড়ি দেওয়া। ক্রমাগ্রসরমান আর আবদ্ধ গতিবিধির মধ্যে তফাৎটা এই যে প্রথমটি নতুন নতুন ছাপ গ্রহণক্ষমতাকে সহজতর করে, নতুন নতুন জিনিস আর সেগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়াকে সহজতর করে, আর দ্বিতীয়োক্তটি শিশুকে বাহ্যিক জগৎ থেকে পৃথক করে রাখে। আঙুল বা বুড়ো আঙুল চোষার ফলে অন্য সমস্ত প্রতিক্রিয়ার প্রায় সার্বিক ও দীর্ঘমেয়াদী মন্থরতা ঘটে। শিশু নড়াচড়া করে না, কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিছু কান পেতে শোনে না — এই দশা থেকে বার করে আনা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে।

গতিবিধি ও ক্রিয়ার ক্রমাগ্রসরমান রূপগুলি — মনোগত বিকাশের পক্ষে যা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ — সফলভাবে বিবর্ধিত হয় একমাত্র তখনই, যখন শিশু নিয়ত সযত্ন মনোযোগ লাভ করে সেই প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে যারা তার আচরণকে সংগঠিত করে। বিকাশের কোন স্তরে শিশু উপনীত হয়েছে তার সূচক হিসেবেও তারা কাজ করে।

স্থানে সক্রিয় কাজকর্ম ও গতিবিধি আয়ত্ত করা (হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটা) এবং জিনিসপত্র আঁকড়ে ধরা ও নাড়াচাড়া করা এই বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একজন শিশুর স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর প্রথম উপায় হল হামাগুড়ি দেওয়া। বেশির ভাগ শিশুই জীবনের প্রথম অর্ধবর্ষের শেষে ও দ্বিতীয় অর্ধবর্ষের শুরুতে সাধারণত হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করে, যে খেলনাটি তাকে আকৃষ্ট করছে সেটির কাছে যাওয়ার চেষ্টা দিয়ে। শিশু খেলনাটির দিকে প্রথমে এক হাত বাড়ায় তার পরে অন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, এবং সেটি ধরবার চেষ্টায় নিজেকে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে নেয়। ক্রমে ক্রমে অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য এই গতিটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রূপান্তরিত হয় স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনের উপায়ে। প্রথম রূপটি হল পেটের উপরে ভর দিয়ে নিচু হয়ে ঘষে-ঘষে চলা, তার পরেরটি হল চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে চলা।

সোজা দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে হাঁটা — মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক চলাফেরার রূপ — আয়ত্ত করার আগে শিশু তার পায়ের উপরে উঠে দাঁড়ানো শিখতে, দাঁড়াতে, কিছুর উপরে ভর দিয়ে নিজেকে খাড়া রাখতে, টলমল করে কয়েক পা হাঁটতে, কোনো সমর্থন ছাড়া দাঁড়াতে এবং শেষ পর্যন্ত কিছুর উপরে নির্ভর করে হাঁটা শিখতে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় কাটায়। শিশু ইতিমধ্যেই হামাগুড়ি দিতে শিখে গেছে বলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য তার হাঁটা দরকার করে না,

তাই শিশুকে হাঁটাবার ব্যাপারে আবশ্যকীয় প্রস্তুতিমূলক অঙ্গ-সঞ্চালনের বিকাশ ঘটানোর কাজে প্রাপ্তবয়স্ক নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

যে শিশু হাঁটতে শিখেছে সে তখনই হামাগুড়ি দেওয়া বন্ধ করে না। কিছুকাল হামাগুড়ি দেওয়াটা তার পক্ষে সহজতর এবং কিছু দূরবর্তী কোনো জিনিসের কাছে যাওয়ার জন্য সে বসে পড়ে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিতে থাকে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের সপ্রশংস অনুমোদনপ্রাপ্ত গতিবিধির নতুন রূপটি অচিরেই জয়যুক্ত হয়। এটা সাধারণত ঘটে একেবারে শৈশবকালের দ্বারপ্রান্তে।

প্রথম তিন মাসে শিশু তার পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালায় দর্শন, শ্রবণ আর স্বাদ দিয়ে। তৃতীয় মাসের পরে সেটা করার জন্য সে তার হাতদুটি ব্যবহার করতে শুরু করে, এবং দেখা দেয়, যাকে বলা হয় স্পর্শ-স্পৃহা, তা চরিতার্থ হয় জিনিসপত্র আঁকড়ে ধরা, নিরীক্ষণ করা ও নাড়াচাড়া করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। শিশুর হাতদুটি তাকে জিনিসপত্রের স্পর্শজনিত অনুভবের (অঙ্গবিন্যাস, স্থিতিস্থাপকতা) সঙ্গে পরিচিত হতে, সেগুলির আকৃতি ও অন্যান্য গুণ বুঝতে সাহায্য করে।

আঁকড়ে ধরার প্রবণতা বিকাশলাভ করতে শুরু করে তৃতীয় থেকে চতুর্থ মাসে। শিশুশয্যায় বা দোলনায় শুয়ে শিশু তার হাতদুটি তার বুকের একটু উঁচুতে তোলে, মনে হয় যেন একটি হাত দিয়ে আরেকটিকে অনুভব করছে। (কিন্তু এই নড়াচড়া শুধুই অনুভব বলে মনে হয়।

সমীক্ষায় লক্ষ করা যায় সে সত্যিকার অনুভূতি—স্পর্শের দ্বারা একটি বস্তুর গুণ আবিষ্কার — সম্ভব শুধু প্রাক-স্কুল বয়সের শেষের দিকে)। একজন প্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হাতে কোনো জিনিস দিলে শিশু সেটি ধরার চেষ্টা করে। শিশু অচিরেই ঝুলন্ত খেলনাগুলির দিকে নিজে নিজে হাত বাড়াতে শুরু করে, যদিও কিছুকাল সেগুলিকে সে প্রায়ই ধরতে পারে না, এবং একটা খেলনার কাছে হাত নিয়ে যেতে পারলেও সেটিকে সে শুধু স্পর্শ করে, আঁকড়ে ধরতে পারে না। সাড়ে চার থেকে পাঁচ মাস বয়সেই সাধারণত শিশুরা একটা ঝুলন্ত খেলনার কাছে হাত নিয়ে গিয়ে সেটি আঁকড়ে ধরতে পারে এবং ধরে থাকতে পারে, তার পরে শিগগিরই (ছয় মাস নাগাদ) তারা এক হাত দিয়েই সেটা ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে শিশু আঁকড়ে ধরার ক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এখনও সেটি খুবই অনিশ্চিত। জিনিসটির দিকে প্রসারিত হাতটি সরল রেখায় এগোয় না, এগোয় বাঁকাভাবে, প্রায়শই প্রয়োজনীয় দিকটির এক দিকে বেঁকে যায়। শিশু চেষ্টা করে সমস্ত জিনিসই একইভাবে ধরতে, তার সবকটি আঙুল হাতের চেটোয় চেপে ধরে।

জীবনের প্রথম বছরের দ্বিতীয় ছয় মাসে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে আরও উন্নতি ঘটে: প্রথমত জিনিসটির দিকে হাতের গতি আরও যথাযথ হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়ত, অন্যান্য আঙুলের সঙ্গে বুড়ো-আঙুলের বৈপরীত্য বিকাশলাভ করে এবং শিশু আঙুলগুলি দিয়ে জিনিসটি ধরতে আরম্ভ করে। মোটামুটি আট মাস বয়সে হাত

সুসংগতভাবে জিনিসটির দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু বছরের শেষ দিকেই শুধু হাতটা এগিয়ে যায় সরাসরি, অন্য দিকে না গিয়ে। আঙুলগুলির বিন্যাস ক্রমেই বেশি নির্ভর করতে শুরু করে কোন ধরনের জিনিস শিশু ধরছে তার উপরে: একটা বল ধরা হয় ছড়ানো আঙুল দিয়ে, সুতো ধরা হয় বুড়ো-আঙুল, তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে, আর চৌকো একটা খণ্ড ধরার সময়ে আঙুলগুলো থাকে সেটির কিনারায়।

শিশু একবার একটি জিনিস তার হাতে ধরে থাকতে পারলেই সেটি নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে। প্রথম নাড়াচাড়াগুলি খুব সরল। শিশু জিনিসটি ধরে, তারপর অল্প কিছুক্ষণ সেটি ধরে থাকার পর ছেড়ে দেয়, তারপরে আবার ধরে। তার সামনে দুটি জিনিস থাকলে সে একটি ধরতে পারে, তারপরে সেটিকে ছেড়ে দিয়ে অন্যটি ধরতে পারে। তার আগে সে তার নজর ফেরাবে একটি জিনিস থেকে আরেকটি জিনিসের দিকে। সেটিকে হাতে ধরে শিশু তুলে নিয়ে আসে নিজের চোখের কাছে, সেটির দিকে তাকিয়ে থাকে, সেটিকে তার মুখের কাছে নিয়ে আসে এবং এদিক ওদিক দোলায়। প্রথম নাড়াচাড়ার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে শিশুটি যে জিনিসটির দ্বারা আকৃষ্ট সেটিরই সঙ্গে এই নাড়াচাড়া জড়িত।

কিন্তু নাড়াচাড়ার কাজটা খুব তাড়াতাড়ি জটিল হয়ে ওঠে। সরলতম ক্রিয়াতেও (জিনিসটি দোলানো, ঠেলা, চেপে কুঁচকে দেওয়া) কিছু ফল পাওয়া যায়: খেলনাটির অবস্থিতি বদলানো, সেটিকে আরও কাছে আনা বা আরও

দূরে সরিয়ে দেওয়া, ঝুম্‌ঝুমির আওয়াজ, কিংবা রবারের পুতুল টিপে আওয়াজ বার করা। শিশু এই ফল লক্ষ করতে শুরু করে এবং সক্রিয়ভাবে তার পুনরাবৃত্তি করে।

প্রথম ছয় মাসের শেষে ও দ্বিতীয় ছয় মাসের শুরু নাগাদ শিশুর জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করার কাজগুলি নাছোড়ভাবে চলে একটা ফল পাওয়ার লক্ষ্য সামনে রেখে, তার নাড়াচাড়ার দরুন যেসব পরিবর্তন ঘটে, সেই অভিমুখে।

এই নাড়াচাড়া যত উন্নত হতে থাকে, শিশু ততই একসঙ্গে দুটি জিনিস নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। সরলতম দৃষ্টান্ত হল একটি ঝুম্‌ঝুমি দিয়ে আরেকটি ঝুম্‌ঝুমির গায়ে আঘাত মারা। ফলাফলের দিকে মনোনিবেশ এখন বিশেষভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে: শিশু প্রাণপণে চেষ্টা করে একটি জিনিসকে আরেকটির আরও কাছে নিয়ে আসতে, একটির উপরে আরেকটিকে শুইয়ে দিতে, দাঁড় করাতে অথবা একটির ভিতরে আরেকটিকে ঢুকিয়ে দিতে কিংবা শুইয়ে দিতে। কাজটার দরুন যে ফল হয় সেটা এখন এইভাবে হয়ে ওঠে জিনিসটিকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখা, অথবা দুটি জিনিসকে বিশেষ একটা যুক্ত অবস্থানে নিয়ে আসা। একবার সফল হলে শিশু তা বারবার করে।

জীবনের প্রথম বছরের শেষে, জিনিসপত্র নিয়ে শিশুর নাড়াচাড়ার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। ক্রিয়াগুলি আগে যা ছিল, বাহ্যদৃষ্টিতে মূলত তাই থাকে, যথা, গাদা করে রাখা, ঢোকানো, জড়ানো, খোলা ইত্যাদি,

কিন্তু সেই ক্রিয়াগুলি হয় আরও যথাযথভাবে। যেটা পৃথক তা এই যে আগে শিশু কাজটা করত একভাবে (সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক যেমনভাবে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল) এবং সেই উদ্দেশ্যে তাকে দেখিয়ে দেওয়া জিনিসগুলি নিয়ে, এখন সে চেষ্টা করে এই পরিচিত ক্রিয়াটি সম্ভাব্য সমস্ত জিনিসের উপরে পুনরাবৃত্তি করতে, কখনও বা সেই সমস্ত জিনিসের আকৃতি-প্রকৃতি অনুযায়ী কাজটাকেই অদল-বদল করে নিয়ে।

বিকাশের এই স্তরে শিশুরা তাদের কাজের পরোক্ষ তথা প্রত্যক্ষ ফলগুলি লক্ষ করতে শুরু করে, এবং সেই কাজটার পুনরাবৃত্তি করে আবার সেই ফলাফল পেতে চেষ্টা করে।

৯·২২। কিরিল কাপড় শুকোতে দেওয়ার দড়ির একটা প্রান্ত ধরে ফেলল। অকস্মাৎ তাতে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে লক্ষ করল ছাতের তলায় টাঙানো দড়ির উপরকার কাপড়-চোপড়গুলো কী রকম লাফাচ্ছে। দুলুনি থামা পর্যন্ত আন্দোলিত কাপড়গুলোর দিকে সে তাকিয়ে থাকে।

দড়ির প্রান্তটা নিয়ে সে খেলা করতে থাকে, আবার আকস্মিক ঝাঁকুনি দেয়। সমস্ত কাপড়-চোপড় দুলতে শুরু করে, সে দড়ির প্রান্তটা নিয়ে বারবার খুব জোরে ঝাঁকুনি দেয়, ফলাফলটা তার খুব পছন্দ হয়েছে।

১০·০। ছেলেদুটি জল-ভরা একটা গামলার মধ্যে একটা খেলনা মাছ ছুঁড়ে ফেলল। জল থেকে প্রতিবিম্বিত উজ্জ্বল এক আলোর টুকরো পড়ল দেয়ালের উপরে। ছেলেদুটি

জলের ভিতরে তাদের হাত ডুবিয়ে দেওয়ামাত্র আলোর সেই টুকরোটা ভেঙে গিয়ে অজস্র কাঁপা-কাঁপা দীপ্ত প্রতিবিম্বে পরিণত হল। ছেলেদুটি দেয়াল আর ছাতে আলোর এই নৃত্যপর টুকরোগুলো হঠাৎ দেখতে পেল। একটু ধাঁধায় পড়ে, তারা তাকিয়ে থাকল যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর নড়া বন্ধ না হয়। তারা আবার তাদের খেলায় ফিরে এল, জলের মধ্যে তাদের হাত ডোবাল, দেয়াল আর ছাতে আলোর নড়াচড়া আবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রথম বারের মতো আলোর টুকরোগুলোর নড়াচড়া বন্ধ হতেই, তাদের কৌতূহল আবার নষ্ট হয়ে গেল।

তৃতীয়বার যখন শিশুদুটি আবার এই খেলায় ফিরে এসে তাদের হাত দিয়ে জলের উপর দিকটা স্পর্শ করল, তখন আবার নৃত্যপর উজ্জ্বল প্রতিবিম্বগুলির দিকে মনোযোগ দিল। এবারে তারা দুজনেই ইচ্ছা করে জল নাড়াতে শুরু করল এবং সানন্দে মাথা তুলে তাকাল ছাতের দিকে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করার ক্ষেত্রে বিকাশটা ঘটে সেই জিনিসটিরই প্রতি প্রবণতা থেকে ক্রিয়ার ফলাফলের এবং অর্জিত ফলাফলের অধিকতর জটিলতার দিকে অভিমুখীনতায়। প্রারম্ভিকভাবে, এটা হল অবস্থানের পরিবর্তন, কিংবা যা একটি জিনিসের এযাবৎ লুকনো গুণের (যেমন, আওয়াজ) আবির্ভাব ঘটায় শুধু এমন এক পরিবর্তন, তারপরে দুটি জিনিসকে এক বিশেষ পারস্পরিক অবস্থান দেওয়া, এবং সব শেষে নতুন নতুন জিনিসের মধ্যে পরিচিত পরিবর্তন ঘটানো কিংবা এমন

পরিবর্তন ঘটানো যা কাজটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়, পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত।

প্রতিপন্ন হয়েছে যে বস্তুসমূহের গুণাগুণ ও সম্পর্ক এবং আশেপাশের স্থান সম্পর্কে শিশুর উপলব্ধি ঘটে নড়াচড়া আর ক্রিয়ার নতুন নতুন রূপ অর্জিত ও উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এই উপলব্ধিটা তখনও, যাকে বলা যায়, অবিভক্ত, এবং তার এক একটি দিক যেমন, মনোযোগ, অনুধাবন, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি আলাদা করে বোঝা কঠিন।

শিশুর আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে লোকে প্রায়শই এই ধরনের অভিব্যক্তি ব্যবহার করে, যেমন 'ছোট্ট সোনা দেখছে', 'ছোট্ট সোনা চিনতে পারছে', 'ছোট্ট সোনা আন্দাজ করতে পারছে', এবং 'ছোট্ট সোনা বুঝতে পারছে', কিন্তু সেই অভিব্যক্তিগুলি শর্তসাপেক্ষভাবেই শুধু ব্যবহৃত হতে পারে, কারণ সেগুলি শিশুকে এমন সব মনস্তত্ত্বগত ক্ষমতা প্রদান করে যেগুলি প্রাপ্তবয়স্কদেরই একান্ত বৈশিষ্ট্য। একটি শিশু যখন কোনো জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন আমরা মনে করতে চাই যে তার জায়গায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক যা দেখতে পেত সেও ঠিক সেই জিনিসটিই দেখছে। শিশু একটা চেনা ঝুম্‌ঝুমির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, সেটাকে মুঠো করে ধরে তারপরে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঝাঁকাতে শুরু করে, আওয়াজটা শুনতে থাকে। আমাদের ধারণা হয় যে সে ঝুম্‌ঝুমিটাকে চিনতে পেরেছে, মনে করতে পেরেছে যে এটা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়, আর আওয়াজ করাতে হলে সেটাকে ঝাঁকুনি দেওয়া দরকার। অনুরূপ পরিস্থিতিতে একজন প্র.প্তবয়স্কের আচরণ আমরা

এইভাবেই ব্যাখ্যা করতাম। কিন্তু শিশুর আচরণ সম্বন্ধে এই বোধ অবৈজ্ঞানিক, মনোবিদ্যাগত অধ্যয়ন-সমর্থিত নয়। শিশু এখনও বস্তুগুলিকে ও তাদের গুণাগুণ বুঝতে, সেগুলি সম্বন্ধে আন্দাজ করতে ও চিন্তা করতে, কিংবা সেগুলি দিয়ে সে যা করে তার ফলাফল আগে থেকে বুঝতে সক্ষম নয়। এ সমস্তই গড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে, শিশু তার চারপাশের পৃথিবীকে যেমন-যেমন চিনতে-জানতে থাকে, এবং এই জ্ঞান অর্জনের প্রধান উপায় হল গতিবিধি আর শিশুর ক্রিয়াকলাপ।

জীবনের দ্বিতীয় ছয় মাসে পরিপার্শ্বের স্থান ও তার মধ্যে অবস্থিত বস্তুগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার দিকে চালিত বিশেষ অভিমুখীনতামূলক ক্রিয়ার ক্রমান্বিত আত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

তৃতীয় মাসের শেষ দিকে দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কাজের এক ধরনের বিশদীকরণ ঘটে, যা সেই ইন্দ্রিয়গুলির অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত; দেখা দেয় দর্শন ও শ্রবণগত একাগ্রতা। লক্ষ করা গেছে যে তৃতীয় অথবা চতুর্থ মাস নাগাদ, অর্থাৎ শিশু হামাগুড়ি দেওয়া, ধরা বা নাড়াচাড়া করা শেখার আগে, ত্রুটিহীনতাসাধনের এই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন দ্রুতিতে এবং যে কোনো দূরত্বে যে কোনো দিকে নড়াচড়া-করা জিনিসগুলিকে শিশু তার চোখ দিয়ে বেশ অবাধেই অনুসরণ করে। সে একটি জিনিসের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে ২৫ মিনিট বা তারও বেশি। এখন আমরা পাচ্ছি যাকে বলা হয় চোখের অবগতিমূলক গতি, কোনোরূপ বাহ্যিক কারণ

ছাড়াই একটি জিনিস থেকে আরেকটি জিনিসে দৃষ্টি সরানো। শ্রবণগত একাগ্রতাও প্রসারিত হয়। যে সমস্ত কোমল-মৃদু ধ্বনি শিশুকে কোনোভাবে আকৃষ্ট করে, সেগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে তোলে। দর্শন আর শ্রবণ একসঙ্গে মেলে, শিশু শব্দের দিকে মাথা ফেরায়, শব্দের উৎস খোঁজে চোখ দিয়ে।

শিশু শুধু যে দেখে এবং শোনে, তাই নয়। দর্শনগত ও শ্রবণগত ছাপ সে খুঁজে বার করে, এবং সেগুলি থেকে সুখ পায়। উজ্জ্বল, রঙিন, গতিশীল বস্তু, সংগীত আর মানুষের কথার আওয়াজ দিয়ে সে আকৃষ্ট হয়। শিশুকে শুধু পর্যবেক্ষণ করলেই এই সব দেখা যায়। কিন্তু শিশু ঠিক কী দেখে, সে যেসব ছাপ পায়, তা থেকে সে কী বোঝে, সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় একমাত্র পরীক্ষানিরীক্ষারই ভিতর দিয়ে। তর্কাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে তিন মাস বয়সে শিশুরা সমতল ও ঘন জ্যামিতিক গঠনের রঙ আর আকৃতির তফাৎ ধরতে পারে, রঙ শিশুদের আকৃষ্ট করে বিভিন্ন মাত্রায়, এবং উজ্জ্বল, পরিষ্কার রঙই সাধারণত বেশি পছন্দসই। এও আবিষ্কৃত হয়েছে যে এই বয়সের শিশুরা নতুন নতুন জিনিসে অত্যন্ত সংবেদনশীল: অন্যান্য যেসব জিনিসের দিকে শিশু প্রায়ই তাকিয়ে দেখে সেগুলির পাশে ভিন্ন রঙ বা আকৃতির একটি নতুন জিনিস আমরা যদি রাখি, তা হলে একবার তার নজরে পড়লে সে নতুন জিনিসটি নিয়েই পুরোপুরি মগ্ন হয়ে যাবে, অনেকক্ষণ সেটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে।

ফলত, শিশুর দৃশ্যজগৎটা তৈরি পরিবর্তমান ছাপ দিয়ে, যেগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে এবং যেগুলির দ্বারা সে কম-বেশি আকৃষ্ট। শিশু তার চারপাশের বস্তুগুলির সঙ্গে এই সমস্ত ছাপকে প্রথমে সম্পর্কিত করতে পারে না: একটা অস্বাভাবিক জায়গা থেকে কিংবা অস্বাভাবিক অবস্থানে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, উল্টে রাখা) দেখা একটি জিনিসকে নতুন কিছু বলে বোধ হয়। এমন কি অনেক পরেও, শিশু যখন তার মা-কে চিনতে শিখেছে, তখনও নতুন পোশাক পরে মা যদি হাজির হয় তা হলে শিশু ভয় পেয়ে কাঁদতে থাকে। ছয় মাস বয়সের শিশুরা তাদের কাছ থেকে ২৫ সেণ্টিমিটার অথবা ৭৫ সেণ্টিমিটার দূরে থাকা একটা ঝুম্ঝুমির জন্য ঠিক একই পরিমাণ হাত বাড়িয়ে দেয়, যদিও তাতে এর একটারও কাছে পর্যন্ত হাত পেঁছবে না।

শিশু নানান ধরনের গতি আর কাজ সম্পন্ন করতে শুরু করলে তার দৃষ্টিশক্তিকে একটা নতুন কাজ করতে হয়: তার আচরণকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হয় — স্থানে নড়াচড়া, ধরা এবং জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করা। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি এর জন্য এখনও প্রস্তুত নয়। তা শুধু শিশুকে কিছু একটা করতে উদ্দীপ্ত করতে পারে, কোনো আকর্ষক জিনিসকে নিজের কাছে টেনে আনার চেষ্টা করাতে পারে অথবা নিজেকে তার আরও কাছে নিয়ে যাওয়াতে পারে। কিন্তু তা তখনও বলতে পারে না কীভাবে তা করতে হবে।

শিশুর পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে একটা জিনিসের কাছে

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, সেটাকে ধরা, সেটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানো, অধিকন্তু সেটাকে টিপে তার ভিতর থেকে কিঁচ কিঁচ শব্দ বার করা, একটা বাক্স ঢাকনা দিয়ে আচ্ছাদিত করা কিংবা একটা লাঠির গায়ে আঙটি পরানোর জন্য অনেক কিছুই হিসাবের মধ্যে ধরতে হয়: গতিমুখ, দূরত্ব, জিনিসগুলির আকৃতি, আয়তন, ওজন, যে উপকরণ দিয়ে সেগুলি তৈরি তার স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি। শিশুর চোখ এই সমস্ত জিনিস ধরতে পারে না। বস্তুসমূহ থেকে শিশু নানা ধরনের ছাপ গ্রহণ করে, কিন্তু পার্থক্যটা কোথায়, তার মানে কী তা আবিষ্কার করা এখনও তার বাকি। এই আবিষ্কার চলে তার গোটা শৈশবকাল ধরে। আদি-শৈশব তার সূচনাকাল মাত্র, আর স্থান ও বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গতি ও ক্রিয়াকে ক্রমাগত মানিয়ে নেওয়াটা কাজ করে আরম্ভ হিসেবে।

বাহ্যিক গতি ও ক্রিয়ার ফলে পারিপার্শ্বিক পৃথিবী সম্বন্ধে শিশুর উপলব্ধি আসে মানসিক প্রক্রিয়া (অনুধাবন, চিন্তা) মারফৎ অর্জিত উপলব্ধির চেয়ে আগে। এবং তা কাজ করে তার বনিয়াদ হিসেবে।

শিশু স্থানের সঙ্গে কীভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে, তা একটি আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে তার বাহুর গতি কীভাবে সে ত্রুটিহীন করে তাই থেকে দেখা যায়। জিনিসপত্র ধরার সামর্থ্যের বিকাশের প্রারম্ভিক স্তরে চোখ একটি জিনিস থেকে একটা ছাপ বা ধারণা পায়, কিন্তু দূরত্ব বা গতিমুখ কোনোটাই নির্ধারণ করতে পারে না। শিশুর

হাত সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটির দিকে চলে যায় না, মনে হয় যেন ফাঁকা জায়গায় সেটা ধরার চেষ্টা করে, লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছয় কদাচিৎ। কিন্তু একটু একটু করে, হাতের গতি অনুসরণ করতে করতে, চোখদুটি লক্ষ করতে শুরু করে বাঞ্ছিত বস্তুটি কীভাবে দূরে সরে যায় বা কাছে চলে আসে, এবং সেই চোখ তখন তার নিজের গতির নিয়ত সংশোধন ঘটায়। স্থানকে ব্যবহারিকভাবে আয়ত্ত করা (লক্ষ্যবস্তুটিতে গিয়ে পৌঁছনো) ঘটে দূরত্ব আর গতিমুখের দৃশ্যগত নির্ধারণের অনেক আগে। বস্তুটির দিকে হাতের সুসংগত গতির আত্মপ্রকাশ (যা লক্ষ করা গেছে দ্বিতীয় ছয় মাসে) দেখায় যে হাতকে অনুসরণ করে, চোখ বস্তুটির অবস্থান বুঝতে শিখেছে পুরোপুরি। একমাত্র প্রথম বছরের একেবারে শেষেই 'না দেখে' ধরা সম্ভব হয়: শিশু একটি খেলনার দিকে দেখে, কিন্তু কোনো কারণে তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়, সে অন্য দিকে মুখ ফেরায়, কিন্তু তা হলেও নির্ভুলভাবে খেলনাটি তুলে নেয়। তার মানে এই যে চোখ খেলনার স্থানিক অবস্থান যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে এবং তার হাতকে ঠিক 'আদেশ' দিতে সমর্থ হয়েছে।

শিশু বস্তুসমূহের বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পর্কে শেখে — আকার, আয়তন, ওজন, দৃঢ়তা, স্থিতিশীলতা, ইত্যাদি — ধরা আর নাড়াচাড়া করার প্রক্রিয়ায়। শিশু যখন একটা জিনিসের দিকে হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে, তখন আঙুলগুলির বিন্যাসের পরিবর্তনগুলি আকার ও আয়তন সম্পর্কে তার বোধের চমৎকার সূচক। আঙুলগুলি যখন জিনিসটির উপরে গিয়ে পড়ে তখন সেটির আকার ও

আয়তনের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিজেদের মানিয়ে নেয়, জিনিসটির আকৃতি-প্রকৃতির 'অধীনস্থ করে নিজেদের': একটা বলের উপরে আঙুলগুলি বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে যায়, একটা চৌকো টুকরোর উপরে সেগুলি থাকে কিনারায়। জিনিসটি হাতকে, এবং তারপরে চোখকেও 'বাধ্য করে' তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে গণ্য করতে। দশম-একাদশ মাসে এই 'শেখা' এমন জায়গায় নিয়ে যায় যে শিশু যে জিনিসটি নিতে চায় সেটির দিকে তাকিয়েই তার আঙুলগুলিকে সেই আকর্ষক বিশেষ জিনিসটির জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থানে বিন্যস্ত করে নেয় আগে থেকেই। এখানে আমরা দেখতে পাই আকার ও আয়তন সম্পর্কে দর্শনগত উপলব্ধি, যা আপনাতেই ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে পারে।

শিশু যে মুহূর্তে একটি ক্রিয়ার ফল কামনা করে, সেই মুহূর্ত থেকেই নাড়াচাড়া করার মধ্যে বস্তুসমূহের আরও বেশি গুণ ও প্রকৃতি আবিষ্কার করে, নাড়াচাড়া করার মধ্য দিয়েই সেগুলি আবিষ্কৃত হয়। এগুলির মধ্যে আছে স্থানান্তরকরণ, পড়ে যাওয়া, আওয়াজ বার করা, কোমলতা, সংনমনীয়তা, স্থিতিশীলতা ইত্যাদি। শিশু একবার দুটি জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই নতুন নতুন গুণাবলী উদ্ঘাটিত হয়: অংশে অংশে পৃথক করা, একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিসের ভিতরে (অথবা উপরে), ঊর্ধ্বে (নিচে অথবা পিছনে) দেখতে পাওয়া। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই শিশু 'জানে' শুধু তখনই যখন সে কাজ করছে, ক্রিয়া যেই বন্ধ হয়ে যায়, 'জ্ঞানও' অদৃশ্য হয়।

অষ্টম-নবম মাস নাগাদ শুধু ক্রিয়া আর সেগুলির ফলই নয়, বস্তুসমূহের গুণ ও প্রকৃতিও শিশুকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে, সেই সব গুণ ও প্রকৃতির কল্যাণেই এই ফলগুলি সম্ভব হয়। অপরিচিত জিনিসের প্রতি শিশুর মনোভাবের পরিবর্তন থেকে তা দেখা যায়। গোটা শৈশবকাল জুড়েই নতুন কোনোকিছু শিশুর কৌতূহল উদ্রেক করে। পুরনো খেলনার তুলনায় একটা নতুন খেলনা নিয়েই সে বেশি আগ্রহে সাধারণত খেলা করে। কিন্তু, একটা নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত অপরিচিত জিনিসটি শুধুই একটি নতুন উপকরণ যা দিয়ে অভ্যস্ত নাড়াচাড়া করা যায়। জিনিসটির গুণ ও ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দেয় এইখানেই যে শিশু অপরিচিত জিনিসটি নিয়ে কিছু করতে শুরু করার আগে মনে হয় যেন সেটিকে 'তদন্ত করে দেখে': সে সেটির উপরিতল অনুভব করে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে; একমাত্র তারপরেই শুরু হয় অভ্যস্ত ধরনের নাড়াচাড়া, সেটা যান্ত্রিকভাবে নয়, বরং যেন শিশু খুঁজে বার করতে চাইছে জিনিসটি কোন কাজের জন্য উপযুক্ত।

জিনিসের গুণ ও প্রকৃতির দিকে শিশুর মনোযোগ সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় তার জীবনের প্রথম বছরের শেষে, যখন অনুরূপ গুণ ও প্রকৃতিসম্পন্ন বিভিন্ন জিনিসে সে তার আয়ত্ত করা ক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে (একটা বল অথবা চাকাকে একটা কাঠি দিয়ে খোঁচায়)।

ক্রমে ক্রমে, পরিবর্তমান নানা ছাপ আর ধারণার পর, জিনিসগুলি শিশুর কাছে প্রতিভাত হয় এমন কিছু

হিসেবে, যেগুলি তার চারপাশের জগতে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান এবং যেগুলির মধ্যে আছে বিশেষ ও অপরিবর্তনীয় গুণ ও প্রকৃতি।

জিনিসগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রথমে শিশুর যে কোনো ধারণা নেই তার পরিচায়ক হল এই ঘটনাটি যে ছয় বা সাত মাস বয়সের শিশুর দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে একটা জিনিস একবার অদৃশ্য হয়ে গেলে, তার কাছে জিনিসটার আর যেন কোনো অস্তিত্বই থাকে না, সে সেটির খোঁজও করে না।

পরে, নয় থেকে দশ মাস বয়সে শিশুরা তাদের দৃষ্টির থেকে অদৃশ্য জিনিসগুলির জন্য খোঁজ করতে শুরু করে, এবং বুঝতে শুরু করে যে সেগুলির অস্তিত্ব লোপ পায় নি, অন্য কোথাও আছে। মোটামুটি এই সময়েই তারা স্থানে জিনিসগুলির অবস্থান নির্বিশেষে (উল্টে রাখা, অথবা অস্বাভাবিক জায়গায় দেখানো) সেগুলিকে চিনতে শুরু করে এবং এই জিনিসগুলি তাদের থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন, সেগুলির আকার সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

এইভাবে, প্রাপ্ত ছাপ ও ধারণাগুলি অনুধাবনের উপায়ে রূপান্তরিত হয়, শিশু তার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যেসব জিনিসের সঙ্গে পরিচিত সেগুলির স্থায়ী গুণ ও প্রকৃতি তাতে প্রতিফলিত হয়। শিশুর সামনে উপস্থিত নতুন নতুন কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই সমস্ত গুণ ও প্রকৃতি ব্যবহার করার, চিন্তার প্রাথমিক রূপের ভিত্তি তা তৈরি করে। জীবনের প্রথম বছরের শেষ ক'মাসে শিশুরা বস্তুসমূহ ও

সেগুলির গুণ ও প্রকৃতির মধ্যে সরলতম যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে কাজকর্ম, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজকর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়ে পড়ে।

এই সমস্ত তথ্য দেখায় যে একেবারে শৈশবাবস্থার শেষ দিকে, প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সংগঠিত গতিবিধি ও ক্রিয়ার ভিত্তিতে শিশু তার চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলে আর তার প্রাথমিক ধরনের উপলব্ধি ও চিন্তন দেখা দেয়, সেটা তাকে সক্ষম করে তোলে পৃথিবীতে তার স্থান খুঁজে পেতে, এবং আদি শৈশবে নানান ধরনের যেসব সামাজিক অভিজ্ঞতা ঘটে সেগুলিকে আত্তীকরণের দিকে যাওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্ত সেটাই।

আমরা আগে যেমন দেখেছি, শৈশবে বুদ্ধিবৃত্তিগত তথা ভাবাবেগগত চাহিদা গড়ে ওঠে। শিশুর জগৎ ক্রমে ক্রমে অর্জন করে তীক্ষ্নতা, বর্ণ আর বিষয়মুখতা। তা শিশুর নিজের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি বিকাশলাভ করে প্রাপ্তবয়স্কের যোগানো ভাবাবেগগত ও বুদ্ধিবৃত্তিগত উদ্দীপকের মধ্য দিয়ে। শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিগত বিকাশ সম্পর্কে বহু সমীক্ষা থেকে দেখা যায় শিশুরা ভাবাবেগগত ও ইন্দ্রিয়গত দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকলে তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে বিলম্ব কতখানি গুরুতর হতে পারে।

শিশুর মনের বিকাশের এক অপরিহার্য শর্ত হিসেবে প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে আমাদের বিবেচনায় আমরা এই বিষয়টার উপরে জোর দিতে চাই যে প্রাপ্তবয়স্কদের মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি শিশুই অনন্য। অন্যান্য যেসব বিজ্ঞানের উপজীব্য মানুষ, সেইসব বিজ্ঞানের মতো মনোবিদ্যাও মুখ্যত বিকাশের সাধারণ নিয়মগুলি সম্বন্ধে অধ্যয়ন। এই সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলায় সাহায্য করে, তাকে সমাজের একজন সদস্য হয়ে ওঠার সামর্থ্য দেয়, অর্জিত মানবিক অভিজ্ঞতার প্রিশির কাচের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাবার সামর্থ্য দেয়। কিন্তু বিকাশের সমস্ত নিয়মের পিছনেই প্রতিটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে থাকে একজন অনন্য ব্যক্তি, একজন মানবশিশু, যে বিকশিত হবে এক বিশেষ পথে এবং একান্তভাবে শুধু তারই যেসব গুণ তদনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত জীবন যাপন করবে। এই সমস্ত গুণ তার জীবনের শুধু যে বাহ্যিক দিকটিকেই (জীবনের স্তরগুলি) নির্ধারণ করবে তাই নয়, তার আন্তর বিকাশকেও নির্ধারণ করবে উত্থান-পতন, আশা, কষ্টভোগ, নিজেকে আবিষ্কার করা আর নতুন নতুন অন্বেষণার সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে। কিন্তু এ সবই ভবিষ্যতের ব্যাপার।

এই মুহূর্তে আমাদের বিবেচ্য হল শিশু। একজন শিশু ইতিমধ্যেই কোনো কোনো সাফল্য অর্জন করেছে, অথচ আরেকজন কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, এমনটা যদি হয়

তাহলেও এ নিয়ে হা-হুতাশ করার কোনো দরকার নেই, প্রারম্ভিক সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা হওয়ারও দরকার নেই: প্রত্যেকে বিকাশলাভ করে তার নিজস্ব গতিতে।

বিকাশের ব্যক্তিগত হার ছাড়াও আছে একটা ব্যক্তিগত 'জীবনযাপন প্রণালী', যা বিকাশলাভ করে শিশুর পৃথিবীতে আবির্ভাবের প্রথম দিনগুলি থেকেই।

আমার যমজ ছেলেদুটি এ দিক দিয়ে একেবারে বিপরীত ছিল। কিরিউশা ছিল শান্ত ও নম্র, আর আন্দ্রিউশা ছিল হৈচৈবাজ আর অধীর।

সহজাত আঁকড়ে-ধরার প্রতিবর্তের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্যের ফলে আন্দ্রিউশা তার নিজের সবল হাতদুটি ব্যবহার করে অনেক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে শিখেছিল, গাছের ডাল থেকে ঝুলে থাকতে শিখেছিল।

৬·১৫। আন্দ্রিউশা তার হাতের সাহায্যে নিজেকে তুলে ধরল। তার পাদুটো যেন তার ভার সামলাতে পারছে না, কাঁপছে। তার হাতদুটো তাকে সাহায্য করল, সে এত শক্ত করে ধরে থাকল যে তাকে ছাড়িয়ে আনা শক্ত।

আন্দ্রিউশাকে একটা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার সুযোগ আমি প্রায়ই দিই। তাকে ছেড়ে দিই। সে ওখানে ঝুলতে থাকে, খিলখিল করে হাসে, স্পষ্টতই তার মজা লাগে। আমি কিরিউশাকে একাধিকবার তুলে ধরে ডালটার কাছে নিয়ে গেলাম, কিন্তু ডালটাকে হাত দিয়ে ধরেই সে ছেড়ে দিল।

আন্দ্রিউশা তার বাহুর বিকশিত শক্তির দরুন প্রথমে তার পিঠ আর পায়ের পেশী সঞ্চালন করতে শুরু করল।

সাত মাস বয়সেই সে অবাধে উঠে দাঁড়াতে এবং বসতে লাগল। কিরিউশা পিছিয়ে রইল দর্শনীয়ভাবে।

৭·১। কিরিউশা উঠে দাঁড়াতে শিখেছে। খাটের পিছন দিকটা হাত দিয়ে ধরে সে দাঁড়ায়। কিন্তু আবার কী করে বসতে হবে জানে না! সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর এক পাশে পড়ে যায়, হাত দিয়ে ধরে ঝুলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত হাত ছেড়ে দিয়ে পড়ে যায়।

কিন্তু ঘটনাক্রমে কিরিউশা তার ভাইয়ের চেয়ে একদিন আগে হাঁটতে শুরু করেছিল। ঠিক এক বছর বয়সে সে প্রথম পা ফেলল। আমরা একেবারেই নিশ্চিত ছিলাম যে আন্দ্রিউশাই প্রথমে হাঁটবে, কিন্তু সে সতর্ক থেকে গেল।

খেলার দিকে মনোনিবেশ করার ব্যাপারে তাদের সামর্থ্যের মধ্যেও পাথর্ক্য ছিল। কিরিউশা একটা জিনিস নিয়ে অনেকক্ষণ খেলতে পারত: নানানভাবে একটা জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা সে স্পষ্টতই উপভোগ করত। আন্দ্রিউশার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত খুব তাড়াতাড়ি। আমরা তাকে তার ভাইয়ের পাশে বসিয়ে দিলে সে সঙ্গে সঙ্গেই কিরিউশার হাত থেকে খেলনাটা নিয়ে নিত এবং সেটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বেশিক্ষণ নয়।

তাদের ভাবাবেগগত মেজাজও ছিল ভিন্ন রঙের। কিরিউশা ছিল খোশমেজাজী, হাসত বেশি, আগে যাদের দেখে নি এমন সব লোকের কাছেও যেত ইচ্ছুকভাবেই। আন্দ্রিউশা বিন্দুমাত্র ব্যর্থতা ঘটলে (যেমন, একটা খেলনা হারিয়ে ফেললে), নতুন পরিস্থিতিতে পড়লে রাগে

তারস্বরে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকত। অপরিচিতদের সম্পর্কে সে ছিল সতর্ক এবং মনে হত তার প্রায় কান্না এসে গেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তার মুখে প্রায়শই থাকত একটা চতুর ভাব, এবং সে প্রায়শই, খুবই শিশুসুলভ ভঙ্গিতে অথচ সানন্দে দুষ্টুমি করত।

যমজ শিশুদুটির দৈনন্দিন কর্মতৎপরতা ছিল অত্যন্ত পৃথক ধরনের: একজন রীতিমত ভরতপক্ষী, অন্যজন একেবারে হুতোম-পেঁচা। কিরিউশা ঘুমিয়ে পড়ে শিশুপালন বিষয়ক সমস্ত বইয়ে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী। আন্দ্রিউশা এই নিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না: তার নিদ্রাহীন বড় বড় চোখ দুটি খোলা, শুধু চুপচাপ থাকলেই আমরা খুশী।

অনেকখানি এগিয়ে এসে এর কুড়ি বছর পরের কথা বলার সময়ে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে আন্দ্রিউশা কখনোই নিয়মমাফিক সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নি। এখনও সে বসে বসে ভোররাত্রি পর্যন্ত বই পড়ে, আর তার ভাই ছোট্ট বাচ্চা অবস্থায় যেমন ঘুমোত তেমনিই শান্তিতে নিদ্রামগ্ন থাকে।

এখন আমি বুঝতে পারি যে আন্দ্রিউশাকে একটা আলাদা সময়-নির্ঘণ্টে অভ্যস্ত করাতে গিয়ে, তাকে 'নিয়মানুবর্তী' করার চেষ্টা করে আমি আসলে চেয়েছিলাম বাড়িতে যে নির্ঘণ্ট অনুসরণ করা হয় তদনুযায়ী তার জীবনের সময়গত প্রণালীটা বিন্যস্ত করতে, এবং সেই চেষ্টা করে আমি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শ্বাসরুদ্ধ করছিলাম, যে সময়টায় সক্রিয় থাকাটা একটা প্রাকৃতিক চাহিদা ছিল

আপনি আর আমি। লিউদা, ৬ বছর

গোরু। আন্তন, ৫ বছর
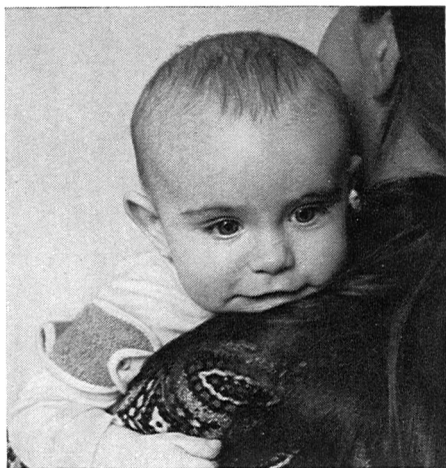
আস্থা

শিশুসন্তান সহ তিন নবীনা জননী

বাজি পোড়ানোর ভারী মজা! দেনিস, ৫ বছর
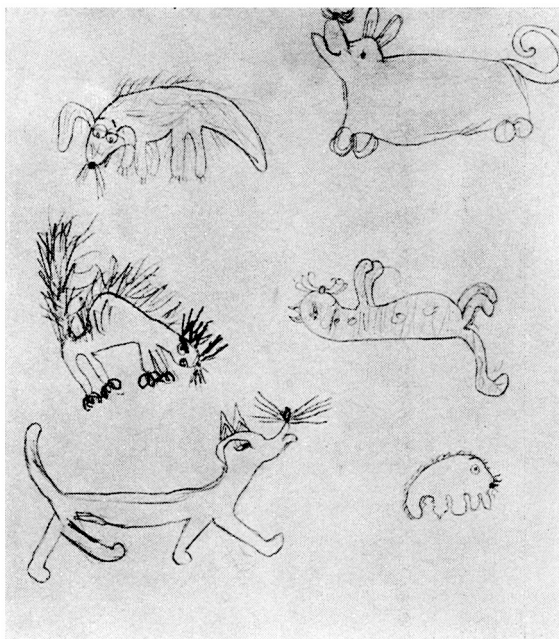
নানা ধরনের কুকুর: ঘরছাড়া, পোষা,
নীচ, অলস, অহঙ্কারী, ভীতু। ইভান্না,
৫ বছর

সেই সময়ে সক্রিয় থাকার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করছিলাম।

অতীতের ছিন্নসূত্রগুলি ফিরে গিয়ে জোড়া লাগানোর উপায় নেই। আমি লিখছি যাতে অন্য পিতামাতারা তাঁদের সন্তানের ব্যক্তিগত চারিত্রবৈশিষ্ট্যকে গণ্য করতে পারেন এবং অজ্ঞাতসারে হলেও, তার প্রতি যাতে বলপ্রয়োগ না করেন।

অধ্যায় ৪। অতি শৈশবে ব্যক্তিত্বের গঠন

শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন স্তর শুরু হয় জীবনের দ্বিতীয় বছরে।

আদি-শৈশব তাকে যুগিয়েছে দেখা, শোনা আর তার দেহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য। এখন থেকে শিশু আর অসহায় জীব নয়, তার গতিবিধিতে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের প্রচেষ্টায় সে অত্যন্ত সক্রিয়। মনোগত ক্রিয়াকলাপের যে মূল রূপগুলি মানুষের বৈশিষ্ট্যসূচক, সেগুলি শিশুর মধ্যে বিকাশলাভ করে তার জীবনের প্রথম বছরে। মনোগত বিকাশের প্রাক্-ইতিহাস এখন স্থান ছেড়ে দিয়েছে তার প্রকৃত ইতিহাসকে। পরবর্তী দুই বছর — অতি শৈশবকাল — শিশুকে দেবে গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন কৃতিত্ব।

প্রথম তিন বছর ধরে শিশুর মনে যে গুণগত রূপান্তর ঘটে যায় সেগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বলেন যে জন্মের মুহূর্ত আর সম্পূর্ণ পরিপক্কতা এই দুইয়ের মধ্যে মানবিক বিকাশের পথের সত্যিকার মধ্যস্থল এইগুলিই। তিন বছর বয়সের শিশু বস্তুতপক্ষে দৈনন্দিন ব্যবহারের অনেক জিনিসই কাজে

লাগাতে শিখেছে। সে তার নিজের অনেকগুলি প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং তার চারপাশের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে জানে। প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে ও অন্য শিশুদের সঙ্গে সে ভাব-বিনিময় করে মুখের কথা মারফৎ, এবং আচার-ব্যবহারের প্রাথমিক নিয়মগুলি মেনে চলে।

অতি শৈশবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জিত গুণাবলী

অতি শৈশবের যে সমস্ত মূল গুণ শিশুর মনের বিকাশ নির্ধারণ করবে সেগুলি হল **সোজা হয়ে চলাফেরার ক্ষমতা আয়ত্ত করা, জিনিসপত্র নিয়ে কাজের বিকাশ** এবং **কথা বলা আয়ত্ত করা**।

আদি শৈশবের শেষ দিকে শিশু প্রথম পা ফেলে চলতে শুরু করে। খাড়াখাড়ি অবস্থানে স্থানান্তরণটা দুরূহ ব্যাপার। হাঁটার ক্রিয়ার উপরে নিয়ন্ত্রণ এখনও পূর্ণ বিকশিত নয়, তাই শিশু প্রায়শই ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবে। সামান্যতম বাধা, যেমন একটা চেয়ার যার পাশ কাটিয়ে যাওয়া দরকার, কিংবা তার পায়ের তলায় পড়া কোনো ছোট জিনিস, শিশুকে বাধা দেয় এবং দু-এক পা চলার পর সে পড়ে যায়। তা সত্ত্বেও, তার পড়ে যাওয়ার ভয় কাটিয়ে উঠতে এবং প্রথম পদক্ষেপ করার জন্য বারবার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে তাকে যা উদ্বুদ্ধ করে, সেটা কী? প্রথমত, প্রাপ্তবয়স্কদের অংশগ্রহণ এবং সপ্রশংস অনুমোদন। কিন্তু, তার প্রথম সাফল্যগুলির একটু পরেই শিশু তার নিজের দেহকে আয়ত্তে আনার দরুন

আনন্দ পেতে শুরু করে এবং সমস্ত বাধা কাটিয়ে নিজের উপরে এই ক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য সে তার সাধ্যমতো সবকিছু করে। অধিকন্তু, হাঁটা — যেটা হামাগুড়ি দেওয়ার স্থান গ্রহণ করে — হয়ে ওঠে চলাফেরার, এবং বাঞ্ছিত বস্তুগুলির কাছে যাওয়ার মূল উপায়।

হাঁটা অভ্যাস করার ফলে দ্রুত দেখা দেয় আরও স্থিতিশীলতা, শিশু আর তত ঘনঘন পড়ে যায় না, তার লক্ষ্যবস্তুটির দিকে আরও নিশ্চিতভাবে হাঁটে, কিন্তু গতিগুলি দীর্ঘকাল ধরে যথেষ্ট সু-সমন্বিত থাকে না।

১·০—১·১।* কিরিউশা হাঁটে দুই বাহু অনেকখানি ছড়িয়ে দিয়ে, দেহটা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। তার মুখ দেখে বোঝা যায় সে যারপরনাই আনন্দ পাচ্ছে। কখনও কখনও তার আনন্দ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে পাগলের মতো দুবাহু আন্দোলিত করতে শুরু করে এবং, অবশ্যই পড়ে যায়। তবে, সেই সমস্ত বিশেষ ঘটনা তার হাঁটার বাসনাকে কিংবা তার খোশমেজাজকে কোনোমতেই প্রভাবিত করে না।

আন্দ্রিউশা একেবারে অন্য রকম। কাছের একটা জিনিস কত দূরে সেটা তার চোখ দিয়ে সে পরিমাপ করে নেয় তারপর সেটির দিকে হুড়মুড় করে ধেয়ে যায়। তারপরে আরেকটা নতুন লক্ষ্যবস্তু বেছে নিয়ে সেটির দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু ভীরুতা তাকে মাঝে মাঝেই পেয়ে বসে, সে এগোয় একমাত্র তখনই যখন হাতের কাছেই কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে — একজন প্রাপ্তবয়স্কের হাত, আসবাব অথবা দেয়াল, জরুরী অবস্থায় নিজের ভর

* এখানে ও পরবর্তী অংকগুলিতে শিশুর বছর ও মাস চিহ্নিত।

সামলাবার জন্য যাকে সে ব্যবহার করতে পারে। নিশ্চয়তা আর দ্রুততার জন্য, 'বন্ধুর' অঞ্চলটি সে চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়।

একটু একটু করে, শিশুরা আরও স্বচ্ছন্দে হাঁটতে শেখে। আগে যে প্রচন্ড উত্তেজনা স্পষ্টগোচর ছিল, সেটা ছাড়াই এখন গতিবিধি ঘটে। মনে হয় যেন চলাফেরা করতে গিয়ে তারা এমন কি অপ্রয়োজনেও বাড়তি অসুবিধা খুঁজে বার করে, যেখানে খাঁজ, ধাপ আর এবড়ো-খেবড়ো জায়গা সেখানেই হাঁটে। দেড় বছর বয়সে শিশুরা বাঁচে গতিবিধি অনুশীলনের মধ্যে। মামুলি দৌড়নো আর হাঁটা আর তাদের তৃপ্তি দেয় না: তারা ছোট ছোট জিনিসের উপরে হাঁটে, পিছন দিকে হাঁটে, ঘুরপাক খায়, অন্য জায়গার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে দৌড়ে দৌড়ে যাওয়ার মতো স্থান থাকলেও ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে দৌড়য় এবং চোখ বন্ধ করে চলে। এই বয়সে প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা পরিচালিত হলে তারা উৎসাহের সঙ্গে বিশেষ অনুশীলন করে।

হাঁটার ক্ষমতা আয়ত্ত করা শিশুর পক্ষে একটা বিশেষ জটিল কাজ। চলাফেরার এই উপায় ক্রমে ক্রমে স্বয়ংচল হয়ে ওঠে এবং শিশুর কাছে তা আর স্বতন্ত্র কোনো আগ্রহের বিষয় থাকে না।

সোজা হয়ে হাঁটার ক্ষমতা শিশুকে বাহ্যিক জগতের সঙ্গে স্বচ্ছন্দতর ও স্বাধীনতর সম্পর্কের এক কালপর্বে প্রবেশ করতে সক্ষম করে তোলে। সে নিজেকে স্থানে যথাযথভাবে স্থাপন করার সামর্থ্য অর্জন করে। পেশল সংবেদনশীলতা একটি বস্তুর দূরত্ব ও স্থানিক অবস্থিতি স্থির করার একটা

পরিমাপ হয়ে দাঁড়ায়। যে জিনিসটির দিকে সে দেখছে সেই জিনিসটির কাছে যেতে যেতে শিশু সেটির গতিমুখ আর তার যাত্রাবিন্দু থেকে সেটির দূরত্বের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে পরিচিত হয়ে ওঠে।

হাঁটার ক্ষমতা আয়ত্ত করার পর শিশু সেই সব জিনিসের সংখ্যা অনেকখানি বাড়িয়ে ফেলে যেগুলি তার উপলব্ধির বিষয় হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সে শেখে যে বারান্দা থেকে ওই বিশেষ গাছটির কাছে যেতে হলে তাকে একটা ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে হবে, সেই ঝোপে এমন সব তীক্ষ্ন কাঁটা আছে যেগুলি গায়ে বেঁধে, পথে একটা বড় গর্ত আছে, তার মধ্যে যেন পা না পড়ে, বেঞ্চিটার উপর দিকটা অমসৃণ, ছিলকা বিঁধে গিয়ে যন্ত্রণা হতে পারে, মুরগীছানা খুবই কমনীয়, কিন্তু মুরগীর বেশ জোরালো চঞ্চুও আছে, চাকায় হাত রেখে ট্রাইসাইকেল চালানো যায়, কিন্তু একটা বড় ঠেলাগাড়ি মোটেই নাড়ানো যায় না।

হাঁটা যেমন শিশুর স্বাধীনতা বাড়ায়, তেমনি নানান বস্তু ও সেগুলির গুণের সঙ্গে তার পরিচয়কেও বিস্তৃত করে, সেগুলি নিয়ে কাজ করার দক্ষতাও বাড়ায়।

শৈশবকালেই শিশু জিনিসপত্র নিয়ে রীতিমত জটিল কাজ চালাতে পারে, প্রাপ্তবয়স্কদের দেখিয়ে দেওয়া অনেকগুলি কাজ করতে পারে, এবং আয়ত্ত করা ক্রিয়াকে সে একটা নতুন বস্তুতে স্থানান্তরিত করতে পারে। কিন্তু জিনিস নিয়ে শিশুর নাড়াচাড়ার কাজটা চালিত হয় শুধু

সেই জিনিসগুলির বাহ্যিক গুণাগুণ আর সম্পর্ক ব্যবহার করার দিকে — একটা লাঠি, একটা পেনসিল বা একটা খেলনা-বেলচাকে যেভাবে সে নাড়াবে ঠিক সেইভাবেই সে নাড়ায় একটা চামচকেও।

আদি শৈশব থেকে শৈশবে পদার্পণ করার সঙ্গে জড়িত থাকে বস্তুসমূহের জগতের প্রতি এক নতুন মনোভাবের বিকাশ, বস্তুগুলি শিশুর কাছে শুধু নাড়াচাড়া করার পক্ষে সুবিধাজনক বস্তুই থাকে না, হয়ে উঠতে শুরু করে এমন সব জিনিস যেগুলির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট উপায় আছে, অর্থাৎ সামাজিক অভিজ্ঞতা সেগুলিকে যে ক্রিয়ার ভার ন্যস্ত করেছে সেইটি আছে। শিশুর মূল আগ্রহ সরে যায় জিনিস নিয়ে আরও বেশি নতুন নতুন ক্রিয়া আয়ত্ত করার জগতে, আর এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক গ্রহণ করে শিক্ষাদাতা, সহকর্মী ও সহকারীর ভূমিকা। গোটা এই সময়টা ধরে যেটি প্রধান ধরনের ক্রিয়া, জিনিসপত্র নিয়ে সেই কাজকর্মের সূত্রপাত ঘটে অতি শৈশবকালে।

জিনিসপত্র নিয়ে কাজকর্মের মধ্যে সেগুলির ক্রিয়া শিশুর সামনে এই প্রথম উদ্ঘাটিত হয়: এইসব ক্রিয়া সরল নাড়াচাড়া মারফৎ আবিষ্কার করা যায় না। যেমন, শিশু যতবার খুশী আলমারির দরজা খুলতে আর বন্ধ করতে পারে, কিংবা তার চামচটা মেঝের উপরে ঠুকে যেতে পারে অনন্তকাল, কিন্তু এইসমস্ত কাজ বস্তুগুলির ক্রিয়া সম্পর্কে তার অবধারণার ব্যাপারে তাকে এক পা-ও এগিয়ে নিয়ে যায় না। একমাত্র প্রাপ্তবয়স্কই কোনো না কোনোভাবে

আলমারির বা চামচের উদ্দেশ্যটা শিশুর কাছে প্রকাশ করতে সক্ষম।

জিনিসগুলি কিসের জন্য সেটা একজন শিশু যেভাবে শেখে আর বানরের মধ্যে পরিলক্ষিত অনুকরণের রূপগুলি — এই দুয়ের মধ্যে আমূল পার্থক্য আছে। বানর একটা কাপ থেকে জল পান করতে শিখতে পারে, কিন্তু কাপটি তার কাছে এমন একটা বস্তুর স্থায়ী তাৎপর্য লাভ করে না যেটি থেকে জল পান করতে হয়। পশুটি যদি জল পান করতে চায় এবং একটা কাপের মধ্যে জল দেখে তা হলে সে সেই কাপ থেকেই জল পান করবে। কিন্তু সে সমান সফলভাবেই তার তৃষ্ণা নিবারণ করবে একটা বালতি থেকে অথবা মেঝে থেকে, যদি ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাক্রমে সেখানেই জল থাকে। ঠিক সেইভাবেই বানরটি যখন তৃষ্ণার্ত নয় তখন কাপটিকে সে ব্যবহার করবে সব ধরনের কাজে, যেমন ছুঁড়ে মারা বা সেটি দিয়ে দুম্‌দুম্‌ করে ঘা মারার কাজে। শিশু কিন্তু শেখে বস্তুটি কিসের জন্য — সমাজ তার উপরে কোন ক্রিয়া ন্যস্ত করেছে — এবং তা ক্ষণিক প্রয়োজনের সাড়ায় পরিবর্তিত হয় না। এর মানে অবশ্য এই নয় যে একটি বস্তু নিয়ে কোনো কাজ একবার আয়ত্ত করার পর শিশু সব সময়েই সেটিকে যথা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। একটা পেনসিল দিয়ে কাগজের উপরে লাইন আঁকতে শেখার পর সে অনেকগুলি পেনসিল নিয়ে গড়গড়ানি খেলতে পারে অথবা সেগুলি দিয়ে কুয়োও তৈরি করতে পারে। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে শিশু এ কাজটা করলেও, বস্তুটির আসল উদ্দেশ্য সে

উপলব্ধি করে। দুই বছর বয়সের কোনো দুষ্টু ছেলে যখন নিজের মাথার উপরে তার জুতো রাখে তখন সে হাসে, কারণ বস্তুটির যা উদ্দেশ্য তার সঙ্গে তার কাজের বেমানান ধরনটি সে বুঝতে পারে।

বস্তুসমূহ নিয়ে কাজকর্মের বিকাশের প্রারম্ভিক স্তরগুলিতে ক্রিয়া আর বস্তু কঠোরভাবে সম্পর্কিত: যে বস্তুটির যে কাজ শুধু সেই কাজটিই শিশু সম্পন্ন করতে পারে। কেউ যদি বলে যে একটা কাঠি দিয়ে সে চুল আঁচড়াক, কিংবা একটা ব্লক থেকে জলপান করুক, তা হলে সেই অনুরোধ সে রক্ষা করতে পারে না এবং তার ক্রিয়া নানা অংশে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ক্রিয়া থেকে বস্তুর পৃথকীকরণ এক ক্রমান্বিত প্রক্রিয়া, যার ফলে শিশুরা অতি শৈশবেই বস্তুসমূহ দিয়ে এমন ক্রিয়া সম্পন্ন করার সামর্থ্য অর্জন করে, যেসব ক্রিয়ার জন্য ওই বস্তুগুলি নয়, কিংবা তারা একটা বস্তুকে এমন কিছুর জন্য কাজে লাগাবার সামর্থ্য অর্জন করে, যে কাজে সেটি লাগার কথা নয়।

ক্রিয়া ও বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক বিকাশের তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। প্রথমটিতে, শিশু জানে এমন যে কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে বস্তুটি দিয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বস্তুটিকে কাজে লাগানো হয় শুধু তার নির্ধারিত উদ্দেশ্যের জন্য। এবং সবশেষে, তৃতীয় পর্যায়ে, যাকে বলা যেতে পারে অতীতে প্রত্যাবর্তন, সেই জিনিসটি ঘটে — বস্তুটির অবাধ ব্যবহার, কিন্তু পুরোপুরি ভিন্ন স্তরে: বস্তুটির মূল ক্রিয়া শিশু জানে।

এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে সাধারণ ব্যবহারে বস্তুগুলিকে ব্যবহার করার ক্রিয়া আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু সেই বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক আচরণের নিয়মগুলিও আত্মস্থ করে। একজন শিশু যদি একজন প্রাপ্তবয়স্কের উপরে রাগ করে, তা হলে সে তার কাপটা মেঝের উপরে ছুঁড়ে মারতে পারে। কিন্তু তার মুখে তৎক্ষণাৎ দেখা দেবে ভয় আর অনুতাপের অভিব্যক্তি: সে বুঝতে পারছে যে একটা বস্তুর প্রতি মনোভাব সম্পর্কে যে নিয়মগুলি সকলের পক্ষেই অবশ্যপালনীয়, সেই নিয়মগুলি সে অমান্য করেছে।

বস্তুসমূহ দিয়ে কাজকর্ম আয়ত্ত করার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে শিশুর কাছে নতুন সব পরিস্থিতি সম্পর্কে শিশুর উপলব্ধির চরিত্র এবং নতুন নতুন বস্তুর সঙ্গে তার মোকাবিলার চরিত্র বদলে যায়। জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করার কালপর্বে শিশু যদি একটি অপরিচিত জিনিস পায় এবং জানা সর্বপ্রকারে সেটি দিয়ে কাজ করে, তা হলে পরবর্তীকালে, এই জিনিসটি কিসের জন্য উপযুক্ত আর কীভাবে সেটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে তা স্থির করার দিকেই তার মনোযোগ চালিত হয়। যে ধরনের বোধ বলে 'ওটা কী?' তার স্থান গ্রহণ করে এমন একটা বোধ যা বলে 'এটা দিয়ে কী করা যায়?'

এই সময়ে শিশু যেসব ক্রিয়া আয়ত্ত করে তার সবই যে এক ধরনের তা নয়, তার মনোগত বিকাশের পক্ষেও সবগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য মুখ্যত নির্ভর করে বস্তুগুলির নিজেদেরই গুণ ও প্রকৃতির উপরে। কোনো কোনো বস্তুর রীতিমত বিশেষ-নির্দিষ্ট

উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যেই সেগুলি ব্যবহৃত হয়: জামাকাপড়, পাত্র ও আধার, আসবাব ইত্যাদি। ব্যবহারের পদ্ধতির যে কোনো লঙ্ঘনকেই গণ্য করা যেতে পারে সামাজিক রীতিভঙ্গ হিসেবে। খেলনার মতো অন্যান্য বস্তু দিয়ে অবাধতর ব্যবহার করতে দেওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির মধ্যেও বিরাট পার্থক্য আছে। কোনো কোনো খেলনা নির্দিষ্ট ক্রিয়া করার জন্যই বিশেষভাবে তৈরি (পিরামিড, একটার ভিতরে আরেকটা ঠিক মতো ঢুকে যায় এমন সব পুতুল), কিন্তু অন্য সব খেলনাও আছে যেগুলিকে নানান ভাবে ব্যবহার করা যায় (ব্লক, বল)। যেসব বস্তুকে শুধু নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করা যায় সেগুলি দিয়ে কাজকর্ম আয়ত্ত করাটা শিশুর মনোগত বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যেসব বস্তুর ক্রিয়াগত উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট এবং ব্যবহার পদ্ধতি ইতিহাস-নির্ধারিত, সেগুলি ছাড়াও আছে, যাকে বলা যেতে পারে, সর্বার্থসাধক বস্তু, শিশুদের খেলায় ও ব্যবহারিক জীবনে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হতে পারে বহুবিচিত্র নানান ধরনের বস্তুর প্রতিকল্প হিসেবে। এই সমস্ত বস্তু ব্যবহার করার সম্ভাবনা শিশু বেশির ভাগ সময়েই আবিষ্কার করে একজন প্রাপ্তবয়স্কের সাহায্যের মধ্য দিয়ে।

বিভিন্ন বস্তু ব্যবহারের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক ক্রিয়া সম্পন্ন করাই যথেষ্ট (দৃষ্টান্তস্বরূপ, আলমারির দরজা খোলার জন্য হাতলটা টানা), অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি জটিল, তার জন্য বস্তুটির গুণ ও প্রকৃতি এবং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সেটির

সম্পর্ক গণ্য করা দরকার হয় (দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা বেলচা দিয়ে বালির মধ্যে গর্ত খোঁড়া)। যেসব ক্রিয়ায় মনের উপরে চাহিদাটা বেশি, সেগুলি মনোগত বিকাশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বেশি সাহায্য করে।

কথা-বলা আয়ত্ত করার পক্ষে অতি-শৈশবকাল একটা সংবেদনশীল কালপর্ব। আমরা দেখেছি, এই আয়ত্তকরণের প্রচণ্ড প্রস্তুতি একেবারে ছোট অবস্থাতেই চলে: ভাষার ধ্বনি শ্রবণের বনিয়াদ সৃষ্টি হতে থাকে, কথা বলার ধ্বনি উচ্চারণ ত্রুটিহীন করা হতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত আসে তার প্রথম কথাগুলি বোঝা ও উচ্চারণ করা, প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সম্ভাবনাকে যা প্রসারিত করে।

শিশু আর প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে আদান-প্রদানের যে পরিবর্তমান রূপ বস্তুসমূহ দিয়ে কাজকর্ম আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে, তা অতি শৈশবে কথা-বলার ক্ষমতা বিকাশের পক্ষে নিয়ামক। 'মূক' ধরনের পরিচালনা (নানান ক্রিয়া কীভাবে করতে হয় শিশুকে তা দেখিয়ে দেওয়া, তার গতিবিধি পরিচালনা করা, ভাবভঙ্গি ও অনুকৃতির মধ্য দিয়ে অনুমোদন প্রকাশ করা) বস্তু ব্যবহার করার উপায় ও নিয়ম তাকে শেখানোর পক্ষে স্পষ্টতই অ-প্রতুল হয়ে পড়ে। বস্তুসমূহে, সেগুলির গুণ ও প্রকৃতিতে এবং সেগুলি দিয়ে কী করা যায় তাইতে শিশুর ক্রমবর্ধমান আগ্রহ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি নিয়ত আবেদন উদ্রেক করে। কিন্তু মৌখিক ভাব-বিনিময় আয়ত্ত করলেই শিশু প্রয়োজনীয় সাহায্য চাইতে এবং পেতে

পারে, আর এটাই কথা বলার ক্ষমতা আয়ত্ত করার পক্ষে প্রধান উদ্দীপক।

এখানে অনেককিছু নির্ভর করে প্রাপ্তবয়স্কদের উপরে, শিশুর সঙ্গে ভাব-বিনিময় তারা কীভাবে সংগঠিত করে এবং তার কাছে তারা কী দাবি করে, তার উপরে। যেসব শিশুর সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের ভাব-বিনিময় খুবই কম এবং যাদের প্রতি শুধু সীমিত মনোযোগ দেওয়া হয়, বাক্‌শক্তির বিকাশের দিক দিয়ে তারা অনেক পিছিয়ে থাকে। অন্য দিকে, প্রাপ্তবয়স্করা যদি শিশুর প্রত্যেকটি ইচ্ছাই পূরণ করতে চেষ্টা করে এবং সে যাকিছু চায় প্রথম ইঙ্গিতেই সে সব করতে চেষ্টা করে তা হলে সেই শিশু দীর্ঘকাল কথা না বলেই কাজ চালিয়ে যেতে পারে। প্রাপ্তবয়স্করা যখন শিশুকে স্পষ্টভাবে কথা বলতে এবং তার ইচ্ছাকে যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে কথায় ব্যক্ত করতে বাধ্য করে, এবং তারপরেই শুধু তার ইচ্ছা পূরণ করে, তখন সেটা আলাদা ব্যাপার।

মৌখিক ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজনের পাশাপাশি জিনিসপত্র দিয়ে কাজকর্মের মধ্যে ছাপ সংগ্রহের যে ঘটনা ঘটে তা বাক্‌শক্তির বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলিই হয় শব্দগুলির অর্থ আয়ত্ত করার এবং পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর বস্তু ও ব্যাপারগুলির রূপকল্পের সঙ্গে সেগুলির অনুষঙ্গ বোঝার ভিত্তি।

শৈশবে বাক্‌শক্তির বিকাশ এগোয় দুই দিকে: প্রাপ্তবয়স্কদের কথা বোঝা ত্রুটিহীন হয়, এবং শিশুর নিজের সক্রিয় বাক্‌শক্তির বিকাশ ঘটে।

যে সব বস্তু ও ক্রিয়াকে শব্দগুলি নির্দেশ করছে সেই সব বস্তু ও ক্রিয়ার সঙ্গে শব্দগুলিকে সম্পর্কিত করার সামর্থ্য সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর হয় না। প্রারম্ভিকভাবে তার বোধটা সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে, সুনির্দিষ্ট একটি বস্তু বা ক্রিয়ার সঙ্গে নয়। একটি শিশু একজন ব্যক্তির সঙ্গে ভাব-বিনিময় চালিয়ে রীতিমত যথাযথভাবে কিছু কিছু কাজ সম্পন্ন করতে পারে, অথচ অন্যদের বলা সেই একই শব্দে সাড়া দিতে পুরোপুরি অপারগ হতে পারে। এক বছর বয়সের শিশু, তার মা যদি জিজ্ঞাসা করে, তার মাথা, নাক, চোখ বা পায়ের দিকে আঙুল দেখালেও, অন্যদের কাছ থেকে অনুরূপ অনুরোধে সাড়া দিতে সক্ষম নাও হতে পারে। মা আর শিশু এমন অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে থাকে যে শুধু কথা নয়, অঙ্গভঙ্গি, অনুকৃতি, গলার সুর আর ভাব-বিনিময়ের পরিস্থিতি, সবই ক্রিয়ার একটি সংকেত হিসেবে কাজ করে।

শিশু তার আশপাশের লোকের কথায় সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে, যখন সেই কথাগুলি ঘনঘন পুনরাবৃত্তি করা হয় সুনির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গি সহযোগে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক শিশুটির উদ্দেশে বলে: 'তোমার হাতটা আমায় দাও', এবং নিজে তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গি করে। শিশু তাড়াতাড়ি সাড়া দেওয়ার ক্রিয়াটি শিখে যায়, কিন্তু সে শুধু কথারই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না, বরং সমগ্র পরিস্থিতিটাতেই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

পরবর্তীকালে পরিস্থিতিটার গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়, এবং কথাগুলো যেই বলুক না কেন, আর তার সঙ্গে যে

অঙ্গভঙ্গিই থাকুক না কেন, শিশু কথাগুলো বুঝতে শুরু করে।

শিশুর সক্রিয় বাক্‌শক্তির বিকাশ ধীরে ধীরে চলে দেড় বছর পর্যন্ত। এই সময়ে তার দখলে আসে ৩০-৪০ থেকে ১০০ শব্দ, এখন সেগুলি সে ব্যবহার করে কদাচিৎ। এই বয়সের পরে সাধারণত প্রচণ্ড একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। শিশুটি উদ্যোগী হয়। সে যে শুধু সব সময় বস্তুগুলির নাম জিজ্ঞাসা করে চলে তাই নয়, এই সমস্ত বস্তুর পরিচয়সূচক শব্দগুলি বলতেও চেষ্টা করে। প্রথম দিকে সে যথেষ্ট বাচন ক্ষমতার অধিকারী হয় না, কিন্তু অচিরেই 'এটা কী?' প্রশ্নটি হয়ে ওঠে প্রাপ্তবয়স্কের কাছে তার নিত্য জিজ্ঞাস্য, এবং তার বাক্‌শক্তির বিকাশের হারটাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। দ্বিতীয় বছরের শেষ দিকে শিশু ৩০০টি পর্যন্ত শব্দ ব্যবহার করে, এবং তৃতীয় বছরের শেষে, ১,৫০০টি পর্যন্ত শব্দ।

কথা-বলা আয়ত্ত করাটা শিশুর মনোগত বিকাশের বহু ভিন্ন-ভিন্ন দিকের পক্ষে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। কথা-বলার ক্ষমতা একটু একটু করে হয়ে ওঠে শিশুর কাছে সামাজিক অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের দিক থেকে তার কাজকর্ম পরিচালিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। বাক্‌শক্তির প্রভাবে শিশুর মনোগত প্রক্রিয়াসমূহ— তার উপলব্ধি, চিন্তা ও স্মৃতিশক্তি পুনর্গঠিত হয়।

শিশুর মনোগত বিকাশ চলাকালে বিভিন্ন ক্রিয়া আয়ত্তকরণ ও এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় মনোগত প্রক্রিয়া আর গুণাবলী গঠন ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপার ঘটে। শিশু ক্রমে ক্রমে এমনভাবে আচরণ করতে শেখে যা মানুষেরই বৈশিষ্ট্যসূচক, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে অর্জন করে সেই সব আন্তর গুণবৈশিষ্ট্য যেগুলি মানুষকে সমাজের একজন সদস্য হিসেবে বিশিষ্টতা প্রদান করে এবং তার কাজকর্ম নির্ধারণ করে।

একেবারে ছোট্ট শিশুর প্রাত্যহিক কার্য পরম্পরা (ঘুম, জাগ্রত অবস্থায় আচরণ, খাওয়ানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, ব্যায়াম ও খেলা) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি স্থির করে দিতে পারে, কিন্তু পরবর্তী শৈশবে শিশুকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। দ্বিতীয় বছরের শুরুতে এসে পৌঁছয় সেই মুহূর্তটি যখন শিশু বাধ্যভাবে সবকিছু আর মেনে নেয় না, প্রাপ্তবয়স্কও তার আচরণ পুরোপুরি পরিচালিত করতে পারে না। দ্বিতীয় বছরে, শিশুরা শুধু প্রত্যক্ষ ছাপলব্ধ ধারণার প্রভাবেই নয়, স্মৃতিতে রক্ষিত মডেলগুলির প্রভাবেও কাজ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। এই সময়ে স্মৃতিশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করে: মনোগত প্রক্রিয়ায় স্মৃতিশক্তির অন্তর্ভুক্তি শিশুর চেতনা ও আচরণকে রূপান্তরিত করে। গুরুতর এক অসুখের পর দুই বছর বয়সী কিরিউশা যখন তার জানা

সমস্ত শব্দ কিছু কালের জন্য ভুলে গিয়েছিল, তখন সেই হারানোর বেদনা সে অনুভব করেছিল তীব্রভাবে: সে তার আঙুল দিয়ে বস্তুগুলির দিকে দেখাত, একেবারে বাচ্চা অবস্থায় যেমন করত সেইভাবে 'গর্জন' করত, ক্ষোভে কাঁদত।

স্মৃতিশক্তি শিশুকে শুধু বস্তুসমূহ আর লোকজনের জগতেই নয়, তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে তার অবস্থিতি খুঁজে পেতে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে এখানেও, এই বোধ যখন বিকশিত হতে শুরু করে, প্রাপ্তবয়স্করা পালন করে এক নিয়ামক ভূমিকা।

প্রাপ্তবয়স্কের সাহায্যে শিশু আচরণের এক মানবিক প্রেষণা অর্জন করতে শুরু করে। কিন্তু, একজন বিকাশপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রেষণাকে তার সার্মগ্রিকতায় অচিরেই শিশু আত্মস্থ করতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্কের আচরণ মুখ্যত সচেতন উদ্দেশ্য দ্বারা শাসিত; সে নিজেই স্থির করে নেয়, কেন এক নির্দিষ্ট অবস্থায় সে বিশেষ একভাবে আচরণ করবে, অন্যভাবে নয়। একজন প্রাপ্তবয়স্কের আচরণের উদ্দেশ্যগুলি একটা বিশেষ নির্দিষ্ট ব্যবস্থার পরিচায়ক, তা নির্ভর করে সেই বিশেষ ব্যক্তিটির কাছে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা কম গুরুত্বপূর্ণ, তার উপরে। একটা জরুরী কাজ যদি সে শেষ না করে থাকে তা হলে সে সিনেমায় যাবে না বলে স্থির করতে পারে, কিংবা একটা চিত্তাকর্ষক ভ্রমণে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে কারণ সে মনে করে তার রুগ্ন পিতামাতার দেখাশোনা করা উচিত। শিশুর এখনও এটা শেখা বাকি।

তার উদ্দেশ্যগুলি সাধারণত সচেতন নয় এবং গুরুত্বের সোপানবৎ বিন্যাসের ভিত্তিতে একটা ব্যবস্থার মধ্যে সংগঠিত নয়। শিশুর আভ্যন্তরিক জগত সুনির্দিষ্টতা ও স্থিতিশীলতা অর্জন করে ক্রমে ক্রমে। আর এই আভ্যন্তরিক জগতের গঠনপ্রক্রিয়া প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত হলেও, তারা লোকজন আর বস্তুসমূহ সম্পর্কে নিজেদের মনোভাব অথবা তাদের আচরণের ধরন শিশুর মধ্যে সরাসরি সঞ্চারিত করতে পারে না।

শিশু শুধু বেঁচে থাকতেই শিখছে না, সে বেঁচে আছে, এবং শিক্ষা সমেত সমস্ত বাহ্যিক প্রভাব নানা প্রকার গুরুত্ব অর্জন করছে, সেটা নির্ভর করে শিশু সেগুলিকে কীভাবে গ্রহণ করছে তার উপরে এবং ইতিপূর্বে তার মধ্যে যেসব চাহিদা ও আগ্রহ গড়ে উঠেছিল সেগুলি কতখানি পূরণ হচ্ছে, তার উপরে। অনেক ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত প্রভাব-গুলি আর প্রাপ্তবয়স্করা শিশুর কাছে যেসব দাবি উপস্থিত করে, সেগুলি শিশুর সামনে অনিবার্যরূপে দেখা দেয় পরস্পরবিরোধী হিসেবে। শিশুকে নানান বস্তু, খেলনা এবং সেগুলি দিয়ে কাজকর্মে আগ্রহী করার জন্য প্রাপ্ত-বয়স্করা তাদের সাধ্যমতো সবকিছুই করে। এবং এর ফলে খেলনাগুলি তার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে, আশেপাশে অন্য শিশুরা আছে বলে, তাকে একটা খেলনা দিয়ে দিতে বলা হবে, এবং তার সমবয়সী বন্ধুর অধিকার স্বীকার করতে বলা হবে। যে সমস্ত মনোগত বৈশিষ্ট্য নানাধর্মী উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করতে এবং তার একটিকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ

অন্যান্য উদ্দেশ্যের অধীনস্থ করতে তাকে সক্ষম করে তোলে, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করতে শিশুর দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

অতি শৈশবে আচরণের এক বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে শিশু চিন্তা না করেই কাজ করে, এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে তার আশু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জাগ্রত অনুভূতি ও বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। শিশু কোনো কিছুর দ্বারা অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তেমনি সহজেই বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হয়। একেবারে বাচ্চা একটি শিশু যদি কাঁদতে শুরু করে, তা হলে একটা নতুন খেলনা বা তার উদ্দেশে শুধু কথা বলাই তাকে শান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু অতি শৈশবের শুরুতেই — বস্তুসমূহের স্থিতিশীল রূপকল্প গঠনের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট — এমন সব অনুভূতি ও বাসনা দেখা দেয় যেগুলি শিশুর স্মরণে-থাকা বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত, যদিও সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তে সে সেগুলিকে দেখতে পাচ্ছে না।

রূপকল্পগুলির সঙ্গে অনুভূতি আর বাসনার সম্পর্ক একবার স্থাপিত হতে শুরু হলে শিশুর আচরণ একটি মূর্ত পরিস্থিতির উপরে কম নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সৃষ্টি হয় আচরণের মৌখিক নিয়ন্ত্রণের বিকাশের ভিত্তি: ভাষান্তরে, মৌখিকভাবে বর্ণিত উদ্দেশ্যের দিকে চালিত ক্রিয়া সম্পন্ন করার ভিত্তি।

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের ব্যাপারে নিয়ামক মুহূর্তটি হল তার নিজের **আমি** সম্বন্ধে উপলব্ধি। শিশু 'আমি' সর্বনামটিকে গ্রহণ করে তার নিজের পরিচায়ক-লক্ষণ

হিসেবে। সর্বনামের দ্বারা প্রতিস্থাপিত নামটি সমীকৃত হয় তার সঙ্গে (নাম-আমি), শিশুর চেতনায় তা হয়ে ওঠে এক ধরনের সমগ্রতা, তার ব্যক্তিগত অন্তঃসার যাতে প্রতিফলিত।

অতি ছোট শিশুদের মধ্যে আত্ম-জ্ঞান, আত্ম-চেতনা ও আত্ম-মূল্যায়ন

অতি ছোট শিশুর বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত হল সেটি, যখন সে নিজের সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে একজন পৃথক ব্যক্তি হিসেবে, পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে যে পরিবর্তিত হয় না এবং যার নিজস্ব বিশেষ বাসনা-কামনা আছে, প্রাপ্তবয়স্কের ইচ্ছার সঙ্গে সেগুলি মিলতেও পারে, না-ও মিলতে পারে।

শৈশবের শুরুতে শিশু তখনও তার অনুভূতি ও বাসনাগুলিকে সেগুলির বাহ্যিক কারণ থেকে পৃথক করে না। সে রয়েছে নিয়ত গতির অবস্থায়, এবং নানা কাজ করতে করতে তার আভ্যন্তরিক অবস্থা নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে, আর এই পরিবর্তনযোগ্যতার মধ্যেই দেখা দেয় সেই সব মানুষ আর বস্তু, যেগুলির দিকে তার ইচ্ছা পরিচালিত। শিশুর পক্ষে এটা বোঝা আরও কঠিন যে অন্যদের থেকে পৃথকভাবে অবস্থিত যে ব্যক্তিটি বিভিন্ন ক্রিয়ার উৎস, সেই ব্যক্তিটি বস্তুতপক্ষে সে নিজেই। শিশুরা নিজেদের প্রতি তাদের মনোভাব ধার করে প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে। নিজেদের সম্পর্কে তারা কথা বলে প্রথম

পুরুষে এবং প্রায়শই নিজেদের উদ্দেশে কথা বলে, নিজেদের সঙ্গে তর্ক করে, নিজেদের ভর্ৎসনা করে অথবা ধন্যবাদ দেয় যেমনটা তারা অন্য কারও বেলায় করত সেইভাবে। অন্যদের সঙ্গে এই যে ঐকাত্ম্য শিশুরা প্রায়শই বোধ করে, তা ঘনঘন প্রকাশ পায় তাদের অভিব্যক্তিতে। একটি ছেলের বাবা-মা যখন তাকে বলে: 'আমরা বেড়াতে যাচ্ছি', তখন সেই ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে: 'আমরা কি আমাকে নিয়ে যাচ্ছি?' একবার ছোট একটি মেয়ে তার বাবার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল তার অজানা কয়েকজন আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করার জন্য। একজন আগন্তুক ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন: 'আর এটি কার মেয়ে?' ছোট মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল: 'ও আমাদের, ও আমাদের মেয়ে!'

শিশু নিজেকে জানতে শুরু করে খুব অল্প বয়সেই। এই পরিচয় ঘটে গোড়ায় বাহ্যিক চেহারার সঙ্গে, এবং তারপরে আন্তর জগতের সঙ্গেও।

অন্যদের থেকে পৃথকরূপে বিভিন্ন বাসনা ও ক্রিয়ার এক চলমান উৎস হিসেবে নিজের সম্পর্কে সচেতনতা আসে শিশুর জীবনের তৃতীয় বছরের শেষ দিকে, তার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারিক স্বাধীনতার প্রভাবে। নানা বস্তু দিয়ে কারও সাহায্য না নিয়ে কাজ করার সামর্থ্য এবং নিজের দিকে নজর দেওয়ার সরলতম অভ্যাসগুলি শিশু অর্জন করে। তার ফল হয় এই যে, সে বুঝতে শুরু করে সে নিজেই কতকগুলি জিনিস করে। এই বোধটা বাহ্যিক-ভাবে প্রকাশ পায় তখন, যখন সে নিজের সম্পর্কে কথা

বলতে শুরু করে উত্তম পুরুষে: ‘আমি দৌড়চ্ছি’, ‘আমাকে পুতুলটা দাও’, ‘তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাও’।

কথা-না-বলা শৈশবদশা থেকে শিশু তার চারপাশের জগতে নিজেকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করার আকাঙ্ক্ষার দিকে যায়। বস্তুতপক্ষে সে এখন অনেক কিছুই করতে পারে: সে স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারে, বস্তু দিয়ে কাজ করতে পারে, নিজের অনেকগুলি চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং অপরের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করতে পারে।

এই কালপর্বে শিশুর কাজকর্ম শুধু তার চারপাশের জগতের দিকেই (বস্তু আর লোকজনের জগত) চালিত নয়, তার নিজের দিকেও চালিত। শিশু নিজেকে জানতে শুরু করে। বস্তুসমূহের জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত করে সে নিজের সামর্থ্যগুলি পরীক্ষা করে: একটি বস্তু দিয়ে সে যখন বারবার একই নাড়াচাড়া করে, তখন সে সমনোযোগে লক্ষ করে কী কী পরিবর্তন সে ঘটাচ্ছে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, সে দরজা খোলে আর বন্ধ করে, টেলিভিশন বা রেডিওর সুইচ চালু অথবা বন্ধ করে দেয়, জিনিসপত্র দিয়ে এদিকে-ওদিকে সরায়, সেগুলিকে এমনভাবে ঠেলে যাতে সেগুলি উল্টে পড়ে যায়, ইত্যাদি)। তার নিজের সক্রিয় ইচ্ছাশক্তিই শিশুকে তার চারপাশের কোনো কিছুকে বদলাবার ক্ষমতা অনুভব করতে সাহায্য করে।

এই সময়েই সে নিজের দেহ পরীক্ষা করে দেখার কাজ চালিয়ে যায়। তার আগ্রহ সব কিছুতেই: আঙুল, কান, চোখ, জিহ্বা, হাত, পেট এবং তার লিঙ্গের বিশেষ বিশেষ

প্রকৃতি। সে তার কান টানে, চোখের উপরে হাত-চাপা দেয়, নিজের নাভিতে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়, পায়ের আঙুল নানা দিকে টানে, চুল ধরে হেঁচকে টানে, ইত্যাদি। এই সবকিছুই সে করে পরিবর্তনহীন উৎসাহ আর নিজের প্রতি অপ্রশমিত কৌতূহল নিয়ে। তার নিজের সম্পর্কে আচরণ বাহ্যিক বস্তুগুলির সম্পর্কে তার আচরণেরই মতো।

জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার এক সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত হয়ে আত্ম-জ্ঞান পরিণত হয় আত্ম-চেতনায়। আঙুল দিয়ে নিজের বুক ছুঁয়ে, নিজের দেহ অনুভব করে ও নিজেকে **'আমি'** অথবা নিজের নামে অভিহিত করে শিশু নিজেকে সপ্রমাণিত করে; কিন্তু আত্ম-জ্ঞান আর আত্ম-চেতনার ক্ষেত্রে অনেক আবিষ্কার তখনও তার সামনে পড়ে রয়েছে।

১·৯। আন্দ্রিউশা একটা আবিষ্কার করেছে। সে আয়নার মধ্যে তাকিয়ে সানন্দে জানায়: 'আমি!' তারপর আঙুল দিয়ে নিজের দিকে দেখায়: 'এটা আমি!'

সে আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়: 'এটা মা!' আমাকে ধরে নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে যায় আয়নার কাছে, তারপর আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বলে: 'এটা মা!' — আমার দিকে দেখিয়ে বলে: 'এটা মা!' আবার আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখায়: 'এটা মা!' এই রকম বারবার পুনরাবৃত্তি করে।

পরের কয়েক সপ্তাহ দু-ছেলেই আয়নায় তাদের প্রতিবিম্ব নিয়ে খেলে আনন্দ পায়।

১·১০। কিরিউশা আয়নার মধ্যে তাকায়, বলে: 'ওটা কীকা।' আমি জিজ্ঞাসা করি: 'কিরিউশা আর কোথায় আছে?'

'এখানে!' সে বলে নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে। তারপর সে আবার আঙুল দিয়ে দেখায় আয়নায় তার প্রতিবিম্বের দিকে: 'ওখানে!'

'ওখানে নেই', — আয়নার যে অংশে তার প্রতিবিম্ব পড়ে নি সেই অংশটা দেখিয়ে সে বলে। তারপর সে আলমারিটার দিকে দেখিয়ে বলে: 'ওখানে নেই!' তারপর আবার আয়নায় তার প্রতিবিম্বের দিকে আঙুল দেখায় 'ওই যে কীকা!'

২·১। আয়না নিয়ে খেলা চলছে চার মাস ধরে। দুজনেই নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে: 'এই যে আমি!' তারপর আয়নার দিকে আঙুল দেখায়: 'ওই যে আমি!' তারপর পরিবারের সবাইকে পালা করে নিয়ে যায় আয়নার কাছে।

প্রতিবিম্ব নিয়ে খেলায় এই দীর্ঘকাল মগ্ন হয়ে থাকাটা এই ইঙ্গিতই দেয় যে শিশুর আত্ম-জ্ঞান চলছে ভাবাবেগগত-অনুভূতিগত স্তরে। এই বয়সের অনেক শিশুর মতোই, কিরিউশা আর আন্দ্রিউশা তাদের নিজেদের ছায়ার সঙ্গে খেলতে ভালোবাসে। তারা তাদের ছায়া থেকে দৌড়ে অন্য দিকে চলে যায়, ছায়াকে নিশ্চল করে রাখে, নড়তে দেয় না, তারপর গাছের ঘন ছায়ায় সেটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেয়।

২·৬। নিজের ছায়া সম্পর্কে কিরিউশা বলে: 'এটা আমার কীকা।' আন্দ্রিউশাও খেলায় যোগ দেয়: 'ওটা আমার দিউকা'।

হঠাৎ কিরিউশা ভয় পেয়ে যায়: 'যাঃ, আমার কীকা হারিয়ে গেছে।'

নিজের সম্পর্কে শিশুর চেতনা গল্পের নায়কদের (ইতিবাচক নায়ক) সঙ্গে তার নিজের অনুষঙ্গের মধ্য দিয়েও গড়ে ওঠে। শিশু যখন একজন লোককথার নায়কের ভূমিকায় অথবা সুদর্শন ও চতুর প্রিন্স ইভানের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে সুখী। শিশুর সঙ্গে সাহচর্যের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সর্বদাই তাকে সঠিক ও প্রয়োজনীয় ক্রিয়াগুলির দিকে চালিত করে এবং তার কাছে যা দাবি করা হয় সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করতে ও পূরণ করতে তাকে উৎসাহ যোগায়। শিশু যা কিছুই করে তাই 'ভালো' আর 'মন্দ' ভাগ করার মতো হয়ে ওঠে। এর কারণ বহুবিধ, এবং শিশু কী করছে সে বিষয়ে প্রাপ্তবয়স্কের ভাবাবেগগত-অনুভূতিগত মনোভাবের রূপে তা প্রকাশ পায়।

১·৯। কিরিউশা জুতো-পরা-পুসিকে জড়িয়ে ধরে। খেলনাটির উপর হাত বুলায়। আমি তার প্রশংসা করি: 'ভালো ছেলে, সুন্দর খেলছ।' কিরিউশা সোৎসাহে খেলনা-টির উপর হাত বুলায় এবং সেটির গায়ে নিজের গাল ঘষে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের অনুমোদন লাভের বাসনা একটা জরুরী চাহিদা হয়ে ওঠে; তাই সে যতখানি সাধ্য তার জন্য চেষ্টা করে।

২·১। হাই তোলা, হাঁচা বা কাশার সময়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে শেখাচ্ছি আমরা শিশুদুটিকে। তারা যখন সেটা করছে তখন তাদের প্রচুর প্রশংসা করেছি (কী ভালো ছেলে!)

আজ মেট্রোতে তাদের আচরণ সম্পর্কে আমি খুবই

সচেতন ছিলাম। কিরিউশা হাই তুলল, এবং মুখের উপরে হাত চাপা দিল। আমার দিকে তাকাল সে। (আমি ওর বিপরীত দিকে বসে ছিলাম)। আমি হাসলাম এবং মাথা নেড়ে অনুমোদন জানালাম।

তারপরেই কান্ডটা শুরু হল: দুজনেই বারবার হাই তুলতে আর মুখে হাত চাপা দিতে শুরু করল। তারা চারপাশের লোকেদের দিকেও দেখছিল, আবার আমার দিকেও তাকাচ্ছিল। প্রাপ্তবয়স্করা অনুমোদনের হাসি হাসলেন। শিশুদুটিকে থামাবার চেষ্টা করলাম আমি: 'ইচ্ছে করে হাই তুলো না কক্ষনো!' যমজ ভাইদুটি হাসতে হাসতে দ্বিগুণ উৎসাহে হাই তুলতে শুরু করল আর মুখে হাত চাপা দিতে লাগল।

ভালো হওয়ার এই সরল বাসনাটা থাকে। কিন্তু এটা যখন দেখা দেয় ঠিক সেই মুহূর্তেই চারপাশের প্রাপ্তবয়স্করা যে কাজ অনুমোদন করে তা করতে শিক্ষা লাভ করার সক্রিয় চেষ্টার বিকাশ শুরু হয়। তার মধ্যে শিশু একটা ইতিবাচক আত্ম-মূল্যায়ন লাভ করে: 'আমি ভালো ছেলে!' আমার যমজ ছেলেদুটি, ছোট থাকাকালে সমস্ত শিশুর মতোই জোর দিয়ে বলে যে তারা ভালো। শিশুর প্রারম্ভিক আত্ম-মূল্যায়নে নিহিত থাকে ভাবাবেগগত স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা। যে সব জিনিসের জন্য সে ভর্ৎসিত হবে সেই সবকিছুকেই দূর করতে, তার 'ভালো' আমি থেকে সেটাকে বাদ দিতে সে প্রয়াস পায়।

আমার যমজ ছেলেদুটি খুব তাড়াতাড়িই এই

ঘটনাটাকে কাজে লাগাতে শিখেছিল যে তাদের দুজনেরই সামনে এমন একজন আছে (এই ক্ষেত্রে একজন ভাই) যার উপরে সে এমন সবকিছুরই দায় চাপিয়ে দিতে পারে, যে সব কাজ 'ভালো' অভিধালাভের যোগ্য নয়।

১·৯। শিশুদুটি আজ লক্ষ করল যে হাতল-ওলা আরামকেদারাটা যথাস্থানে নেই। এর সঙ্গে ওদের কোনোই সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তবুও কিরিউশা তার ভাইয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল: 'দিউকা।' আন্দ্রিউশাও উপযুক্ত জবাব দিল: 'কীকা।'

উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কঠিন গলায় শিশুদুটিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: 'ছেলেরা! চেয়ারটা কে উল্টে ফেলেছে?'

নজরের মধ্যে কোনো উল্টানো চেয়ার না থাকলেও দুজনেই চটপট পরস্পরকে দেখাল আঙুল দিয়ে: 'কীকা!', 'দিউকা!'

আমি জিজ্ঞাসা করি: 'খেলনাটা কে ভেঙেছে?' যমজ ভাইদুটি চেঁচায়: 'কীকা!', 'দিউকা!'

এই মুহূর্তটা থেকেই শুরু হল কোনো প্রকৃত বা কল্পিত অপরাধের দায় নির্লজ্জভাবে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের উপরে চাপানোর একটা দীর্ঘ কালপর্ব। শিশু যখন নিজের দুষ্টুমির দায়টা আরেকজনের উপরে চাপায়, তখন সে একজন প্রাপ্তবয়স্কের ভর্ৎসনা থেকে নিজের সুনামটা রক্ষা করে অচেতনভাবে।

২·৬। আন্দ্রিউশা দুষ্টুমি শুরু করেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল: 'ছোট্ট খোকা, তোমার নাম কী?' সে চাতুরি করে জবাব দেয়: 'আমি কীকা।' কিরিউশা কাঁদতে শুরু করে:

'না, তুমি দিউকা, আমি কীকা।' আন্দ্রিউশা: 'আমি কীকা!'

প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে বিদ্রূপ, অপছন্দ বা নিন্দা শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়। উদাসীনতার রূপে যে বিচ্ছিন্নতার ভাব প্রকাশ হয়, তাতেও তারা সমানভাবে আহত বোধ করে। খুব ছোট থাকাকালেই, কিরিউশা তাদের সম্পর্কে নিরুত্তাপ মনোভাববিশিষ্ট কোনো প্রাপ্ত-বয়স্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার একটা কায়দা বার করেছিল।

১·১১। কিরিউশা আজ নিজের বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছে। ছেলেদুটি যাঁকে চেনে না এমন এক মহিলা তাদের ঘরের ভিতরে গিয়ে তাদের খেলনাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তারা তাদের সম্পদ উজাড় করে ঢেলে দেয় আগন্তুক মহিলার পায়ের কাছে: আন্দ্রিউশা— একটি ছোট গাড়ি (তার প্রিয় খেলনা), কিরিউশা — ছোট একটা ডোরা-কাটা রুমাল, যেটি নিয়ে সে বেশ আগ্রহের সঙ্গে কয়েকদিন ধরে খেলছিল। ওরা মহিলাকে কী দেখাচ্ছিল সে দিকে তিনি কোনো মনোযোগ দিলেন না এবং শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গত আমার উদ্দেশে মন্তব্য করলেন: 'ওরা ভালো করে কথা বলতে পারে না তো।' এই মুহূর্তে কিরিউশা উঠে দাঁড়াল এবং তাঁর দিকে সমনোযোগে তাকিয়ে থাকল। তাঁর মন্তব্যের পর সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হলে যেমনটা সে সব সময়েই করত, তারপরে

একপাশে সরে গেল। মহিলা তাঁর নিজের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন...

তিন মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে কিরিউশা আগন্তুক মহিলার কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে দরজার কাছে টেনে নিয়ে গেল। তিনি ওর পিছনে পিছনে গেলেন। দরজার সামনে এসে কিরিউশা থামল, চোখদুটি তুলে তাকাল মহিলার দিকে, তারপর বলল: 'বাই' (বিদায়!)।

শিশুর ইতিবাচক মূল্যায়নের চাহিদার ফলে গড়ে ওঠে আত্ম-মর্যাদাবোধ যা অপরের সঙ্গে তার পরবর্তী আচরণকে পরিচালিত করে।

শিশুর আচরণ বিশ্লেষণ করে আমরা অতি শৈশবে **আমি**-রূপকল্প গঠনের ছবিটি খাড়া করতে সমর্থ হই। নিজের বাহ্যিক শারীরিক চেহারা সম্পর্কে উপলব্ধি এবং এই চেহারার ভাবাবেগগত স্বীকৃতির ফলে শিশু নিজের এই চেহারার নাম দেওয়ার জন্য নিজের নাম ও **আমি** সর্বনামটি সচেতনভাবে ব্যবহার করে। এই **আমি** দিয়েই শিশু নিজেকে প্রদান করে এক ইতিবাচক আত্ম-মূল্যায়ন, তাকে সে রক্ষা করতে চেষ্টা করে তার চারপাশের লোকেদের চোখে। প্রারম্ভিক ইতিবাচক আত্ম-মূল্যায়ন নিহিত থাকে ব্যক্তিত্বের কাঠামোর মধ্যে এবং এইভাবে তাকে যথেষ্ট স্থিতিশীলতা যোগায় তার চারপাশের লোকজনের তরফ থেকে বাহ্যিক, পরিবর্তনীয় ও বড় মাত্রায় পরিস্থিতিগত মূল্যায়নের ব্যাপারে।

শিশুর আত্ম-সচেতনতা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে তার ব্যক্তিগত **আমি** সম্বন্ধে উপলব্ধির ক্ষেত্রেও

বিকশিত হয়। অতি শৈশবেই দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিশক্তি দেখা দেয় এবং স্মৃতি-ধৃত রূপকল্পগুলি শিশুর বিশেষ ভাবাবেগের বস্তু হয়ে ওঠে।

২·৭। শিশুরা নিজেদের জন্য একটা চিত্তাকর্ষক নতুন কাজ খুঁজে বার করেছে — অতীতকে স্মরণ করা। গ্রামের গ্রীষ্মকালীন কুটির থেকে ফিরে আসার পর থেকে তারা দুজনেই ঘনঘন বলছে 'আমার মনে আছে'। তাদের স্মৃতিগুলি একই। 'আমার মনে পড়ছে বিদ্যুৎ চমকাবার কথা। আর সবাই ভয় পেয়েছিল।' 'আমার মনে আছে আমরা জঙ্গলে গিয়েছিলাম। আমি অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। আমি যেতে চেয়েছিলাম সেখানে।' 'আমার মনে পড়ছে গ্রামে কাদাভর্তি গর্তগুলোর কথা।' 'ব্যাঙের ছাতাগুলোর কথাও আমার মনে আছে।'

২·৯। আন্দ্রিউশা বারবার ফিরে আসছে গ্রীষ্মকালের কথায় (তার পর পাঁচ মাস কেটে গেছে)। 'আমি ছোট্ট ছিলাম, বলতাম 'নমো, নমো'। বলতে হত: নমস্কার। আমি তখন দুষ্টু ছিলাম।'

শিশুরা বস্তু ও প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলি তথা অন্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিশিষ্ট দিকগুলিও মনে রাখে। ব্যক্তিগত স্মৃতিগুলি উন্মুক্ত করে এমন এক অতীতকে যেখানে শিশুর নিজেকেও মনে পড়ে।

৩·১। কিরিউশা আর আন্দ্রিউশা আমাকে জ্বালাতন করছে: 'আমরা যখন ছোট্ট ছিলাম তখনকার কথা আমাদের বলো।'

শিশুরা তাদের অতীতের দুষ্টুমিগুলিকে গণ্য করে

সানন্দ কোমল স্নেহের সঙ্গে — আর যাই হোক, তখন তো তারা ছোট ছিল।

এই সময়েই দেখা দেয় ভবিষ্যতের দিকে চালিত মনোযোগ। শিশু নিজেকে ভবিষ্যতে এমন একজন হিসেবে দেখে যে সবকিছু জানে, যে হবে বলশালী, সাহসী, আর অবশ্যই, ভালো। এ কথা সত্যি যে ভবিষ্যতের জন্য প্রথম পরিকল্পনাগুলির মধ্যেই থাকে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত সব গুণ আর ক্ষমতা, শিশু যেগুলির অধিকারী হতে চায় এখনই।

৩·২। আন্দ্রিউশা: 'আমি যখন অনেক বড় হব, আমার দাঁত আমি নিজেই মাজব! তোমার জন্য একটা কেক এনে দেব। আমি বড় বড় বই লিখব আর পড়ব।'

৩·৩। কিরিউশা: 'মা, আমি দেখবে পাইন গাছের মতো অ্যা-ত্তো বড় হব। আমার গায়ের জোর হবে ভাল্লুকের মতো। সবাইকে আমি নিরাপদ রাখব!'

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে তার ব্যক্তিগত **আমি-র** বোধটা একই সময়ে একমাত্র সেই মাত্রাটিও বটে, যেখানে ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে (বিকাশলাভ করে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়, সন্দেহ করে)। প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে একত্রে শিশু তার ব্যক্তিগত **আমি-কে** পরস্পর সম্পর্কিত করতে শুরু করে অতীতে (আমি ছো-ও-ট্ট ছিলাম... মজার... কিছু বুঝতে পারতাম না... কিন্তু খু-ব ভালো ছিলাম), বর্তমানে (আমি ভালো ছেলে, আন্দ্রিউশা), ও ভবিষ্যতে (আমি হব আরও ভালো... আরও জোর হবে গায়ে... আরও জ্ঞানবুদ্ধি হবে... অনেক কিছু করতে পারব)।

আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি হব — জীবনের ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের শর্ত। শিশুকে তার আজকের আচরণ আর ভবিষ্যতের আচরণ পরস্পরসম্পর্কিত করতে শেখানোটা বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সামাজিক নির্দেশ। নিজেকে কালের সঙ্গে অভিমুখী করাটা নিজের সম্পর্কে সচেতনতার মূলকেন্দ্র।

স্বাধীন হওয়ার বিবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা

শিশুর নিজেকে অপরের কাছ থেকে পৃথক করা এবং নিজের প্রসার্যমাণ সামর্থ্যগুলি সম্পর্কে উপলব্ধির ফলে প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি এক নতুন মনোভাব দেখা দেয়। সে নিজেকে তুলনা করতে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে এবং তাদের মতো হতে চায়, একই জিনিস করতে চায়, এবং একই রকম স্বাধীনতা ও স্বয়ংভরতা ভোগ করতে চায়। শিশুরা যদিও ভবিষ্যতের কথা বলে, তবুও তাতে আদৌ এ কথা বোঝায় না যে তারা সত্যিই বড় হওয়া অবধি অপেক্ষা করে থাকতে প্রস্তুত। বস্তুত, শিশুরা বড় হয়ে যেতে চায় এখন-এখনই। এ থেকেই স্বাধীন হওয়ার প্রেরণাটা সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। 'আমি নিজে!' এই ঘোষণাকে প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণত স্বাগত জানায়। স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্রমবর্ধমান চাহিদাটা এত প্রবল যে রীতিমত জোরালো অন্য অনেক চাহিদাকেই তা অধীনস্থ করতে সক্ষম।

শুধু 'আমি নিজে!' শব্দটির যদি সবসময়ে একটা

জাদুকরী ফল ফলত, তাহলে শিশুদের লালনপালন করার সমস্যাগুলি নিশ্চয়ই অনেক কমে যেত। 'আমি নিজে!' হল নিজের আকাঙ্ক্ষার দাবি। 'আমি নিজে!' একটা ভালো প্রবণতা। যে শিশু বলেছে সে নিজে একটা কিছু করবে সে অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে ভিন্নভাবে আচরণ করতে বাধ্য। তাকে নিজের যোগ্যতা অবশ্যই প্রতিপন্ন করতে হবে, অন্যের চোখে খাটো হলে চলবে না।

২·২। আন্দ্রিউশা রীতিমত বেয়াড়া ছেলে। শিশুদুটি আমি যখন এমন কোনো কাজ করতে বলি যেটা প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে বিশেষভাবে কোনো সেবা নয়, সে কাজ তারা দুজনেই করে ইচ্ছুকভাবে, কিন্তু যখন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিজেদেরই খেলনাগুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখার মতো কোনো কাজের কথা বলা হয়, তখন সে নানা কায়দায় সময় কাটিয়ে দেয়। কিরিউশাকে যা করতে বলা হয়, একাগ্রভাবে তা করে, খেলনাগুলিকে গুছিয়ে রাখে। সবকিছু যথাস্থানে রাখার পর কিরিউশার যখন প্রশংসা করা হয়, তখন তার ভাই তার জায়গা থেকে লাফিয়ে আসে: 'আমি! আমি নিজে এটা করব!' বলে ক্ষুদে গুন্ডাটা চেঁচাতে থাকে রাগতভাবে।

আজ, কিরিউশা যখন সমস্ত ব্লকগুলো তুলে নিয়ে বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছে, দিউকা সক্রোধে সেগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল, তারপর নিজেই আবার তুলে রাখতে শুরু করল। কিন্তু, অতগুলো ব্লক গুছিয়ে তোলার মতো যথেষ্ট ধৈর্য তার ছিল না। সে রেগে

পুরো কাজটা ফেলে রেখে চলে যেতে উপক্রম করছিল। কিন্তু আমি তাকে সেটা করতে দিলাম না: 'তুমি ছুঁড়ে বাইরে ফেলেছ তুমিই তুলে রাখো!' রাগতভাবে, কান্নায় প্রায় ফেটে পড়ার অবস্থায়, সে ব্লকগুলো ছুঁড়ে দিতে লাগল বাক্সের মধ্যে। কিরিউশা ছুটে এল তাকে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু আমি করতে দিলাম না। বুঝিয়ে বললাম কেন সাহায্য করার দরকার নেই।

নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার বাসনার সঙ্গে সংঘাত বাধে ইচ্ছাগত বিকাশের স্বল্পতার সঙ্গে, নিজেকে সংগঠিত করা আর অভিপ্রায়টিকে বাস্তবায়িত করার অপারগতার সঙ্গে। অপরের চোখে ও নিজের চোখে ছোট হয়ে যাওয়ার ফলে দেখা দেয় গোঁয়ার্তুমি আর যা করতে বলা হয় তার বিপরীত করার স্বভাব।

৩·০। আন্দ্রিউশা একগুঁয়ে হয়ে উঠেছে। ওদের আমি খাওয়ার জন্য টেবিলে ডাকি। ও দাঁড়িয়ে থাকে একটিও পেশী না নাড়িয়ে, যেন ও শুনতে পায় না। ওর হাত ধরে বলি: 'চলে এসো!' আন্দ্রিউশা: 'হাত ধরে নিয়ে যেও না! আমি এখন নিজে-নিজে আসছি।' আমার হাত থেকে সে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানে ফিরে যায়, তারপর নিজেই হেঁটে রান্নাঘরে ঢোকে।

শিশুদের পিছনে প্রাপ্তবয়স্করা বেশি ব্যতিব্যস্ততা দেখালে শিশুরা শুধু যে তার প্রতিবাদ করে তাই নয়; প্রায়শই তারা নিষিদ্ধ কাজগুলিও করে থাকে বিশেষ করে তাদের স্বাধীনতা প্রদর্শন করার জন্য।

একগুঁয়েমি আর যা করতে বলা হয় তার বিপরীত

কাজ করাটা মুখ্যত সেইসব প্রাপ্তবয়স্কের দিকেই চালিত যারা শিশুকে নিয়ে সব সময়েই ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং তাকে আগলে রাখে। আচরণের নেতিবাচক রূপটি অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কের বিরুদ্ধে চালিত হয় কদাচিৎ এবং সমবয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে কখনই না।

নিজেদের সামর্থ্য সম্পর্কে শিশুদের মূল্যায়নের সঙ্গে সাধারণত বাস্তবিক সেই সব সামর্থ্যের মিল থাকে না। শিশুদের স্বীকৃতির দাবি অস্বাভাবিক উচ্চ। একজন প্রাপ্তবয়স্কের মতো হতে চেষ্টা করা ও হওয়ার জন্য শিশু শুধু যে নিজে সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে চায় বা টেবিলের কাছে এসে বসতে চায় তাই নয়, কেনাকাটা করা, রান্না করা, গাড়ি চালানো প্রভৃতিও করতে চায়। স্বভাবতই এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কোনো পিতামাতাই পূরণ করতে পারে না।

আর তাই তিন বছর বয়স্ক শিশুদের সংকট দেখা দেয়। এই সময়টায় প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে শিশুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা দুষ্কর হয়ে ওঠে, তার একগুঁয়েমি আর যা তার করতে বারণ সেই কাজটাই করার স্বভাবের সঙ্গে সংঘাত বাধে।

শিশু যখন ঠিকভাবে লালিত হয়, প্রাপ্তবয়স্করা যখন যথাসময়ে তার ক্রমবর্ধমান সামর্থ্যগুলি লক্ষ করে এবং কাজকর্ম আর প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন নতুন রূপের চাহিদা তারা পূরণ করে, তখন যে কালপর্বটায় শিশুকে লালন করা কঠিন, সেটা অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং ততটা কষ্টকর থাকে না।

শিশুর তিন বছর বয়সে সংকট একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। কিন্তু তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন ঘটনাবিকাশগুলি, অপরের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করা এবং অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা মনোগত বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, পরবর্তীকালে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের পূর্বশর্তগুলি তা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রাক-স্কুল শৈশবে শিশুর বিকাশের মনোগত বিশেষত্ব

অধ্যায় ৫। শিশু — প্রাপ্তবয়স্ক

মানুষ হয়ে ওঠার যে পূর্বশর্তগুলি অতি শৈশবে গড়ে ওঠে সেগুলি তার চারপাশের লোকজনের পক্ষে শিশুকে নতুন নতুনভাবে প্রভাবিত করার একটা ভিত্তি সৃষ্টি করে। শিশু বিকাশলাভ করতে-করতে অর্জন করে নতুন নতুন মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের ধরন, যেগুলি তাকে সমাজের একজন সদস্য হতে সক্ষম করে তোলে।

প্রাক্-স্কুল বয়সে গঠিত হয় তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল সেই আন্তর জগৎ, যা শিশুকে একজন ব্যক্তি বলে অভিহিত করার বনিয়াদ যোগায়, সেই ব্যক্তি অবশ্য তখনও পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত নয়, তাহলেও আরও বিকশিত ও উন্নত হতে সক্ষম।

চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে শেখার ক্রমবর্ধমান সামর্থ্য শিশুর কৌতূহলকে তার কাছের লোকজনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে নিয়ে আসে, বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মের (পড়াশোনা, কাজ) ভিতরে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কগুলির প্রাথমিক আত্তীকরণ তা সম্ভব করে তোলে। শিশু অন্য শিশুদের সঙ্গে কাজকর্মে যোগ দেয়, তাদের সঙ্গে নিজের কাজের সমন্বয় ঘটাতে এবং তাদের অভিমত ও আগ্রহকে

গণ্য করতে শেখে। গোটা প্রাক্-স্কুল শৈশবকাল জুড়ে শিশুর কাজকর্ম বদলায় ও আরও বেশি জটিল হয়ে ওঠে, এবং সেটা শুধু যে উপলব্ধিশক্তি, চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও অন্যান্য মনোগত প্রক্রিয়ার উপরেই বিরাট দাবি করে তাই নয়, নিজের আচরণকে সুবিন্যস্ত করার সামর্থ্যের উপরেও চাপ দেয়।

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের দুটি দিক আছে। প্রথম, সে ক্রমে ক্রমে তার চারপাশের পৃথিবীকে বুঝতে শেখে, উপলব্ধি করতে শেখে সেই পৃথিবীতে তার নিজের জায়গা — তা জন্ম দেয় আচরণের নতুন নতুন চালকশক্তির, যেগুলির প্রভাবে সে কোনো না কোনো জিনিস করে। দ্বিতীয়, অনুভূতি আর ইচ্ছাশক্তির বিকাশ, যা এই চালকশক্তিগুলির ফলপ্রদতা, আচরণের স্থিতিশীলতা এবং বাহ্যিক পরিবর্তন থেকে তার স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করে।

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে প্রথমত ও প্রধানত একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের অবস্থায়, আগেকার বয়সের অবস্থা থেকে যা আলাদা। প্রথমত, শিশুর আচরণের কাছে যা দাবি করা হয় সেই দাবিগুলি বেড়ে যায় অনেকখানি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয়ে দাঁড়ায় মানুষ যে সমস্ত আচার-প্রথার দ্বারা সমাজে বসবাস করে সেগুলি আত্তীকরণ। শিশুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোকেদের মধ্যে আচরণ আর সম্পর্ক মডেল হিসেবে কাজ করে। সন্দেহ নেই, প্রত্যেক শিশুই তার নিকটতম লোকদের ভালোবাসে এবং তাদের কাছে কাজের ও প্রিয় হয়ে উঠতে চায়।

আমার যমজ ছেলেদুটি আমার খুবই অনুরক্ত। তারা চেষ্টা করে আমার কাছে ঘেঁষে এসে জড়িয়ে ধরতে, চুমু খেতে। আদর আর ভালোবাসার তীব্র চাহিদা তারা অনুভব করে, এবং আমি যখন তাদের সঙ্গে খেলি এবং যতরকমভাবে পারি আমার ভালোবাসা প্রকাশ করি তখন তারা সম্পূর্ণরূপে সুখী বোধ করে। আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার টান আমাদের সুখী আর বদান্য করে তোলে। আমরা তিনজন পরস্পরকে স্নেহের উপহার আর সুখপ্রদ চমক দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিরিউশার দারুণ উদ্ভাবনী ক্ষমতা। সে প্রায়ই আমাকে এমন সব উপহার দেয়, তার চিন্তায় যেগুলি আমাকে প্রীত করতে বাধ্য। আর আমি সত্যিই ছোট গাছের ডাল, ফুল, রঙিন কাগজ আর তার বানানো গল্পগুলিতে প্রীতিবোধ করি।

৩·০। 'কোনো এক সময়ে একটা সুন্দর পাখি ছিল। তার ছিল সুন্দর ছোট ছোট পালক। সে একটা গরম দেশ থেকে তোমার কাছে উড়ে এল। আর এখন সে তোমাকে একটা গান গেয়ে শোনাচ্ছে।'

'ভারী চমৎকার গল্প। তারপর কী হল?'

'তারপর সে একটা বাসা বানাবে আর তার ছোট্ট ছানাগুলিকে তা' দেবে। সুন্দর গল্প না? এটা তোমার জন্য উপহার।'

মা হল প্রাক্-স্কুল শিশুর জগতের কেন্দ্রবিন্দু। মায়ের কাছে থাকা, তার জন্য ও তার সঙ্গে কাজকর্ম করা সে উপভোগ করে। অবশ্য, শিশুর আচরণকে বাড়িয়ে দেখা উচিত হবে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে সচেতন চাহিদা

থেকে করার চেয়ে বরং ভালো আর মন্দ কাজের খেলা খেলছে।

৩·৬। আলমারিতে আমার মাথা সামান্য একটু ঠুকে গেল।

কিরিউশা: 'দাঁড়াও, ওখানে ভালো করে চুমু খাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

আন্দ্রিউশা আমার কাছে এসে ইচ্ছা করে আমাকে ঠেলল।

'এখন আমিও তোমাকে চুমু খাব। আমি তোমাকে ভালোবাসি। এখন ব্যথা লাগছে না?'

এই পরিস্থিতিতে আন্দ্রিউশা স্পষ্টতই বাহ্যিক দিকটিতে আগ্রহী: আমাকে সে দেখাতে চায় যে সে ভালো ছেলে। অন্য সব কিছুই একটা সফল প্রদর্শনের অবস্থা যোগাল।

নিজের ঘনিষ্ঠ একজন প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি ভালোবাসা এবং ভালো হওয়ার বাসনা শিশুর আচরণকে পুরোপুরি নির্ধারিত করে না। একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারে, এবং এই ক্ষেত্রে সে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ জানাবে, অথবা ক্ষেপে গিয়ে রাগতভাবে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াবে। কোনো শিশু প্রাপ্তবয়স্ককে শারীরিকভাবে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু যথোপযুক্ত লালনপালন হলে (দৈনন্দিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলাখুলি, সহজ ও অকপট হওয়া আর বিশেষ খারাপ আচরণ করলে শিশুর প্রতি কঠোরতা দেখানো), শিশু একজন প্রাপ্তবয়স্কের গায়ে শুধু যে হাত তুলবে না তাই

নয়, নিজের কোনো আক্রমণাত্মক অঙ্গভঙ্গিও ঘটতে দেবে না।

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী হার্টলি, ডডসন* প্রমুখেরা মনে করেন যে, শিশু যে সমস্ত ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখায়, সেখানে এই আক্রমণ স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তাকে একটা বিশেষ পুতুল প্রহার করার জন্য দিলে সেটা খুব কাজের হতে পারে। পরিবারের সদস্যসংখ্যার সঙ্গে এই মার-খাওয়া পুতুলগুলোর সংখ্যার মিল থাকা চাই। প্রতিটি পুতুল শিশুর বাবা, মা আর ভাইবোনদের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রস্তাবটা এই যে সমাজ-বিরোধী আবেগ আর নেতিবাচক ভাবাবেগগুলিকে অন্য খাতে বইয়ে দেওয়ার জন্য এই পুতুলগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমরা মনে করি শিশুকে তার আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করে দিলে তা অনুরূপ কাজে তাকে উৎসাহ যোগায়। সম্ভাব্য আচরণের দিকে যে কোনোরূপ মনঃসংযোগ নিঃসন্দেহে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে যায়, এবং তা একজন প্রকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চালিত সাময়িক হিংসাত্মক ক্রিয়ার মধ্যে একটা নির্গমন পথ পেয়ে পারে। শিশুর এরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সংযত করা দরকার।

মৌখিক বর্ণনায় প্রকাশিত শিশুর ভাবাবেগগত মনোভাব

---

* Hartley R., Coldenson R. The Complete Book of Children's Play.—New York: Thomas Crowell Co., 1957. Dodson F. How to Parent.—New York, 1971.

অন্য ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে আপনার প্রতি উদ্দিষ্ট অপমানকর কথাগুলির দিকে মনোযোগ না দেওয়ার ভান করতে পারেন। শিশুকে দেখাতে পারেন যে আপনি খুবই আহত ও বিচলিত বোধ করছেন। শেষ পর্যন্ত, আপনাকে হয়তো একটা মীমাংসা করতে হতে পারে। শিশুকে প্রভাবিত করার অনেক উপায় আছে।

৩·১। দুষ্টুমি করার জন্য আন্দ্রিউশাকে আমি শাস্তি দিয়েছি।

কিরিউশা: 'দিদা, ও আমার আন্দ্রিউশাকে শাস্তি দিল কেন? ও খারাপ।'

'ও কে?'

'ওই ও!' আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে। সে এমন কি মা বলতেও চায় না।

৩·২। আন্দ্রিউশা তার বাবার কাছে কিছু একটা চেয়েছিল, তিনি সেটা দিতে রাজী হন নি বলে আন্দ্রিউশা তার বাবার উপরে রাগ করেছে।

'আমি... আমি (সে জানে না তার বিরক্তি কীভাবে প্রকাশ করবে)... আমি তোমাকে তোমার উপর হাঁচব, কাশব, হাই তুলব!'

প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার জন্য তার মরিয়া প্রদর্শনমূলক ইচ্ছা। থাকলেও, তার ভাবাবেগগত আশ্রয় অবশ্যই দরকার। শিশুর দরকার হয় আমাদের, তাকে যথেষ্ট ভালোবাসা, যত্ন আর সহানুভূতি না দিলে সে কষ্ট পায়।

প্রাপ্তবয়স্কের উপরে প্রাক্-স্কুল শিশুর ভাবাবেগগত নির্ভরশীলতা অতি শৈশবে যেমন ছিল তেমনিভাবেই বজায় থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক হল শিশুর সক্রিয়তার নিয়ত অনুঘটক। আমরা দুরকম মনোভাবের বৈপরীত্য দেখাবার এক বিশেষ পরীক্ষামূলক পদ্ধতি বার করলাম। সারগতভাবে তা ছিল এই যে, নিয়ন্ত্রণকারক পরিস্থিতিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভাবাবেগগত মনোভাবের দুটি মডেল শিশুর সামনে প্রদর্শন করে: ইতিবাচক ও নেতিবাচক। প্রথম ক্ষেত্রে, সাফল্য ও ব্যর্থতা দুয়ের জন্যই শিশুর প্রতি একটা সহানুভূতিসূচক ভাব দেখাল প্রাপ্তবয়স্ক, সর্বপ্রকারে শিশুর প্রতি সদয় মনোভাব প্রকাশ করল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, প্রাপ্তবয়স্ক স্পষ্টতই দেখাল পছন্দ না-করার মনোভাব: অনুকৃতি, কণ্ঠস্বর ও মূকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করল (কঠোর দৃষ্টিতে সোজাসুজি তাকানো, কড়া সুর ইত্যাদি)। উভয় মডেলই সমনোযোগে বিশদ করা হয়েছিল দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে শিশুদের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের মনোভাব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে, তথা অঙ্গভঙ্গিমূলক কতকগুলি আচরণবিদ্যাগত দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে: 'সংস্পর্শ ও খেলার জন্য প্রস্তুতি', 'আক্রমণ', 'আধিপত্য' ইত্যাদি।

পরীক্ষাটা ছিল এই রকম: একটা নির্দিষ্ট সময়ে (৫ মিনিট) একটি মডেলের ভিত্তিতে শিশুকে জোড়া দিয়ে দিয়ে কোনো এক ধরনের কাঠামো খাড়া করতে হবে। বস্তুতপক্ষে, শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক কেউই কাজটা করতে পারত না, যাদের পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের জন্য একই রকম অবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। এই পটভূমিতে পরীক্ষক

শিশুর কাছে প্রদর্শন করেছিল বিশেষ ভাবাবেগগত মনোভাব — ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে প্রাপ্তবয়স্কের বিচ্ছিন্নতা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিশুদের সামাজিক সক্রিয়তার মাত্রা অনেকখানি কমিয়ে আনে: শিশু নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়, অস্বচ্ছন্দ ও অনিশ্চিত বোধ করে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শিশু প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করে এবং তার চারপাশের লোকজনের সঙ্গে সহজেই সংস্পর্শ ঘটায়।

একজন প্রাপ্তবয়স্কের দিক থেকে আচরণের নেতিবাচক ও ইতিবাচক মডেলের প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা করে শিশুর আচরণে আমূল পার্থক্য দেখা গেছে।

নেতিবাচক মডেল দ্বারা প্রভাবিত পরিস্থিতিতে চার থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে এই পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ শিশুই যে কাজ আরম্ভ করেছিল তা বন্ধ করে দেয়। তদুপরি, শিশুদের বয়স যত কম হয়, ততই তারা বেশি নির্ভর করে প্রাপ্ত-বয়স্কের প্রত্যক্ষ প্রভাবের উপরে। পরীক্ষা চলাকালে নথীবদ্ধ পর্যবেক্ষণগুলি দেখা যাক।

লুদা আ. (৪·৬)। নির্দেশ পাওয়ার পরেই সে শান্তভাবে কাঠামোটা খাড়া করতে শুরু করে মডেল অনুযায়ী। তার অঙ্গ-সঞ্চালন ছিল যথাযথ, প্রয়োজনীয় অংশগুলি সে সমনোযোগে খুঁজে বার করছিল।

প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে অসন্তোষের প্রকাশে প্রভাবিত হয়ে সে তার ক্রিয়ার গতি বাড়িয়ে দেয়, তার অঙ্গ-সঞ্চালন

হয়ে ওঠে এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল। ঘনঘন সে থেমে যায়, তারপর সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ করে আগেকার দ্রুততায়। অংশগুলো তার হাত থেকে পড়ে যেতে শুরু করে, এবং চেষ্টায় কোনো ফল হয় না। সে প্রায়ই ঘনঘন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে, এবং পরীক্ষকের চোখে চোখ না রাখার চেষ্টা করে।

আলিওশা ক. (৫·০)। প্রাপ্তবয়স্কের প্রদর্শিত আচরণের নেতিবাচক মডেল ছেলেটির ক্রিয়া মন্থর করে ফেলে। সে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকে, চেষ্টা করে যাতে পরীক্ষকের চোখে চোখ না পড়ে। সে কাজ করা থামিয়ে দেয় তারপর মাথা নিচু করে বসে থাকে।

মারিনা ন. (৬·১০)। কাজ করতে শুরু করেই সে জিনিসগুলি চটপট জোড়া দেয়, তার অঙ্গ-সঞ্চালন ছিল যথাযথ, দরকারি অংশগুলি সে সমনোযোগে খুঁজে বার করে। প্রাপ্তবয়স্কের নেতিবাচক আচরণ লক্ষণীয়ভাবেই তার কাজ মন্থর করে দেয়, এবং শেষে সে পুরোপুরি থেমে যায়। তাকে খুবই বিষণ্ণ দেখাতে থাকে, সে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

প্রাপ্তবয়স্কের প্রদর্শিত নেতিবাচক মনোভাব শিশুর মধ্যে টিপিক্যাল প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে: হয় সে বিচ্ছিন্নতার বেড়া অতিক্রম করে প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করে, না হয় নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। পর্যবেক্ষণগুলির দিকে আবার তাকানো যাক।

ইউলিয়া ত. (৫·৯)। নিয়ন্ত্রণমূলক পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত সে পরীক্ষকের সঙ্গে আদান-প্রদানে প্রচুর সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। প্রাপ্তবয়স্ককে সে একটা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে জড়িত করতে এবং তার কিণ্ডারগার্টেনের ঘটনাগুলি সম্পর্কে তাকে বলতে চেষ্টা করে।

পরীক্ষক আচরণের এক নেতিবাচক ধরন দেখানোর পর মেয়েটির আচরণে সক্রিয়তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সে তার কাছ থেকে দূরে সরে না-যাওয়ার চেষ্টা করে, তার চোখের দিকে তোয়াজ দেখানো দৃষ্টিতে তাকায়, তার হাত চাপড়ে জিজ্ঞাসা করে: 'আবার কবে আপনি আমাদের দেখতে আসছেন?' প্রস্তাব করে: 'কাঠামোটা বয়ে নিয়ে যেতে আপনাকে কি আমি সাহায্য করতে পারি?'

ইগর র. (৬·৬)। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার আগে পর্যন্ত ছেলেটি পরীক্ষকের সঙ্গে আদান-প্রদানে সক্রিয় ছিল। প্রাপ্তবয়স্কের দিকে তাকিয়ে সে খুশির হাসি হাসে, তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করার চেষ্টা করে এবং নিজের সম্পর্কে তাকে কথা বলে। পরীক্ষকের নেতিবাচক প্রভাবের পর, এই বিশেষ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিটির প্রতি ইগরের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। সে সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতে শুরু করে, আলমারির পিছনে লুকোয়, চেষ্টা করে যাতে তার সঙ্গে চোখাচোখি না হয়।

আচরণের এক **ইতিবাচক** মডেলবিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক পরিস্থিতিতে শিশুদের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে সংস্পর্শের অনুকূল অবস্থা শিশুদের উপলব্ধিসূচক

কাজকর্মের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং স্বয়ং প্রাপ্তবয়স্কের প্রতিও এক ইতিবাচক ভাবাবেগগত প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করে।

দিমা র. (৬·৭)। নেতিবাচক মডেলে পরীক্ষায় ছেলেটি কাঠামো নিয়ে কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং স্পষ্টতই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। কিছু না করে, দিমা টেবিলের কাছে বসে থাকে মাথা নিচু করে।

প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রভাব শিশুর কাজকর্মকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উদ্দীপিত করল। সে তৈরি করতে শুরু করল তাড়াতাড়ি ও আস্থাভরে, প্রয়োজনীয় অংশগুলি ঠিকভাবে বেছে নিল এবং কাজের সঙ্গে সঙ্গে কথা চালিয়ে গেল। প্রাপ্তবয়স্কের দিকে তাকিয়ে সে আনন্দে হাসল এবং গান গাইতে শুরু করল। নির্দিষ্ট সময়ের শেষে, পরীক্ষককে সে বলল যে কাঠামোটা তৈরি করার কাজ সে চালিয়ে যেতে চায়।

প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে ইতিবাচক মনোভাব দেখতে পেলে বেশির ভাগ শিশুই পরীক্ষার শেষে কাজটা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এইসব পরীক্ষা দেখায় যে প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতা শিশু সহ্য করতে পারে না, দমে যায়, সে আর সক্রিয় ও আনন্দোৎফুল্ল থাকে না।

শিশু ভালোবাসতে ও ভালোবাসা পেতে চায়। সে যাদের ভালোবাসে, তাদের নকল করতে চায়, তাদের হাবভাব গ্রহণ করতে চায়, জিনিসপত্র, লোকজন আর ঘটনা সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন ধার করতে চায়। কিন্তু,

যারা তার ঘনিষ্ঠ, শুধু তাদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয় নানাভাবে: কর্মরত প্রাপ্তবয়স্কদের লক্ষ করে, গল্প, কবিতা, রূপকথা শুনে। তাদের সঙ্গীদের স্নেহ-ভালোবাসা, সম্মান ও অনুমোদন যারা লাভ করে তাদের আচরণ তার কাছে আদর্শ হিসেবে কাজ করে। তার সঙ্গীদের আচরণও আদর্শ হিসেবে কাজ করতে পারে, যদি তা প্রাপ্তবয়স্কদের অনুমোদন লাভ করে এবং শিশুর গোষ্ঠীটির মধ্যে প্রিয় হয়। সবশেষে, সাহিত্যের চরিত্রগুলি বস্তুতই আচরণের মান আহরণকে প্রভাবিত করে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা আচরণের মডেলগুলির প্রতি অত্যন্ত কৌতূহলী। তারা যখন একটা রূপকথা বা গল্প শোনে, তখন তারা ব্যাখ্যা শুনতে চায়, যেমন কে ভালো আর কে খারাপ; এ ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা তারা সহ্য করে না, এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এমন কি অচেতন পদার্থেরও মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করে। জড়বুদ্ধি ইভান সম্পর্কে অনেকগুলি রুশ গল্প শোনার পর কিরিউশা জিজ্ঞাসা করেছিল: 'মা, বোকারা কি ভালো, না খারাপ?'

শিশু যাদের প্রতি অনুরক্ত, অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, শিশু আর গল্পের চরিত্রগুলি সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন কী, শিশুর পক্ষে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদেরই অভিমতকে তারা সবচেয়ে প্রামাণিক বলে মনে করে।

কে ভালো আর কে খারাপ, এটা যখন শিশুর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন অনুরূপ সব ক্ষেত্রে নিজেকে

সে কেমনভাবে প্রদর্শন করবে সে বিষয়ে তার নিজের ধারণা অনুযায়ী আচরণ করে।

প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের শেখায় আচরণের রীতি, প্রাক্-স্কুল শৈশবে সেগুলি আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে ইতিবাচক ক্রিয়াকর্মে সেগুলি অনুশীলন যোগায়। শিশুদের কাছে দাবি করে এবং তাদের কাজকর্মের মূল্যায়ন করে প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের এই সমস্ত রীতি মেনে নিতে শেখায়। ক্রমে ক্রমে শিশুরা নিজেরাই তাদের চারপাশের লোকজন তাদের কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে সে বিষয়ে নিজেদের ধারণা থেকে শুরু করে নিজেদের আচরণের মূল্যায়ন করে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের প্রথম দিকে (তিন-চার বছর) শিশুরা সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কাজের নিয়ম, নির্ধারিত কর্মনির্ঘণ্ট রক্ষা করার নিয়ম এবং খেলনাগুলি ব্যবহার করার নিয়ম শেখে। তারা নিছক প্রাপ্তবয়স্কদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে না, বরং নিজেরাই একটা নিয়ম আয়ত্ত করতে শেখে।

কিণ্ডারগার্টেনে, শিশুরা প্রায়শই তত্ত্বাবধায়কের কাছে নালিশ জানায়, যে অন্য শিশু আচরণের নিয়ম ভেঙেছে। এর অধিকাংশই নালিশ নয়, বরং একটা নিয়ম প্রতিপাদন করানোর জন্য এবং তা যে সকলের পক্ষে অবশ্যপালনীয় তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ।

শিশুর নিজের প্রতি 'ভালো' হিসেবে ভাবাবেগগত মনোভাব দেখা দেওয়ার পর এবং তার স্ত্রী-পুরুষ বোধের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর পর দেখা দেয় একটা গুরুত্বপূর্ণ

নতুন ও সামাজিকভাবে জরুরী আকাঙ্ক্ষা — তার চারপাশের লোকজনের চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা, স্বীকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। স্বীকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার ইতিবাচক দিকটি হল নৈতিক অনুভূতি কিংবা বিবেক, দৈনন্দিন মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যার সারসংক্ষেপ করা হয় 'উচিত' শব্দটি দিয়ে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অর্জন হিসেবে বাধ্যবাধকতাবোধ একজন বিশেষ ব্যক্তির অর্জন হয়ে ওঠে। ব্যক্তিত্বের নৈতিক গঠন বিবর্ধিত হয় চারপাশের লোকের সঙ্গে বিনিময়ের সময়ে শিশুর অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে, এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলির ভাবাবেগগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

যে সচেতনতা নিয়ে শিশুরা আচরণের নিয়ম পালন করতে শুরু করে, প্রাক্-স্কুল বয়ঃকাল ধরে তার মাত্রা বদলায়। তিন থেকে চার বছর বয়সের শিশুরা নিয়ম পালন করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, এমন কি কখনও কখনও অত্যধিক 'নিয়মশৃঙ্খলা-প্রিয়তা' দেখায়, সামান্যতম বিচ্যুতি বরদাস্ত করে না।

পাঁচ বছর বয়সে, অভ্যাস-বশে নিয়ম পালন করার জায়গায় আসে সেগুলির গুরুত্ব উপলব্ধির ভিত্তিতে সেগুলি সচেতনভাবে পালন করা। এই সময়ে শিশুরা যে শুধু নিজেরাই নিয়মমাফিক চলতে শুরু করে তাই নয়, অন্য শিশুরাও যাতে তেমন করে সে দিকে লক্ষ রাখে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের মধ্যে যে গর্ববোধ ও লজ্জাবোধের বিকাশ প্রাপ্তবয়স্কদের মূল্যায়ন ও প্রত্যাশার

সঙ্গে নিজের আচরণকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করে, তা আচরণের মডেল ও নিয়মগুলি আত্তীকরণের ক্ষেত্রে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু গর্বের অনুভূতি বোধ করতে শুরু করে শুধু এই কারণে নয় যে সে এমন একটা কিছু করেছে প্রাপ্তবয়স্করা যা অনুমোদন করে, বরং তার নিজের ইতিবাচক গুণাবলীর (সাহস, সত্যবাদিতা, অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা) দরুনও বটে। সে যেন মেনে নেওয়া ছকগুলির সঙ্গে নিজের আচরণকে খাপ খাইয়ে নেয় এই কথা বুঝে যে সেগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য তাকে নিজের সম্পর্কে গর্বিত হওয়ার কারণ দেয়।

অতি শৈশবে যে লজ্জাবোধ সাধারণত জাগ্রত হয় কোনো প্রাপ্তবয়স্কের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে, তা প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর মধ্যে দেখা দেয় সেই সমস্ত সময়ে যখন সে নিজেই বোঝে যে সে এমনভাবে আচরণ করেছে যেটা তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয় এবং সে একটা নিয়ম ভেঙেছে। ভীরুতা, স্থূলতা, লোভ, রূঢ়তা প্রভৃতির বহিঃপ্রকাশে শিশু লজ্জিত হয়।

অধ্যায় ৬। শিশু — শিশু

নিজের বয়সের শিশুদের সঙ্গে আদান-প্রদান শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। অন্য শিশুদের প্রতি যে পছন্দ অতি শৈশবে দেখা দিয়েছে, তা এখন একজন ভাই বা বোনের প্রতি অনুরক্তিবোধে পরিণত হয় এবং নিজের বয়ঃগোষ্ঠীর শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কের প্রয়োজনে পরিণত হয়।

একটি শিশু যদি একা খেলতে বাধ্য হয় তা হলে সে একটা কাল্পনিক খেলার সাথী উদ্ভাবন করতে পারে, যে হয় একজন অদৃশ্য শিশু, না হয় একটি অদৃশ্য জীব হবে। আমি একটি ছেলেকে চিনতাম — আলিওশা; সে ছিল স্নেহশীল প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কিন্তু যার সঙ্গে খেলা যায় এমন একজন জীবন্ত সঙ্গী তার ছিল না। এই ছেলেটি জ্যাক নামে একটি কুকুরকে উদ্ভাবন করেছিল, কুকুরটি তার পায়ে-পায়ে তাকে অনুসরণ করত। আলিওশা কুকুরটির দেখাশোনা করত, তাকে বেড়াতে নিয়ে যেত, খাওয়াত। প্রাপ্তবয়স্কদের সে শিখিয়েছিল তার 'কুকুরটির' প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে, তার থাবা মাড়িয়ে না-দিতে, এবং তাকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যেতে ও ফিরে আসতে

দিতে। জ্যাক ছেলেটির সঙ্গে 'বাস' করেছিল প্রায় দুই বছর ধরে, অবশেষে পাঁচ বছর বয়সে আলিওশা পেল একজন সত্যিকার বন্ধু, তার নিজের বয়সী একটি হাসিখুশি ছোট ছেলে।

আমার শিশুসন্তান দুটির কথা বলতে গেলে, প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী পরস্পরের প্রতি অনুরক্তির এক জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। একজন চেষ্টা করত তার ভাইয়ের উপরে নজর রাখতে ও তাকে রক্ষা করতে, ভাইটি এই দৃঢ় অনুরক্তির সুযোগ গ্রহণ করত এবং তার ভাইকে চরম মাত্রায় শোষণ করত, এই কাজে হয়ে উঠত অনেক বিচার-বিবেচনাহীন প্রাপ্তবয়স্কের মতো।

৩·১। কিরিউশাকে দুটি ব্যাজ উপহার দেওয়া হল। আন্দ্রিউশা তাকে জ্বালাতন করতে লাগল: 'আমাকে দাও! দুটোই আমাকে দাও!'

কিরিউশা এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর হাতের চেটোর উপরে ব্যাজ দুটো রেখে হাত বাড়িয়ে দিল: 'এই নাও, আন্দ্রিউশা।'

আন্দ্রিউশা দুটো ব্যাজই নিল, ঘুরে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

আন্দ্রিউশা কিরিউশার হাত থেকে একটা বল কেড়ে নিল (যদিও তাদের পাঁচটা বল আছে), তার উপরে আবার তার চুলও টেনে দিল। কিরিউশা করুণভাবে কাঁদতে লাগল, দু'গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল তার।

'চেঁচাচ্ছ কিসের জন্য?' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'তোমার গায়ে জোর আছে। ওর সঙ্গেও ওই রকম কর। বলটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নাও।'

'আমি পারব না।'

'কেন পারবে না?'

'ও কাঁদবে।'

৩·৩। কিরিউশা এখনও কোমল, স্নেহশীল ভাই। কিন্তু আন্দ্রিউশা বিরক্তিকরভাবে হস্তক্ষেপ করলে তাকে সে একই উপায়ে জবাব দিতে শুরু করেছে সম্প্রতি। আমার মনে হয়, আমার মনোভাবের একটা প্রভাব পড়েছে; কিরিউশা যদি নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে না পারে তা হলে সব সময়েই আমি ওকে বকুনি দিই।

কিরিউশার পক্ষে এ কাজটা কঠিন: সে সহজেই নিজেকে স্থাপন করে আরেকজনের জায়গায়, তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ও তাকে রক্ষা করে, বিশেষত প্রশ্নটা যখন তার ভাইকে নিয়ে। কিন্তু অন্যের ব্যথাবেদনা অনুভব করার শক্তিটা আন্দ্রিউশার কাছেও একেবারে অজ্ঞাত নয়।

৩·৪। কিরিউশা: 'উঃ, আমার পা দুটো ব্যথা করছে।'

আন্দ্রিউশা: 'কেঁদো না, আমি তোমাকে আমার পা দুটো কিছুক্ষণ দেব হাঁটার জন্য।'

কিরিউশা: 'কিন্তু কী করে?'

আন্দ্রিউশা (চিন্তা করে): 'আচ্ছা, তা হলে একটা চুমু খাই এসো।'

তা হলেও, আন্দ্রিউশার দিক থেকে স্নেহমমতার প্রকাশ খুবই কদাচিৎ। সে সাধারণত দুর্দান্ত আর নেতিবাচক অবস্থানে দাঁড়ায়।

৩·৯। আন্দ্রিউশা তার ভাইকে কষ্ট দিয়েছে, তাই আমি তাকে উপদেশ দিলাম: 'কিরিউশাকে তুমি ব্যথা দিয়েছ, ওকে একটা চুমু খাও।'

'পারব না।'

'কেন না?'

'থুথু নষ্ট করলে চলবে না।' (চুমু দিতে চায় না, তাই বাহানা তৈরি করছে)।

বিপরীতপক্ষে, কিরিউশা তার ভাইয়ের প্রতি সর্বদাই মনোযোগী এবং তার কথা চিন্তা করে।

৩·৯। আন্দ্রিউশা: 'আমার উপরে চড়ে বোসো, আমি ঘোড়ার মতো তোমাকে নিয়ে ঘুরব।'

কিরিউশা: 'না, তার চাইতে বরং আমি তোমাকে ঘাড়ে নিই। তুমি ছোট, তোমার কষ্ট হবে।'

৪·১০। ওদের কাকা লাল আলো জ্বলার সময়ে রাস্তা পার হওয়ার প্রস্তাব করলেন। আন্দ্রিউশা মজা পেয়ে রাজী হয়ে গেল। কিরিউশা তার ভাইকে আর কাকাকে আঁকড়ে ধরে ক্ষুব্ধস্বরে বলল: 'কক্ষণো না, একটা গাড়ি আন্দ্রিউশাকে চাপা দেবে।' সে আন্দ্রিউশাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে লাগল। তাদের কাকা তাদের বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন, কিরিউশা অর্ধেক দিন ধরে শান্ত হতে পারল না।

চক্ষু পরীক্ষা করাবার জন্য আমরা চোখের ডাক্তারের কাছে গেলাম, আন্দ্রিউশার যখন অসুবিধা হচ্ছিল কিরিউশা তাকে পিছন থেকে বলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম:

'ও রকম করলে কেন?'

'যাতে ওরা সবাই ভাবে যে আন্দ্রিউশা নিজে ভালো দেখতে পায়।'

ভাইয়ের দিকে এত টান থাকা সত্ত্বেও, কিরিউশা যে মেরুদণ্ডহীন, ভ্রাতৃসুলভ ভালোবাসায় গলে যেতে প্রস্তুত, মোটেই তা নয়। ভাইয়ের কৃতিত্বে, যেমন, আন্দ্রিউশার উঁচু গাছ বেয়ে ওঠার ক্ষমতা, কিংবা জিমনাসিয়মে দড়ির একেবারে উপর পর্যন্ত বেয়ে ওঠার ক্ষমতায় গর্ববোধ করলেও কিরিউশা চেষ্টা করে হার না মানতে।

খুব সহজ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি তাদের রেষারেষি আর অহমিকার পরিচয় তুলে ধরতে চাই: দুজনের একজন তার ভাইয়ের চাইতে আগে 'র' আওয়াজটা উচ্চারণ করতে শুরু করেছিল। এই ছোট্ট, এবং আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে গুরুত্বহীন ঘটনাটা হয়ে উঠেছিল সম্পর্কের এক জটিল 'নাটক', তা চলেছিল দীর্ঘ আঠার মাস ধরে।

সাড়ে তিন বছর বয়সে আন্দ্রিউশা হঠাৎ ঠিকভাবে 'র' আওয়াজটা করতে আরম্ভ করল। আমাদের পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কদের আনন্দ আর ধরে না। কিরিউশা তা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারত না, তাই খুবই মুষড়ে পড়ল: 'আমার দাঁত ব্যথা করে, তাই আমি পারি না।' পরের দুই সপ্তাহ ধরে কিরিউশা উচ্চারণ আয়ত্ত করার চেষ্টা করল প্রাণপণে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। সে রেগে গেল, আচরণ করতে শুরু করল খারাপভাবে, আন্দ্রিউশাকে চড় মারতে লাগল, কারণ আন্দ্রিউশা তাকে ক্ষেপাত এই বলে: 'বলো তো র-র-র।'

৪·১০। আমি কিরিউশাকে নিয়ে গেলাম

বাক্‌শক্তিসংক্রান্ত চিকিৎসকের কাছে। বাড়িতে সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুশীলন আমরা করলাম সযত্নে। শেষ পর্যন্ত কিরিউশা নিজেই সেই দুর্ভাগা 'র-র-র' উচ্চারণ করল। আন্দ্রিউশা তার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে, প্রতিক্রিয়া দেখাল এই বলে: 'আমি মনে করি তুমি বিচ্ছিরি!'

এই ছোট অনুচ্ছেদগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে একটি শিশুর 'নাটক', যে আবিষ্কার করেছিল যে সে তার সমকক্ষ — তার ভাইয়ের থেকে পিছিয়ে পড়েছে, অথচ যার বেলায় সব কিছুই চলা উচিত সমানাধিকারের ভিত্তিতে: একজন যা পায় অন্যজনও তাই পায়, মিষ্টি আর সাফল্য সমানভাবে। কিন্তু এখানে দেখা দেয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক এক শিশু, একজন সফল শিশু। তাকে প্রশংসা করা হয়, সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট, তাই সে গর্বিত বোধ করে, একটা সুবিধা ভোগ করে, আরেকজনের ব্যর্থতা উপভোগ করে এবং তাকে ক্ষেপায়। এটা কী? একজন বিশেষ শিশুর, দুষ্টু, আত্ম-সন্তুষ্ট আর অহংবাদী একটি শিশুর কু প্রবৃত্তি? না কি এও হতে পারে যে শিশুর ভাবাবেগ আর আচরণের পিছনে রয়েছে আচরণের কতকগুলি স্বাভাবিক ছক, যেগুলিকে সনাক্ত করা ও বোঝা দরকার, এবং শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা শিখতে হবে আমাদের?

একই অবস্থায় বসবাসকারী, উভয়েই তাদের মা, বাবা আর ঠাকুমা-দিদিমার ভালোবাসা পায়, এমন যমজ শিশুরা প্রাক্‌-স্কুল বয়সে একজন আরেকজনের প্রতি, তারা নিজেদের আত্মীয়দের প্রতি এবং তাদের চারপাশের

কাজকর্মের প্রতি নিজেদের অননুরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে আরও বেশি ঘনঘন।

সাধারণভাবে, আন্দ্রিউশার নিয়ম ভাঙার ঝোঁক আছে। এতে সে উত্তেজনা ও মজা পায়।

৩·০। আন্দ্রিউশা ইচ্ছা করে কিরিউশার উপরে রাগ করে চেঁচায়: 'আমি তোমার মাথা কেটে ফেলব!'। 'আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব!'

৩·৯। আন্দ্রিউশা: 'দুষ্টু হওয়া ভারী মজার। ছোটদের দুষ্টুমি করতে দেখলে আমার ভালো লাগে। আমার নিজেরই দুষ্টু হতে ভালো লাগে। তবে তার জন্য আমাকে শাস্তি দিলে তখন আর তা ভালো লাগে না।'

কিন্তু কিরিউশা এর কিছুই গ্রহণ করে না।

আমরা দুটি শিশুকেই কাজে অভ্যস্ত করিয়ে তুলছি। তাদের কতকগুলি স্থায়ী দায়িত্ব আছে (যেমন, সন্ধ্যায় তাদের অবশ্যই মেঝে থেকে খেলনাগুলো গুছিয়ে তুলে সেগুলিকে যথাস্থানে রেখে দিতে হবে)। কোনো কোনো অবস্থায় দরকার হলে তারা অন্য কাজে জড়িত হয়। কিন্তু যমজ দুই ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া কী পৃথক!

৩·২। আজ উঠানটা সাফসুতরো করা হচ্ছিল।

কিরিউশা: 'আমিও কাজ করব।'

তাকে ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে সেগুলিকে একটা বালতির মধ্যে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হল। আন্দ্রিউশাকেও আমি বললাম, সেও কিছু কাজ করুক। সে দুই আঙুল দিয়ে একটা নুড়ি তুলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা মাটিতে ফেলে

দিল: 'ইস্, কী নোংরা। আমি কাজ করতে চাই না!' বলে চলে গেল বালির বাক্সে হাত নোংরা করতে।

কিরিউশা আমাদের সকলের সঙ্গে দু'ঘণ্টা ধরে কাজ করল একটুও না থেমে। সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঘেমে লাল হয়ে গেছে। আমি তাকে কাজ থামাতে বললাম। 'না!'— তার উত্তর। আমরা একসঙ্গে কাজ শেষ করলাম, এবং অবশ্যই তাকে প্রশংসা করলাম আমি। সাধারণভাবে সে কাজ করতে পছন্দ করে, এবং ঘরের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ইচ্ছুকভাবে। কিন্তু আন্দ্রিউশার বেলায় ব্যাপারটা আলাদা — সে অলস।

৩·৩। খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখার সময় এলেই আন্দ্রিউশা মনমরা হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে 'মরে যেতে' শুরু করে: 'উঃ, আমার পা ব্যথা করছে!' কিংবা: 'আমি ঘুমোতে চাই'।

৩·৯। আমি ফ্ল্যাটটা গোছাচ্ছি। কিরিউশা আমার চারপাশে ঘুরঘুর করছে।

'কী চাও?'

'তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

'না, দরকার নেই, ঝামেলা বাড়াবে।'

'না, করব না। আমি তো ঝাড়ামোছার কাজ পারি, পারি না?'

সে অধ্যবসায় সহকারে আসবাবপত্রের ধুলো ঝাড়ে, আমি যখন মেঝে ধুই তখন চেয়ারগুলো সরায়। আমি আন্দ্রিউশাকে ডেকে বলি: 'এসো, আমাদের সাহায্য করো।'

'না! কাজ করতে আমরা ভালো লাগে না।'

শিশুদের দায়দায়িত্বের প্রতি আন্দ্রিউশার নেতিবাচক মনোভাব অতি শৈশবেই গড়ে উঠেছে। নানানভাবে আমরা তাকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। নিজের অবস্থানটা সে খুব কম বয়সেই স্থির করে নিয়েছে: 'কাজ করতে আমার ভালো লাগে না!' পরে, সে প্রস্তাব করতে শুরু করল যে কিরিউশাই তার হয়ে সব কিছু করে দিক: 'আমি তো তোমাদের অলস ছেলে'। এর মানে অবশ্য এই নয় যে প্রাপ্তবয়স্করা অলসতা অনুমোদন করেছিল অথবা তা উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু যতবারই কাজের কোনো উল্লেখ করা হত, অথবা দায়দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত কোনো প্রচেষ্টা করা হত, সে চেষ্টা করত পাশ কাটিয়ে সরে পড়তে। কিরিউশাও প্রাপ্তবয়স্করা তাকে যা করতে বলত সে সবই তৎক্ষণাৎ করতে সব সময়ে ইচ্ছুক থাকত না, কিন্তু তাকে সহজেই রাজী করানো যেত।

আমাদের নিজেদের অলক্ষেই আমরা আন্দ্রিউশার সামনে তার ভাইকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে শুরু করলাম। তার ভাইয়ের প্রশংসা করা হচ্ছে, তা সে নীরবে শুনত, তাকে যে প্রায়শই ভালো ছেলে বলে অভিহিত করা হয় না এই বিষয়টি সম্পর্কে সে কী ভাবছে বাইরে থেকে তার কোনো চিহ্ন প্রকাশ করত না। তা হলেও, একটা সুনির্দিষ্ট আমি-ধারণা তার মনে গড়ে উঠছিল।

৩·১। আন্দ্রিউশা আমাকে বলে: 'একটা খারাপ আন্দ্রিউশা আঁকো।' আমি দুই পা ছাড়া একটা মূর্তি আঁকি: 'এই দ্যাখো, ও যদি খারাপ হয়, আমি ওর পা আঁকব না।'

কিরিউশা সন্ত্রস্ত: 'ওর পা আঁকো! ও আর খারাপ হবে না! পা এঁকে দাও ওর!'

যা ঘটছে, বিশেষত কিরিউশা যেভাবে তার পক্ষ অবলম্বন করছে তাতে আন্দ্রিউশা রীতিমত খুশি।

৩·৮। আন্দ্রিউশা পরপর উল্লেখ করে বলে যাচ্ছে: 'মা ভালো, বাবা ভালো, দিদা ভালো, কিরিউশা ভালো।'

'আর তুমি?'

'বলব না।'

আমার ছেলে উভয়সংকট নিরসন করে: ভালো হওয়া উচিত, না ভালো না-হওয়া উচিত, এইভাবে। তুমি ভালো হলে লোকে তোমার প্রশংসা করে সেটা খুবই চমৎকার। কিন্তু তার জন্য অনেক চেষ্টা করতে হবে। আর তুমি যদি খারাপ হও, সেটা ভালো না বটে, কিন্তু একটা খারাপ ছেলে কত কী করতে পারে: জঞ্জালের গাদার উপরে চড়তে পারে (!), খারাপ কথা বলতে পারে (!), যত ইচ্ছে দুষ্টুমি করতে পারে (!)

৩·১০। আন্দ্রিউশা সব সময়েই আরও খারাপ খারাপ দুষ্টুমি ভেবে বার করছে। আমি তাকে লজ্জা দিই, শাস্তি দিই, কিন্তু এযাবৎ দুষ্টুমি করার ইচ্ছাটা যুক্তির কণ্ঠস্বরের চেয়ে প্রবলতর।

এ কথা বলা যায় না যে আন্দ্রিউশা সব সময়ে সব ধরনের দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে, কিরিউশা 'ছোট্ট ভালো ছেলে' হয়ে থাকছে। সে অবশ্য বেশি বাধ্য শিশু, কিন্তু মাঝে মাঝে সেও জেদী আর দুষ্টু হতে পারে। সমালোচনা তার

কাছে বেদনায়ক, সে নিজের যাথার্থ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

৪·১১। 'তোমরা সবাই বল আমি খারাপ হয়ে গেছি, কিন্তু সেটা কি সত্যিই আমার দোষ?! আমি ভালো ছেলে ছিলাম আর আন্দ্রিউশা ছিল খারাপ। সে আমার উদাহরণ দেখে ভালো হয়ে গেছে। আর আমি তো দেখেছি আন্দ্রিউশার উদাহরণ।'

এই বিষয়টা সে অতি বিশদে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করে, লোকের চোখে ছোটখাটো এক বাক্যবাগীশ হয়ে ওঠে। অবশ্য, ছোট একটি ছেলের মানসিক উচ্ছ্বাসগুলি বাগাড়ম্বরের ফল, এ কথা বলা ভুল: এখানে আমরা যেটা দেখছি তা শুধু যাথার্থ্য প্রমাণের আকাঙ্ক্ষাই নয়, সুস্থ রসবোধও। কিরিউশা যতক্ষণ নিজের সম্পর্কে আর তার ভাইয়ের সম্পর্কে আলোচনা করে ততক্ষণ মুচকে মুচকে হাসে।

৪·১২। কিরিউশা আবার সু-দৃষ্টান্ত, আর আন্দ্রিউশা দুষ্টুমি করে চলেছে। সে খুব অসুস্থ হয়েছিল, এখন সুস্থ হয়ে উঠছে, বিছানায় শুয়ে থাকতে সে ক্লান্ত।

আন্দ্রিউশার দুষ্টুমিতে কিরিউশা প্রতিক্রিয়া দেখায় আমুদে মন্তব্যভাষ্য করে: 'এক সময়ে আমি ছিলাম ভালো আর আন্দ্রিউশা ছিল খারাপ, সে বদমায়েশি করত। সে আমার উদাহরণ অনুসরণ করে ভালো হল, আর আমি ওর উদাহরণ দেখে খারাপ হয়ে গেলাম। তারপর আমি ওর ভালো উদাহরণ অনুসরণ করলাম, এবং আবার ভালো হয়ে গেলাম। এখন আন্দ্রিউশা খারাপ হয়েছে। তা হলে,

আমরা হয়তো হঠাৎ আবার বদলে যাব। কিন্তু আমি যখন খারাপ হয়ে যাব, এমন কি তখনও আসলে আমিই তার চেয়ে ভালো থাকব, কেননা আমিই তো প্রথমে ভালো ছিলাম।' তার দুষ্টু ভাইকে সে অভিনন্দন জানায়: 'বাঃ, বেশ করেছ, সব সময়ে এই রকম করো। কী ভালো ছোট্ট ভাই!' আমাকে সে ফিসফিস করে বলে: 'আমি ঠাট্টা করছি, যাতে ও লজ্জা পায়।'

যমজ ভাইদুটির পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বয়স্কতর লোকেদের মুখোমুখি তাদের অবস্থান নির্ধারণ করে। স্নেহপ্রবণ কিরিউশা তার ভাইয়ের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে, যখন কোনো দুষ্টুমি করার জন্য শাস্তি পেয়ে তার ভাই কাঁদে। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কিরিউশা তার সাধ্যমতো সব কিছুই করে। এমন কি সেটা করতে গিয়ে সে যাকে অত্যন্ত ভালোবাসে, সেই মাকে পর্যন্ত অভিযুক্ত করতে প্রস্তুত।

৩·২। আন্দ্রিউশা কার্পেটের উপরে ছবি আঁকার চেষ্টা করছিল বলে আমি তার কাছ থেকে পেন্সিলটা কেড়ে নিই। সে চেঁচাতে থাকে। 'আমি পেন্সিলটা চাই!' কিরিউশা তার ভাইয়ের জন্য দুঃখবোধ করে: 'কেঁদ না, কেঁদ না। তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। মা খারাপ।'

আমার দুছেলে পরস্পরের অনুরক্ত, অন্য শিশুদের সম্পর্কেও তারা আগ্রহী। কিন্তু, এখানেও তারা তাদের প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য দেখায়।

৩·৩। কিরিউশা বন্ধুত্ব পাতাতে ভালোবাসে। রাস্তায় বা বনে সে অন্য শিশুদের দিকে এগিয়ে যায়। সে বন্ধু

হওয়ার বাসনা প্রকাশ করে একটা আন্তরিক চাউনি দিয়ে এবং একটি খেলনা নিয়ে এইমাত্র দেখা-হওয়া শিশুটিকে সেটি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সাধারণত এইভাবেই আলাপটা শুরু হয়। শিশুরা কখনও কিরিউশার সঙ্গে ঝগড়া করে না; তার সঙ্গে খেলা সহজ, সে জানে সম্পর্ক কী করে গড়ে তুলতে হয়।

আন্দ্রিউশাও অন্য শিশুদের খেলায় জড়িত হয় — তবে সে শুধু তা লক্ষ করে চোখ দিয়ে। সে শিশুদের লক্ষ করে, সম্পর্কগুলোর মূল্যায়ন করে ঠিকভাবে, ঝগড়ার বিপদ দেখা দিলে ভ্রূকুঞ্চিত করে আর শিশুরা যখন খুশী থাকে তখন হাসে। কিন্তু কোনো প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু যদি তাকে খেলায় যোগ দিতে বলে, তা হলে সে কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়াবে, যেন তার কিছু যায়-আসে না।

আন্দ্রিউশা বেশি আগ্রহী একটু বড় বয়সের শিশুদের প্রতি, বিশেষত বালকদের প্রতি।

৩·৩। আন্দ্রিউশা বালকদের একটা বল নিয়ে খেলতে দেখছে পরমানন্দে। সে আরেকটু কাছে এগিয়ে যায়, কিন্তু তার এই নতুন অবস্থায় সে তাদের খেলায় ব্যাঘাত ঘটায়। একটি বালক তার হাত ধরে তাকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আন্দ্রিউশা এমন কি একেও — যা অসম্মান বলে মনে হতে পারে — ব্যাখ্যা করল বিরাট সম্মান বলে। সে সগর্বে ঘোষণা করে: 'একটা বড় ছেলে আমাকে এখানে সরিয়ে এনে বলেছে: 'এখানে দাঁড়াও'।'

আন্দ্রিউশা বড় ছেলেদের খেলা দেখে যেতে পারত

অনন্তকাল ধরে, তাদের জন্য অন্তহীনভাবে ফাই-ফরমাশ খাটতে পারত, কিন্তু আমি তাকে নিয়ে যাই তার নিজের বয়সের শিশুদের কাছে। তার ভাই এই শিশুদের সঙ্গে সানন্দে খেলছে, আন্দ্রিউশার কোনো গত্যন্তর নেই: তার পাশে যারা আছে তাদের সঙ্গেই তাকে খেলতে আর ভাব-বিনিময় করতে শিখতে হবে।

ভাব-বিনিময়ের চাহিদা গড়ে ওঠে সম্মিলিত খেলাধুলোর কাজের ভিত্তিতে।

প্রাক্-স্কুল শিক্ষার সময়ে, শিশু যখন সর্বদাই থাকে অন্য শিশুদের সঙ্গে এবং নানানভাবে তাদের সংস্পর্শে আসে, তখন আত্মপ্রকাশ করে শিশুদের এক সমাজ, যেখানে শিশু তার সমবয়স্কদের সঙ্গে আচরণের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তার চারপাশের যে শিশুরা তার শিক্ষাদাতা নয় বরং সম্মিলিত জীবনে ও কাজকর্মে সমান অংশগ্রাহী তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপরে সমবয়স্ক একটা গোষ্ঠীর প্রভাব প্রধানত এইখানে যে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে আদান-প্রদানের সময়েই সে অবিরত তার অর্জিত আচরণের মান কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার এবং সেগুলিকে মূর্ত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হয়। শিশুরা যখন একসঙ্গে কিছু করে, তখন নিয়তই এমন সব পরিস্থিতি উদ্ভব হয় যেখানে দরকার হয় সম্মত ক্রিয়াকলাপ, পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা এবং এক অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে দমন করার সামর্থ্য। এই রকম পরিস্থিতিতে পড়লে শিশুরা যে

সবসময়ে আচরণের প্রয়োজনীয় ধরনটা খুঁজে পায়, তা আদৌ নয়। তাদের মধ্যে প্রায়শই বিরোধ বাধে, যখন প্রত্যেকে তার সমবয়স্কের অধিকার উপেক্ষা করে নিজের অধিকারকেই বড় করে দেখে। এই সমস্ত বিরোধে হস্তক্ষেপ করে, সেগুলি মিটিয়ে দিয়ে, শিক্ষাদাতা শিশুদের শেখান আচরণের মানগুলির **সচেতন** প্রয়োগ।

সমবয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশা একটি শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে ও আরচণের মানগুলি আয়ত্তীকরণকে আরেকভাবেও প্রভাবিত করে, সেটা হল তাদের মধ্যে এক গোষ্ঠীগত অভিমত গঠন।

তিন বছর বয়সী শিশুদের একটা গোষ্ঠীতে কোনো বিষয়, ঘটনা বা ক্রিয়া সম্পর্কে অভিন্ন কোনো অভিমত থাকে না। একটি শিশুর অভিমত সাধারণত আরেকটি শিশুর অভিমতকে প্রভাবান্বিত করে না। কিন্তু চার থেকে পাঁচ বছর বয়সে শিশুরা তাদের সমবয়স্করা কী ভাবে সেই দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের কাছে নতিস্বীকার করতে শুরু করে, এমন কি তা যদি নিজেদের ব্যক্তিগত ধারণা আর জ্ঞানের বিরোধী হয়, তা হলেও। এই নতিস্বীকারকেই বলা হয় নিয়মানুগতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি টেবিলের উপরে দুটি পিরামিড দাঁড়িয়ে ছিল, একটি কালো, অন্যটি সাদা। কয়েকজন শিশুকে বিশেষভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই কথা বলতে যে দুটোই সাদা। এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার নয় এমন একটি শিশু তার দু-তিনজন সমবয়স্কের অভিমত শুনে জবাব দিয়েছিল যে দুটো পিরামিডই সাদা।

ছয় বছর বয়স নাগাদ এই নিয়মানুগত্য অনেক কমে যায়। কিন্তু কখনও কখনও তা দৃঢ়মূল হয়, এবং ব্যক্তিত্বের নেতিবাচক প্রলক্ষণ হয়ে উঠতে পারে।

শিশুরা তাদের সমবয়স্কদের কাছে যে মতামত দেয়, সেগুলি প্রথমে নিতান্তই কোনো প্রাপ্তবয়স্কের দেওয়া মতামতের পুনরাবৃত্তি। তিন বছর বয়সী শিশুদের যখন প্রশ্ন করা হয়: 'তোমাদের দলে সবচেয়ে ভালো কে?' তারা উত্তর দেয়: 'লেনা, কেননা ও তাড়াতাড়ি খায়,' অথবা 'ভিতিয়া, কেননা ওকে যা করতে বলা হয় সবসময়ে তা করে।' কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই মতামতের অন্তর্বস্তু সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। যে সমস্ত শিশু অনেকরকম খেলা জানে, যারা তাদের সঙ্গীদের সঙ্গে নিজেদের খেলনা ভাগ করে নেয়, অথবা অন্যকে সাহায্য করে, ইত্যাদি, তাদের মূল্যায়ন করা হয় ইতিবাচকভাবে।

গোষ্ঠীর দ্বারা মূল্যায়ন চার বা পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সমবয়স্কদের অপছন্দ হয় এমন কোনো কাজ না করার চেষ্টা তারা করে এবং তাদের শ্রদ্ধা লাভের চেষ্টা করে।

কিন্ডারগার্টেন গোষ্ঠীতে প্রত্যেক শিশুরই একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে, তা প্রকাশ পায় তার নিজের বয়সী শিশুরা তার প্রতি যেভাবে আচরণ করে, তার মধ্যে। সাধারণত দুই বা তিনটি শিশু সবচেয়ে জনপ্রিয় থাকে: অন্যদের মধ্যে অনেকেই তাদের বন্ধু হতে অথবা তাদের পাশে বসতে চায়; তাদের তারা নকল করে, তাদের অনুরোধ ইচ্ছুকভাবে রক্ষা করে, এবং তাদের হাতে খেলনা

তুলে দেয়। এই সমস্ত 'প্রিয়পাত্রদের' পাশাপাশি এমন সব শিশুও থাকে যারা তাদের সমবয়স্কদের কাছে একেবারেই অপ্রিয়। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা ভাব-বিনিময় থাকে খুব সামান্যই, খেলায় তাদের গ্রহণ করা হয় না, কেউ তাদের খেলনা দিতে চায় না। বাকি শিশুরা থাকে এই দুই মেরুর মাঝখানে। একটি শিশু যে জনপ্রিয়তা ভোগ করে তার মাত্রা নির্ভর করে অনেক জিনিসের উপরে: তার অর্জিত কৃতিত্বসমূহ, মানসিক বিকাশ, আচরণের বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য শিশুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দক্ষতা, চেহারা, শারীরিক শক্তি, সহ্যশক্তি ইত্যাদি।

নিজের সমবয়স্কদের গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থানটির একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপরে। তার উপরে নির্ভর করে, শিশু নিজে কতখানি স্বচ্ছন্দ ও সন্তুষ্ট বোধ করে, তার সমবয়স্কদের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আচরণের মানগুলি সে কতখানি আয়ত্ত করে। জনপ্রিয়তার সিঁড়িতে যেসব শিশু নিচের ধাপে আছে, তাদের সমবয়স্কদের কাছ থেকে যারা সহানুভূতি ও সাহায্য আশা করতে পারে না, তারা প্রায়শই অহংবাদী আর চাপা ধরনের হয়ে ওঠে। যেসব শিশু অত্যন্ত জনপ্রিয় তারা অত্যধিক আত্মবিশ্বাস আর অহমিকায় 'সংক্রমিত' হতে পারে। গোষ্ঠীর মধ্যে শুভেচ্ছার একটা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এবং গোষ্ঠীটির মধ্যে বিভিন্ন শিশুর অবস্থান সমান করার জন্য, শিশুদের অন্তঃসম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাদাতার প্রচুর কাজ করা দরকার।

অধ্যায় ৭। ছেলে — মেয়ে

অতি শৈশবের শেষ দিকেই শিশু তার স্ত্রী-পুরুষত্ব সম্পর্কে জেনে যায়, কিন্তু তখনও জানে না 'ছেলে' বা 'মেয়ে' শব্দটির সারগত অর্থ কী হওয়া উচিত।

প্রাপ্তবয়স্করা সচেতন অথবা অচেতনভাবে শিশুকে তার লিঙ্গগত ভূমিকা শেখাতে শুরু করে সর্বজনস্বীকৃত ধরাবাঁধা ছক অনুযায়ী, ছেলে বা মেয়ে হওয়ার অর্থ কী সে দিকে মনোযোগ চালিত করে। ছেলেদের একটু বেশি আক্রমণমুখী হতে দেওয়া হয়, উৎসাহ দেওয়া হয় সক্রিয় হতে ও উদ্যোগ দেখাতে, আর মেয়েদের কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে তারা হবে সংবেদনশীল ও ভাবাবেগপ্রধান। শিশুর নিজের লিঙ্গগত গুণাগুণের উপলব্ধি গড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে, তার আত্ম-সচেতনতা বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। খেলাধুলো বেছে নেওয়া, আগ্রহ আর দিবাস্বপ্নের ক্ষেত্রে তার জীবনের অভিমুখীনতা নির্ধারিত হয় এর দ্বারা। শিশুর নিজের স্ত্রী-পুরুষত্ব সম্পর্কিত মূল্যবোধের উপলব্ধি বেশির ভাগই ঘটে পরিবারের ভিতরে।

বেশির ভাগ সংস্কৃতিতেই লালন-পালনের একটা সু-প্রতিষ্ঠিত ছক আছে। একটি ছেলেকে, এমন কি অতি ছোট ছেলেকেও সাধারণত বলা হয়: 'কেঁদো না। তুমি মেয়ে নও। তুমি একটা ব্যাটাছেলে।' সে তখন উদ্‌গত অশ্রু সংযত করতে শেখে। মেয়েকে শেখানো হয়: 'বদমাশি করো না, বেড়া আর গাছ বেয়ে উঠো না। তুমি মেয়ে।' তাই দুষ্টু মেয়েটিকে নিজেকে সংযত করতে হয়: সে তো মেয়ে! লিঙ্গগত আচরণের মেরুপ্রবণতা শুরু হয়ে যায়, যার কার্যকরতা নির্ভর করে প্রধানত পরিবারের গঠনবিন্যাসের উপরে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা সম্পূর্ণ আর অসম্পূর্ণ পরিবার — এই দুটিকে আলাদা করে দেখি।

সম্পূর্ণ পরিবার হল বাবা-মা — এই দুজনকে কেন্দ্র করে পরিবার, সে পরিবার বড় অথবা ছোট হতে পারে। একটা বড় সম্পূর্ণ পরিবারে থাকে বাবা-মা ছাড়াও, একজন ঠাকুমা, দাদু আর কয়েকজন শিশু। ছোট সম্পূর্ণ (বা অণুকেন্দ্রীয়) পরিবার হল বাবা, মা আর একটি শিশু।

অসম্পূর্ণ পরিবার হল এই ধরনের পরিবার যেখানে মা অথবা বাবা নেই। আজ আমরা যাকে মাতৃপ্রধান পরিবার বলি, তা খুবই নিত্যনৈমিত্তিক।

সম্পূর্ণ পরিবারে শিশুরা মুখ্যত অনুকরণ করে শিশুর নিজের লিঙ্গের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের।

ছোট সম্পূর্ণ পরিবারে শিশুরা হয় তাদের বাবা-মার

অভিমুখী: ছেলেরা সাধারণত বাবার দিকে, মেয়েরা মায়ের দিকে। ছেলে তার পছন্দ-অপছন্দের যুক্তি দেয় এই বলে যে সেও পুরুষ, তাই তাকে পুরুষের মতোই হতে হবে। এটা করার সময়ে সে তার বাবার পুরুষসুলভ কৃতিত্বগুলির প্রতি প্রশংসা প্রকাশ করে। মেয়ে বেছে নেয় মাকে, বলে যে সেও মেয়ে, তাই তাকে মেয়ের মতোই হতে হবে, এইভাবে সে তার মায়ের নারীসুলভ কৃতিত্বগুলির প্রতিই তার সপ্রশংস মনোভাবের পরিচয় দেয়।

একাধিক শিশু যেসব পরিবারে আছে, সেখানেও শিশুরা মডেল হিসেবে বেছে নেয় বয়সে বড় ভাই বা বোনদের (শিশুর নিজের লিঙ্গভেদ আবার বিশেষ পছন্দকে অনেকখানি নির্ধারিত করে)।

বাবার অভাব একটি ছেলের চরিত্রের উপরে প্রায়শই নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সে অতিবাধ্য, অমনোযোগী ও মেয়েলি হয়ে যেতে পারে, অথবা তার পরিপার্শ্বের প্রভাবের শিকার হতে পারে সহজেই। অনুরূপ, যদিও ততটা চরম নয়, ধরন দেখা দেয় সেইসব পরিবারেও, যেখানে বাবা থাকলেও তার ভূমিকাটা গৌণ।

পুরুষ ও নারীসুলভ আচরণের ছকগুলি উদীয়মান প্রজন্মের মনে প্রবেশ করে পুরুষ আর নারীদের বয়স্কতর প্রজন্মের প্রত্যক্ষ উদাহরণের মধ্য দিয়ে তথা কলাবিদ্যাগুলির মধ্য দিয়ে। প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু তার মনোযোগ সরিয়ে আনতে শুরু করে নিজ লিঙ্গগোষ্ঠীর বিশেষ মূল্যবোধগুলির দিকে। গোড়ায় শিশু পুরুষ আর নারীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করে পোশাকে আর সামাজিক আচরণে। শিশু প্রায়ই

ধরে নেয় যে একজন ব্যক্তির নিজস্ব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলি এক বিশেষ লিঙ্গের সহজাত চিহ্ন। একটি পরিচিত শিশু, পাঁচ বছর বয়সের নিকিতা তার জানা একজন তরুণকে নকল করতে শুরু করল; ছেলেটির চোখে আকর্ষণের দৃষ্টি লক্ষ করে সেই তরুণ তাকে পরিহাসছলে বলেছিল: 'নিকিতা, একজন সত্যিকারের পুরুষমানুষের এই রকম করা উচিত' এই কথা বলে সে কায়দার সঙ্গে, দ্রুত, প্রায় চোখে-না-পড়ার মতো একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার চুল সরিয়েছিল। যাকে বলা হয়েছিল 'সত্যিকারের পুরুষমানুষ', তার এই গুণে আকৃষ্ট হয়ে নিকিতাও সর্বক্ষণ তার মাথা ঝাঁকাতে শুরু করেছিল। যাই হোক, পুরুষ ও নারীদের লক্ষণসূচক আচরণ শিশুর উপরে ছাপ ফেলে এবং তাকে গড়ে তোলে স্ত্রী-পুরুষের একজনের প্রতিনিধিরূপে। শিশু নকল করে সব কিছু: তার চারপাশের সকলের কাছে উপযোগী এমন ধরনের আচরণ, আবার সামাজিক প্রথার পক্ষে ক্ষতিকর প্রাপ্তবয়স্কদের আচরণের (খারাপ ভাষা, ধূমপান ইত্যাদি) ছকও। শিশু যদিও তখনও পর্যন্ত 'পুরুষত্বের এই প্রতীকগুলিকে' কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে না, তবুও সেগুলিকে খেলার মধ্যে নিয়ে আসে। প্রাক্-স্কুল বয়সে আগ্রহের গতিমুখের ক্ষেত্রে পার্থক্য ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে জন্মায় এবং বিকশিত হয়; প্রকাশ পায় নিজ লিঙ্গের শিশুদের প্রতি তথাকথিত বদান্য পক্ষপাতিত্ব, ছেলে সাধারণত বেছে নেয় ছেলেদের আর মেয়ে — মেয়েদের। নিজের সম্পর্কে চেতনা বিকাশলাভ করে এবং তার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে, গড়ে

ওঠে একজন ছেলে, একজন পুরুষ হিসেবে, এবং একজন মেয়ে, একজন নারী হিসেবে নিজের সম্পর্কে উপলব্ধি।

খেলাধুলো, খেলনার পছন্দের ব্যাপারে প্রভেদন, এবং এর সঙ্গে জড়িত, হাতিয়ার নিয়ে খেলা ও ক্রিয়ার বিশদীকরণ শুরু হয় প্রাক্-স্কুল বয়সে: শিশুর ভাবাবেগগত সাড়ার ক্ষমতা প্রকাশ পায় খেলায়, এবং পুরুষ ও নারীর আচরণের সম্ভাব্য ধরনগুলি স্থিরীকৃত হয়। যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব হয় মেয়েরা তার সঙ্গে ভালোভাবে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বেশি পারদর্শিনী এবং নতুন অবস্থায় তারা গিয়ে পড়ে বেশি তাড়াতাড়ি ও আরও সহজে। ছেলেরা বেশি বিস্ফোরণমুখী, বেশি হৈচৈ করে। ভূমিকাভিনয়ে ছেলে একজন প্রাপ্তবয়স্ককে নকল করে ড্রাইভার, মহাকাশচারী বা সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করে; একটি মেয়ে খেলে মা, চিকিৎসক বা শিক্ষিকার ভূমিকা নিয়ে। এই বেছে-নেওয়া অভিনয়ের ভূমিকাতেই প্রতিফলিত হয় ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গের শিশুদের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা। পুরুষ ও নারীর সামাজিক ভূমিকার সঙ্গে যুক্ত কাজকর্মে আগ্রহ চরিতার্থ হয় খেলার বিশেষ পার্থক্যসূচক ধরনগুলির মধ্যে। ছেলেদের আগ্রহ প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে, জয় আর নেতৃত্বের জন্য নিজের আকাঙ্ক্ষা যেখানে চরিতার্থ করা যায় সেই রকম প্রতিযোগিতামূলক খেলার দিকে কেন্দ্রীভূত। ছেলেরা স্বীকার করে নেয় সেই সব বলিষ্ঠ, সাহসী সমবয়স্কদের, যারা উদ্যোগ দেখায়। মেয়েদের আগ্রহ প্রধানত ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকেই কেন্দ্রীভূত।

মেয়েরা সমবয়স্ক সেইসব মেয়েকে পছন্দ করে, যারা নম্র, হাসিখুশি আর ভদ্র।

নিজেদের লক্ষ্যার্জনের জন্য ছেলেরা আর মেয়েরা বেছে নেয় সেই রকম সব খেলনা যেগুলি বিষয়বস্তুর বিকাশে সাহায্য করার মতো সমর্থনদানমূলক উপকরণ হিসেবে কাজ করে।

আমরা একটি বিশেষ পরীক্ষার আয়োজন করেছিলাম, তাতে শিশুদের চারটি জিনিসের মধ্য থেকে যেকোনো দুটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ছিল একটা গাড়ি, থালা-বাসন, কিছু ব্লক আর একটা পুতুল। এক একটি শিশুকে বলা হয়েছিল সব কটি খেলনার নাম বলতে, যে দুটো তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ সে দুটি নিয়ে তাই দিয়ে খেলতে। পরীক্ষায় দেখা গেল যে চতুর্থ বছরে ছেলেদের আর মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু খেলনা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে পার্থক্য আছে — গাড়ি আর ব্লকগুলি মুখ্যত ছেলেরাই বেছে নিয়েছিল, আর মেয়েদের পছন্দ ছিল পুতুল আর থালা-বাসন।

ছেলেদের ও মেয়েদের বিশেষ কাজকর্ম আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করার জন্য আরেকটি পরীক্ষা করা হয়। ছেলেদের ও মেয়েদের দুটো খেলা খেলতে দেওয়া হয়: পুতুলদের গৃহকোণটা গুছিয়ে রাখা অথবা খেলনা গ্যারেজ গোছানো।

বেশির ভাগ ছেলেই পুতুলদের গৃহকোণে খেলতে চায় নি ('আমি তো মেয়ে নই!') একটা ছেলে যখন কাজটা গ্রহণ করল, তার কাজকর্ম ছিল 'পুরোপুরি পুরুষোচিত',

যেমন আসবাবপত্র সরানো বা মেরামত করা। পুতুলগুলোকে বিছানায় শোয়ানো বা টেবিল সাজানোর মতো কাজ করা হয়েছিল অনিচ্ছাভরে, ভদ্রতার খাতিরে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের অনুরোধ পালন করার জন্য। মেয়েদের যখন পুতুলদের গৃহকোণ গোছাতে বলা হল, প্রায় সব মেয়েই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। তারা তাদের কাজকর্মের পরিকল্পনা করতে শুরু করল উচ্চকণ্ঠে, এবং কাজকর্মের সংখ্যা আর তারা কী করবে তা বেড়ে গেল বয়সের সঙ্গে। তিন ও চার বছর বয়সী মেয়েরা করল চার অথবা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন কাজ, কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকে কাজের সংখ্যা দাঁড়াল আট থেকে বারো। পুতুলদের গৃহকোণ গোছাবার সময়ে বয়সে একটু বড় মেয়েদের কাজকর্ম ছিল গৃহ গোছাবার সময় একজন নারী যা করে অনেকটা তারই মতো।

প্রাক্‌-স্কুল বয়সে আগ্রহের শুধু যে একটা ভাবাবেগগত প্রভেদন থাকে তাই নয়, পুরুষোচিত ও নারীসুলভ কাজকর্মের বিশেষ চরিত্রের একটা কার্যকর অনুপ্রবেশও ঘটে। ছেলেরা প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বেশি জানে এবং বেশি দক্ষ, আর মেয়েরা পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে।

পুরো প্রাক্‌-স্কুল বয়স জুড়েই নিজ লিঙ্গের সঙ্গে শিশুর এক নিবিড় একাত্মতা ঘটে। সেই কালপর্বের শেষ দিকে, শিশু তার আচরণের কাঠামো গড়ে তুলতে শুরু করে এই ভিত্তির উপরে। বাহ্যিক প্রকাশ, শিশুর খেলা বেছে নেওয়া আর আগ্রহ এখন অনেকখানি নির্ভর করে নিজের স্ত্রী-পুরুষত্বের উপরে।

শিশুর এই সচেতনতা যে সে পুরুষ অথবা মেয়ে,

মানুষ হয়ে ওঠার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই লিঙ্গের অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে একাত্মতা বোধ গড়ে ওঠে শিশুর মধ্যে (আমরা ছেলে!), সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে নিজের লিঙ্গের 'মর্যাদা' তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা (নিজের লিঙ্গগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ খেলায় অংশগ্রহণ করা, এবং পুরুষোচিত বা নারীসুলভ প্রলক্ষণগুলির উপরে জোর দেওয়া)। এই ভাবগুলিকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে, কারণ এগুলিই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরিপূর্ণতা নির্ধারণ করে।

বিপরীত লিঙ্গের শিশুদের সম্পর্ক

তিন বছর বয়সের আগে শিশু একটা লিঙ্গগত ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। এতে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রভাবিত হয়। এই ক্ষেত্রে তার বয়োঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আচরণ কৌতূহলজনক। ছেলেরা তাদের মা, মাসি-পিসি ও বড় বোনেদের সঙ্গে 'ছেলেদের মতো' ব্যবহার করতে চেষ্টা করে; মেয়েরা নারীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে তার চেয়ে কিছুটা ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে থাকে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে: যে সব পুরুষকে তারা পছন্দ করে তাদের সামনে তারা প্রায়শই একটু বেশি লাজুক এবং আবদেরে হয়ে ওঠে।

আমার কিরিউশা রমণীসেবক বীরপুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল অতীব আনন্দের সঙ্গে।

৩·২। পথে যদি ছোট একটা গর্ত বা গাছের ডাল থাকে, কিরিউশা প্রায়শই তার হাত বাড়িয়ে দেয় আমার

দিকে: 'তুমি পড়ে যাবে না। আমি একটা পুরুষমানুষ!'

৪·৭। 'মা, আমি তোমার বীরপুরুষ হব! আমি একটা পুরুষমানুষ, মা, তুমি যাও, এবারে দিদা, তুমি। এই, ঠিক হয়েছে। এবারে আমি যাব।'

৬·৭। আমরা বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুই ছেলে ভাঙা ডালপালা জোগাড় করে অগ্নিকুন্ড বানায়। কিরিউশা একটা শুকনো কাঠের টুকরো টেনে আনে: 'এটা তোমার জন্য! তুমি বসো! তুমি তো আমাদের মহিলা, তাই আমরা তোমার দেখাশোনা করছি।'

আন্দ্রিউশা রমণীসেবক বীরপুরুষের ভূমিকার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। কিরিউশার এইসব প্রদর্শন সে উপেক্ষা করে — অন্তত বাইরে থেকে মনে হয় যে সে তাকে এই ভূমিকায় কল্পনা করতে পারে না। কিরিউশা কিন্তু বীরপুরুষ হওয়ার ব্যাপারে খুবই একাগ্র। সে যে একজন পুরুষমানুষ তা দেখাবার সমস্ত সুযোগই সে ব্যবহার করে, একজন 'সত্যিকারের পুরুষমানুষের' কী রকম আচরণ করা উচিত সেই প্রশ্ন আলোচনা করে এবং এ নিয়ে ঠাট্টা করে। তাই নিজেকে চালাক দেখাবার চেষ্টায় কিরিউশা বলে: 'একজন মহিলা যদি হঠাৎ পড়ে যায় আর একজন পুরুষমানুষ যদি তার কাছে থাকে, তা হলে তার উচিত... তার কী করা উচিত বলে তোমার মনে হয়? তার উচিত (হাসে) মহিলার কাছে গিয়ে তার পাশে পড়ে যাওয়া, যেন মহিলাকে টেনে তুলতে না হয়। তখন অন্য কেউ তাকে তুলবে (হাসে)। ভারী চমৎকার পুরুষমানুষ!'

প্রাক্-স্কুল বয়সে শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে তাদের

সম্পর্ককে রাঙায় তাদের নিজেদের লিঙ্গগত ভূমিকার বিশিষ্ট চরিত্র দিয়ে। এই সমস্ত বহিঃপ্রকাশে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিক্রিয়া প্রতিপন্ন করে যে শিশু সঠিক আচরণ করছে, অথবা সেই আচরণকে সংশোধন করে, অথবা শিশুর একটা বিশেষ আচরণগত বহিঃপ্রকাশকে বন্ধ করে। বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন বিভিন্ন জাতির নিজস্ব পুরুষোচিত ও নারীসুলভ আচরণের ধরন আছে। এক বিশেষ সংস্কৃতির শিশু তার লিঙ্গের পক্ষে উপযুক্ত আচরণের ধরন গ্রহণ করে সেই বয়সেই যখন সে জানে না যে এই ধরনটার অর্থ কী।

বিপরীত লিঙ্গের সমবয়স্কদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শিশুরা তাদের আচরণের প্রভেদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কিরিউশা (৫·৯) তা প্রকাশ করেছিল এইভাবে: 'আমি ছেলেমেয়ে সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করি। তারা সবাই আমাকে তাদের গোপন কথা বলে, আমি কিন্তু মেয়েদের বলি না ছেলেদের গোপন কথা, কিংবা ছেলেদের বলি না মেয়েদের গোপন কথা।'

কিণ্ডারগার্টেনে খেলার সময়ে শিশুদের মধ্যে যে জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করা যায় তা এই যে তারা লিঙ্গ অনুযায়ী গোষ্ঠীবদ্ধ হয়।

কয়েকটি পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে কী দেখা গেছে, সে প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

মিশা আর আন্দ্রেইয়ের কাছে কোস্তিয়া প্রস্তাব করল, একটা গ্যারেজ বানানো যাক। কাজটা এগিয়ে চলছিল সুন্দরভাবে: মিশা মালমশলা নিয়ে আসছিল, আর

কোস্তিয়া ও আন্দ্রেই তৈরি করছিল। কাজটা যখন চরম পর্যায়ে, তখন এসে হাজির হল লেনা।

লেনা: 'আমি ভেবেছিলাম, পুতুলগুলো এখানে থাকতে পারত।'

আন্দ্রেই: 'তুই কিচ্ছু বুঝিস না, এটা গাড়ি রাখার গ্যারেজ।'

লেনা: 'পুতুলের বাড়ি হিসেবে এটা আরও ভালো হত।'

আন্দ্রেই: 'আমরা কাজ করছি, তুই খেলতে যাচ্ছিস? আমরাও খেলতে পারলে বেশ হত।'

লেনা: 'আমরা একসঙ্গে খেলব।'

কোস্তিয়া (তাদের কথাবার্তা শুনেছে): 'কী বলছিস তুই, ছেলেরা পুতুল নিয়ে খেলে না, তাই না আন্দ্রেই?'

আন্দ্রেই (মাপ চাইবার ভঙ্গিতে লেনাকে বলে): 'বুঝেছিস, তুই যদি ছেলে হতি, ড্রাইভার হতে পারতি... কিন্তু (উৎফুল্ল হয়ে) মারিনা তোকে ডাকছে। যা।'

আরেকদল শিশু খেলা করছে।

লারিসা আর তানিয়া ফিসফিস করে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছে আর পুতুলগুলোর পোশাক খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে। তারা দুজনেই মনস্থির করে পুতুলগুলোর পোশাক খুলে ফেলল, কাপড় কাচার গামলায় পোশাকগুলো রেখে অ্যাপ্রন পরে নিল। পুরোদমে 'কাপড় ধোলাই' চলছে, এমন সময়ে সাশার আবির্ভাব।

সাশা: 'আমিও কাপড় কাচতে চাই, আয় একসঙ্গে কাচা যাক। আমি কাপড় জলে ধোব।'

লারিসা ও তানিয়া (রূষ্টভাবে, প্রায় সমস্বরে): কিন্তু তুই তো ছেলে! ছেলেরা কাপড় কাচে না, মেয়েরাই ওটা করে।'

শুধু সম্মিলিত খেলাই নয়, ব্যক্তিগত একক খেলাও নির্ধারিত হয় শিশুর লিঙ্গভেদ দিয়ে। ছেলেদের আর মেয়েদের খেলা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

ওলেগ স. (৬·৮)। একা-একা খেলতে পছন্দ করে, এবং কীভাবে খেলতে হয় তাও জানে। সে তার প্রিয় খেলনা, একটা এরোপ্লেন উঁচু করে ধরে আছে। 'আমি ভিতিয়া কাকার মতো, সেও একজন পাইলট। তার গায়ে খুব জোর, সাহসও খুব। আমি তার মতো হব। আমিও তো পুরুষমানুষ। এইবারে আমি উড়ে যাচ্ছি ভিতিয়া কাকার কাছে, তারপর সত্যিকার এরোপ্লেনে তার সঙ্গে উড়ব।'

এই ভূমিকার পর সে চেয়ার থেকে নেমে পড়ে, 'ইঞ্জিনগুলো চালু করে দেয়' এবং এরোপ্লেনটা উঁচু করে ধরে আর মুখ দিয়ে ওড়ার সময়কার আওয়াজ করতে করতে ঘরের চারদিকে দৌড়তে শুরু করে।

স্ভেতা ক. (৬·৩)। সম্প্রতি অসুস্থ ছিল, তাই বেড়ানোর পর সে প্রথম ফিরেছে। কোনো ছেলেমেয়ে নেই, সে একা। তাকে যখন তার উপভোগ্য কিছু করতে বলা হল, সে সোজা চলে গেল পুতুল রাখার গৃহকোণে। একটি পুতুল নিয়ে সেটিকে সে টেবিলের কাছে বসাল, তাকে 'খাওয়াল', তারপর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল: 'কেঁদো না, বাছা।

ভাবাবেগের অনুরণন

আমার বাবা সবচেয়ে সুন্দর। ইগর, ৫ বছর

দুষ্টু গাছ। সাশা, ৫ বছর
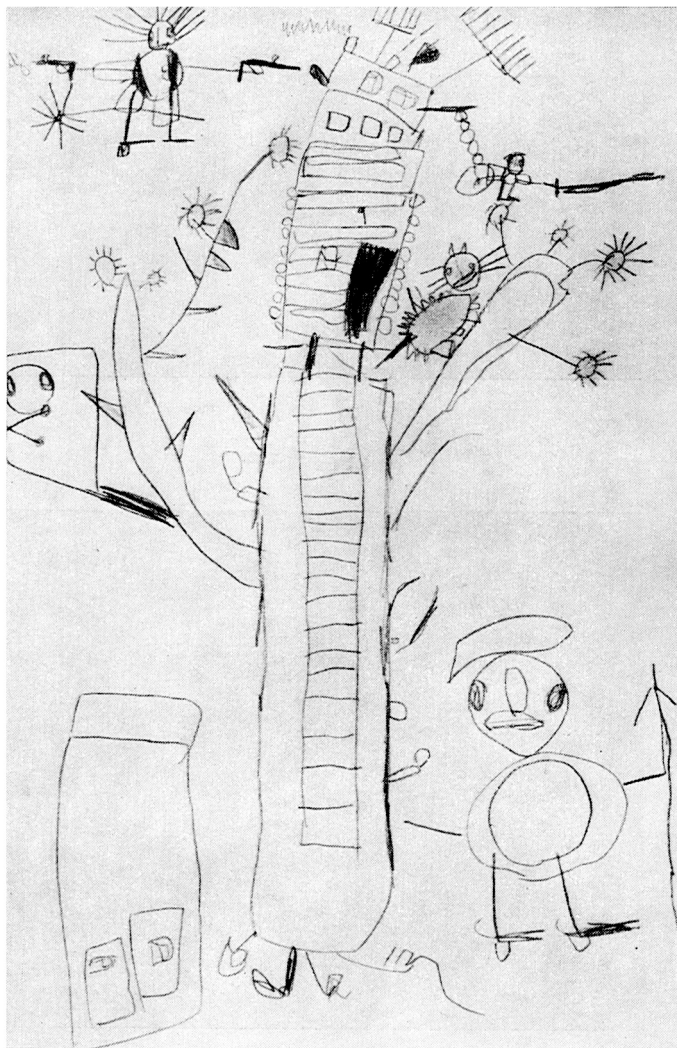
বহিবৃর্ত

খেলবে নাকি ?

ঘুমোও, নইলে অসুখ সারবে না। তোমাকে একটা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শোনাই।' বলে মৃদুস্বরে গাইতে লাগল।

বাবা আর মায়ের ভূমিকা ছাড়াও পরিবারের ভিতরে শিশুর ভূমিকাতেও শিশু খুবই আগ্রহী। সে একটি শিশুর ভূমিকা পালন করে, শিশুটির স্থানটা কী, বিশেষত তার নিজ লিঙ্গের শিশুর স্থানটা কী তা অনুভব করার চেষ্টায়। ছোট পরিবারগুলিতে শিশু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রহণ করে 'শুধুই একটি ছেলে' বা 'শুধুই একটি মেয়ের' ভূমিকা। বড় পরিবারগুলিতে বয়ঃকনিষ্ঠ শিশুরা তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভাই বা বোনেদের ভূমিকা গ্রহণ করে। একাধিক ছেলে ঘরকন্না খেলায় তাদের ভূমিকা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে বলেছিল যে ওটা পুরুষমানুষের কাজ নয় ('আমি কি মেয়ে নাকি?', 'আমি ঘরকন্না খেলি না। হা-হা-হা, শুধু মেয়েরাই মা আর মেয়ে-মেয়ে খেলা খেলে!')। ঘরকন্না খেলায় এই সরাসরি রাজী না-হওয়াটা ছোট পরিবারগুলির ছেলেদেরই বিশিষ্ট লক্ষণসূচক। যে পরিবারে উভয় লিঙ্গেরই বহু শিশু থাকে, তারা বিভিন্ন ধরনের খেলায় সহজেই যোগ দেয়।

যাকে বলা হয় শৈশব প্রেম, তা শিশুদের পরস্পরসম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এই সময়ে নিজের স্নেহ-ভালোবাসার পাত্র সম্পর্কে শিশুর অনেক কিছু বলার থাকে এবং অধীর হয়ে অপেক্ষা করে

একটা মুখোমুখি দেখাসাক্ষাতের জন্য, কিন্তু যখন তা ঘটে তখন সে বিব্রত ও বিভ্রান্ত বোধ করতে পারে।

আমার চেনা একটি মেয়ে, নাতাশা, পাঁচ বছর বয়সে তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিল সাশা নামে একটি নীল-চোখ, হালকা রঙের চুলওয়ালা একটি ছোট ছেলের প্রতি। সে সত্যিই এর উপযুক্ত ছিল: সুগঠিত এবং খেলাধুলোয় সবসময়েই নেতা। সে সাধারণত খেলত ছেলেদের সঙ্গে, ফলত নাতাশার প্রতি তেমন মনোযোগ দিত না বললেই চলে। কিণ্ডারগার্টেনে নাতাশা অতি সংগোপনে সাশার দিকে তাকাত, তার কাছাকাছি যেতে ভয় পেত সে। বাড়িতে সে তার প্রতি সাশার আচরণের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলি সম্পর্কে — যেগুলি শুধু সে-ই লক্ষ করেছে — অনেক কথা বলত খুবই আবেগের সঙ্গে।

এর পরে, ছয় বছর বয়সে নাতাশা তার দশ বছর বয়স্ক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ার একটা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। গোটা ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল মেয়েলি চটুলতা দিয়ে। ছেলেটি প্রথম যখন নাতাশার বাড়িতে এসেছিল, নাতাশা তখন রান্নাঘরে দরজা বন্ধ করে একজন সখীর সঙ্গে বসে কখনও জোরে জোরে হাসছিল, কখনও বা চাপাস্বরে ফিসফিস করছিল। বেরিয়ে এসে অতিথিকে সম্ভাষণ করতে সে রাজী হয় নি অনেকক্ষণ। কিন্তু একবার এই মাসতুতো ভাইটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর নাতাশা প্রায়শই তার কথা চিন্তা করতে লাগল। অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সে মাঠে অথবা বনে চলে যেত। একা হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের বানানো সব

গান গাইত। দিদিমার কাছে সে তার প্রেম সম্পর্কে বলত। তার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে সে প্রেমে পড়েছে: 'আমি কবিতা লিখতে চাই। যারা ভালোবাসে তারাই তো শুধু কবিতা লেখে'।

একটি ছোট ছেলের প্রেমের বর্ণনা করতে গিয়ে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড লিখেছেন: 'যে রেস্তোরাঁয় আমরা লাঞ্চ খাই গত কয়েকদিন ধরে বছর আটেক বয়সের ছোট্ট একটি সুন্দর মেয়ে সেখানে আসছে। হান্স (৪·৬) অবশ্য সেখানেই তৎক্ষণাৎ তার প্রেমে পড়ে গেল। চোরা চাউনিতে মেয়েটিকে দেখার জন্য সে ক্রমাগত তার চেয়ারে বসে অন্যদিকে মাথা ঘোরায়, খাওয়া শেষ হলে সে মেয়েটির কাছাকাছি নিয়ে যায় নিজেকে যাতে তার সঙ্গে একটু রসালাপ করা যায়, কিন্তু সে যদি দেখে যে তাকে লক্ষ করা হচ্ছে, তা হলে আরক্ত হয়ে ওঠে। ছোট মেয়েটি যদি তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে, সে সঙ্গে সঙ্গে লাজুক মুখে অন্য দিকে তাকায়। রেস্তোরাঁয় যারা লাঞ্চ খায় তাদের সকলের কাছেই তার আচরণ স্বভাবতই বিরাট মজার ব্যাপার। প্রতিদিনই তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সে জিজ্ঞাসা করে: 'তোমার কি মনে হয় মেয়েটা আজ ওখানে থাকবে?' অবশেষে মেয়েটি যখন আসে, হান্স আরক্ত হয়ে ওঠে, এরূপ ক্ষেত্রে একজন বয়স্ক ব্যক্তির যেমন হত ঠিক তেমনিভাবে। একদিন সে উজ্জ্বল মুখে আমার কাছে এসে আমার কানে ফিসফিস করে বলল: 'বাবা, মেয়েটা কোথায় থাকে আমি জানি। অমুক জায়গায় তাকে আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দেখেছি।' বাড়িতে

ছোট মেয়েদের সঙ্গে সে আচরণ করে আক্রমণাত্মকভাবে, অথচ এই অন্য ব্যাপারটায় সে আবির্ভূত হয় এক প্লেটনিক ও কাতর গুণমুগ্ধের ভূমিকায়।

মেয়েটির প্রতি হৃদয়াবেগের দরুন হান্স যে অত্যুত্তেজিত দশায় পড়েছে, সেই দশায় তাকে ছেড়ে দিতে না চেয়ে আমি তাদের পরিচিত করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম, হান্সের দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা শেষ হওয়ার পর বাগানে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম মেয়েটিকে। মেয়েটির আসার সম্ভাবনায় হান্স এত উত্তেজিত উঠেছিল যে এই সর্বপ্রথম সে দুপুরে ঘুমোতে পারল না, বিছানায় অস্থিরভাবে ছটফট করতে লাগল। তার মা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'ঘুমোচ্ছ না কেন? তুমি কি মেয়েটির কথা ভাবছ?' তখন সে সুখের ভাব নিয়ে উত্তর দিল 'হ্যাঁ'।'*

শিশুর ভীরু ভাবাবেগের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই সঠিক ও মর্যাদাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। কোনো বিদ্রূপ বা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে প্রশ্রয় দেওয়ার উদ্ধত মনোভাব দেখানো চলবে না। শিশু প্রেমে পড়েছে এই অনুভূতিকে কখনই উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়; তার বদলে চেষ্টা করা উচিত সেই অনুভূতিকে অন্য এমন কিছুর দিকে চালিত করা যা তার ভাবাবেগ আর কল্পনাকে নতুন বলে দখল করবে। ভালোবাসা, বিবাহ আর শিশুর জন্ম সম্পর্কে

---

* Freud S. Analysis of a Phobia in a Five-Year-Old Boy, Case Histories I. 'Dora' and 'Little Hans'.— Harmondsworth: Penguin Books, 1977, pp. 181—182.

শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিগত কথাবার্তা থেকে শৈশব প্রেমকে আলাদাভাবে দেখতে হবে। উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে শিশুদের মতামতের মধ্যে প্রতিফলিত হয় মানুষের দৈনন্দিন জীবন আর স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে এক অবধারণাগত আগ্রহ।

দেহ বিষয়ে ভাবমূর্তি ও যৌন মনোভাব

শিশু যখন হঠাৎ অন্য লোকেদের দেহ আর নিজের দেহ সম্পর্কে আগ্রহী হতে শুরু করে, শিশুর তখনকার সাধারণ অবধারণাগত আগ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেহ বিষয়ে ভাবমূর্তি গঠন, লিঙ্গগত পরিচয়ের মনস্তত্ত্বে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। শিশুর নিজের লিঙ্গ বিষয়ে সচেতনতা তার আমি-ভাবমূর্তির কাঠামোটির একটি অংশ। শিশুকে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বলে দেয় 'তুমি ছেলে' বা 'তুমি মেয়ে', সেই শিশু এই অভিধাগুলিকে পুনরায় ব্যাখ্যা করে নেয় তার লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। ছোট শিশু তার দেহ আর যৌনাঙ্গ সম্পর্কে কৌতূহলের ব্যাপারে অপাপবিদ্ধ। একটু একটু করে বড় হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা অন্যদের সামনে পুরোপুরি পোশাক খুলে ফেলতে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। লজ্জাবোধটা সভ্যতার শিক্ষামূলক প্রভাবের ফল। বাইরের লোকেদের দৃষ্টি থেকে দেহকে রক্ষা করার এই স্বাভাবিক চাহিদাকে প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই মর্যাদা দেখাতে হবে এবং শিশুর লজ্জাবোধকে যথাসম্ভব অনাহত রাখতে হবে। নগ্ন মানবদেহ

সম্পর্কে মনোভাবটা ব্যাপক অর্থে শিশুর নৈতিক শিক্ষার একটা সমস্যা।

শিশুরা যে লিঙ্গের শারীরিক লক্ষণগুলি আঁকে, তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। শিশুরা পশু আর মানুষের ছবিতে কখনও কখনও জননেন্দ্রিয় আঁকে। তাদের জননেন্দ্রিয় উপস্থাপিত করার স্বাধীনতা নির্ভর করে প্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণ মানসিক গঠন এবং এই বিষয়ে তাদের মনোভাবের উপরে। গ্রামের শিশুরা এবং যে সব শিল্পী নগ্ন মডেল দেখে কাজ করেন তাঁদের শিশুসন্তানরা পশুদের জননেন্দ্রিয় আঁকে অবাধে। মেয়েদের চেয়ে ছেলেরাই বেশির ভাগ খোলাখুলিভাবে পশু আর মানুষের ছবিতে জননেন্দ্রিয় এঁকে থাকে। এর ব্যাখ্যা এই যে ছেলেরা তাদের লিঙ্গের শারীর ভাবমূর্তির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে। কিন্তু প্রাক্-স্কুল বয়সের অনেক শিশুই শুধু যে মানুষের শারীরিক আকৃতিতে কোনো পার্থক্য আছে বলে সন্দেহ করে না তাই নয়; এমন কি নিরাবরণ একটি মডেলের দিকে তাকিয়ে এই পার্থক্য তারা বুঝতে পর্যন্ত পারে না।

শিশুর নগ্ন মানবদেহ আঁকা কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়ার জন্য আমরা নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি চালিয়েছিলাম। শিশুদের একজন-একজন করে নগ্ন পুতুল আঁকতে বলা হয়েছিল মডেল (ছেলে ও মেয়ে) দেখে, যেগুলির শারীরিক আকৃতি ছেলের অথবা মেয়ের শারীরিক আকৃতির সঙ্গে মেলে।

একাধিক শিশু নগ্ন মডেল আঁকতে অস্বীকার করে,

কারণ তাদের মনে কোনো তৈরি ভাবমূর্তি ছিল না: 'পোশাক না পরা অবস্থায় আমি ওদের আঁকতে পারি না। পোশাক পরা অবস্থায় আঁকতে পারি। কোনো পোশাক অথবা ট্রাউজার্স পরা অবস্থায় আমি ওদের আঁকব' (সেরিওজা ক., ৫·০)। কোনো কোনো শিশু মডেল দেখে আঁকতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে লিঙ্গের লক্ষণগুলি লক্ষ করল না: ছেলে-পুতুল আর মেয়ে-পুতুল এই দুইয়ের মধ্যে রৈখিক উপস্থাপনায় কোনো পার্থক্য থাকল না। ওলেগ প. (৭·০): 'আমরা একটা মেয়ের মূর্তি বানালাম অল্প কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু সে পোশাক পরা ছিল। পোশাক না-পরা অবস্থায় থাকা মানে তো ওরা খুব ছোট, তাই না? ছেলেরা আর মেয়েরা অনেকখানি একই রকম। তাদের চুল কোঁকড়া, তারা হাসে। আপনি আমাকে একটা মেয়ের সঙ্গে একটা ছেলের তুলনা করতে বলছেন, ছেলেদের চোখ গাঢ় রঙের, আর মেয়েদের চোখ হয় হাল্‌কা রঙের। তাদের স্বভাবচরিত্র আলাদা: সত্যিকারের ব্যাটাছেলে কাঁদে না। আর কোনো তফাৎ আমি ভাবতে পারছি না।'

যৌন বিষয় যেখানে কখনই উল্লেখ করা হয় না সেই সব পরিবারে লালিত অনেক শিশুই এত 'সুরক্ষিত' থাকে যে একটা মডেল (পুতুল) তুলে নিয়ে যখন পরীক্ষা করে দেখা যায় এমন কি তখনও একটা নগ্ন মডেলের মধ্যে লিঙ্গের পার্থক্য বুঝতে পারে না। উপলব্ধি করা আর 'না-দেখা' একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; ছয় ও সাত বছরের শিশুরা উপলব্ধি করে যে তাদের একটি বিশেষ লিঙ্গভুক্ত

হওয়াটা অপরিবর্তনীয় এবং তারা তদনুযায়ী তাদের আচরণ মানিয়ে নিতে শুরু করে, কিন্তু এর সঙ্গে মূলত জড়িত থাকে আচরণের ধরাবাঁধা ছক, শারীরিক আকৃতি সম্পর্কে ধারণা নয়।

অন্য শিশুরা নিরাবরণ পুতুলগুলি — ছেলে ও মেয়ে — দেখে তৎক্ষণাৎ তাদের শারীরিক আকৃতিতে তফাৎটা লক্ষ করে। কোনো কোনো শিশু ছোট ছোট পুরুষদের আকার আঁকে, ছেলে বোঝাবার জন্য ছেলেদের বৈশিষ্ট্যসূচক অনুপুঙ্খগুলি জুড়ে দেয়। অন্যরা খাস মডেলটিরই দৃশ্যগতভাবে পৃথক করার মতো অনুপুঙ্খগুলি (কনুইয়ের ভাঁজ, হাঁটুর উপরকার টোল) অন্তর্ভুক্ত করে, লিঙ্গের লক্ষণগুলি বাদ না-দিয়ে জীবন থেকে ছবি আঁকার চেষ্টা করে।

এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে শিশুরা যত বড় হতে থাকে, একটা নগ্ন পুতুল দেখে প্রবল লজ্জার একটা অনুভূতি হতে শুরু করে তাদের বেশির ভাগের মধ্যেই। তারা গোপনে চাপা হাসি হাসতে শুরু করে, মুখ ঘুরিয়ে নেয় অথবা হাত দিয়ে চোখ ঢাকে। এই সব শিশু তাদের সামনে দেওয়া মডেল দেখে আঁকতে পুরোপুরি অস্বীকার করে।

আমাদের পরীক্ষায় দেখা যায় যে আজকের শিশুদের প্রায় সকলেই খুব কম বয়সেই (প্রায় ৩-৪ বছর) ছেলের বা মেয়ের বৈশিষ্ট্যসূচক শারীরিক চিহ্নগুলি জানে। সেই সঙ্গে, বহু শিশু নগ্ন দেহ সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্কদের মনোভাবকেও আত্মস্থ করে নেয়, নগ্ন দেহকে প্রাপ্তবয়স্করা

শিশুর কাছে এমন একটা কিছু বলে প্রতিভাত করান, যেটা লজ্জাজনক, যা নিয়ে কখনোই আলোচনা করা অনুচিত, এবং কথাবার্তায় যে প্রসঙ্গের অবতারণা কখনোই করা উচিত নয়।

মানবপ্রকৃতির সারমর্ম শিশুর কাছ থেকে গোপন করলে কিংবা পশু আর মানুষের যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তার কৌতূহলের জন্য তাকে তিরস্কার করলে একেবারে শুরু থেকেই যৌন সম্পর্কের প্রতি তার মনোভাব বিকৃত হয়।

অবশ্য, অন্য চরম প্রান্তে যাওয়াটাও উচিত নয়, অর্থাৎ, মানুষ আর পশুর যৌনাঙ্গগুলির প্রতি শিশুর মনোযোগ চালিত করা, এবং প্রাপ্তবয়স্কের যৌন জীবনে অসুস্থ কৌতূহল লালিত করা উচিত নয়।

নগ্ন মানবদেহের প্রতি মনোভাব হল শিশুর পরিবারে বিদ্যমান আচরণের ছক আর তার নিকটতম ব্যক্তিদের মনোভাবেরই ফল। প্রাপ্তবয়স্কদের তরফ থেকে উপযুক্ত নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত পথনির্দেশের মধ্য দিয়েই শিশু লিঙ্গগত পার্থক্য সম্বন্ধে এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে এক সুস্থ মনোভাব গড়ে তুলতে পারবে।

শিশুরা পিতামাতাদের ও শিক্ষকশিক্ষিকাদের নানা ধরনের প্রশ্ন করে লিঙ্গগত পার্থক্য সম্বন্ধে, শিশুরা কোথা থেকে আসে ইত্যাদি সম্বন্ধে, এবং অনেক শিশু এই সব বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। এই স্বাভাবিক কৌতূহল যথাযথভাবে চরিতার্থ করতে হবে প্রাপ্তবয়স্কদের। তাই শিশুদের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলির উত্তর আগে থেকেই তৈরি

করে রাখা, এবং ভাবাবেগগত কোনো চাপ বা স্পষ্টগোচর কোনো বিব্রতভাব ছাড়াই শান্তভাবে উত্তর দেওয়া উচিত। প্রাপ্তবয়স্ককে সমস্যাটা গ্রহণ করতে হবে গুরুত্বসহকারে, নৈতিক শিক্ষার সমস্যা হিসেবে। পিতামাতাদের অবশ্যই অস্বস্তি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে, বুঝতে হবে এই বিষয়টায় তাঁরা যদি লজ্জাবোধ করেন অথবা ভয় পান, তাহলে সেই লজ্জা আর সেই ভয়কে তাঁরা সঞ্চারিত করে দেবেন তাঁদের সন্তানদের মধ্যেও। শিশুদের কাছ থেকে 'অস্বস্তিকর' প্রশ্নগুলির সঙ্গে, বিশেষত একেবারে গোড়ার দিকে, জড়িত থাকে ঠিক সেই ধরনেরই অনুসন্ধিৎসা, যেগুলির সঙ্গে যৌন-সংক্রান্ত বিষয়ের কোনোই সম্পর্ক নেই। এটা পরিষ্কারভাবে বুঝলে পিতামাতার ভাবাবেগগত চাপটা প্রশমিত হয় এবং তাঁরা শিশুদের প্রশ্নগুলির জবাব দিতে পারেন শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে, অস্বস্তি বা বিরক্তি ছাড়া। লিঙ্গ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্তবয়স্কদের অস্বস্তি বা বিরক্তি শিশুকে প্রতিহত করে, বিশ্বাসযোগ্য, অশ্লীলতা-বিকৃত নয় এমন তথ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করে, সে সাধারণভাবে প্রশ্ন করাই এড়িয়ে চলে, এইভাবে শুরু হয়ে যায় পিতামাতার কাছ থেকে অল্পবয়সেই অকালে বিচ্ছিন্নতা। লিঙ্গ সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনাটা হওয়া উচিত জ্ঞাতব্য বিষয় জানানো ধরনের, কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রাপ্তবয়স্কের যাকিছু জানা আছে সে সবই শিশুকে বলতে হবে।

নিজেদের যৌনাঙ্গের ও বিপরীত লিঙ্গের শিশুদের যৌনাঙ্গ সম্পর্কে শিশুদের সংবন্ধন নিয়ে এবং তার

ফলস্বরূপ একই বয়সের শিশুদের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল নিয়ে বিশেষ অধ্যয়ন চালানো হয়েছে। মোটামুটি ছয় বছর বয়স থেকে মেয়েদের মধ্যে তারা যাদের সঙ্গে খেলছে সেই শিশুদের কাছে নিজেদের যৌনাঙ্গ দেখাবার একটা আকাঙ্ক্ষা দেখা দিতে পারে। মনে হয় এর উদ্ভব নিজের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার, এবং স্ত্রী লিঙ্গের অন্তর্গত একজন হিসেবে সেটা করার অচেতন বাসনা থেকে। ঠিক ছয় বছর বয়সেই আমাদের চেনা একটি মেয়ে তার সমবয়স্ক ছেলেদের সামনে অনুরূপ প্রদর্শন করেছিল।

চারজন শিশু — আলিওনা, কিরিউশা, আন্দ্রিউশা আর মারিনা — ঝোপেঝাড়ে ছুটোছুটি করছিল। একটা খোলা মঞ্চে চড়ে তারা পরিচিত রূপকথাগুলির চরিত্রাভিনয় করতে শুরু করল। হঠাৎ কিরিউশা ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৃঢ় পায়ে চলে এল আমার কাছে: 'মা, আমি মারিনার সঙ্গে খেলব না। ও ওর প্যাণ্ট খুলে ফেলেছিল, লাফালাফি করছিল কিছু না পরে। ও বোকা।'

আন্দ্রিউশা এসে হাজির হল: 'আমি জানি তোমরা কী কথা বলছ!'

'তুই তো খুব খুশি হচ্ছিলি!

আন্দ্রিউশা: 'না। আমি... আমি দুঃখিত হচ্ছিলাম।'

তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিটা সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারছি না। সেটা ছিল খুবই জটিল ধরনের। যা ঘটেছে সে সম্পর্কে কী মনে করা উচিত তা সে বুঝতে পারছিল না।

মারিনা দ্বিধাগ্রস্তভাবে উঁকি দিল, আমি তাকে আমার

কাছে আসতে বললাম। আমরা কথা বললাম শান্তভাবে। মারিনাও বুঝতে পারছে না, যা ঘটেছে সেটাকে কীভাবে দেখা উচিত।

সাধারণত, শিশুদের মধ্যে মাঝে মাঝে যৌন বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেলে প্রাপ্তবয়স্কদের সঠিক আচরণ অবাঞ্ছনীয় যৌন অভ্যাসের উদ্ভব রোধ করতে পারে সহজেই। হস্তমৈথুন করার সময়ে শিশু জানে না সে কী করছে: উত্তেজনা তাকে আলোড়িত করছে, কিন্তু স্বমেহনের নৈতিক মূল্যায়ন সম্পর্কে সে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত। শিশুকে এই ক্রিয়ায় রত অবস্থায় লক্ষ করেছে এমন প্রাপ্তবয়স্কদের দিক থেকে দমনপীড়ন শিশুকে হতবিহবল করে দেয়, এবং তার মর্যাদার প্রচন্ড ক্ষতি করে এবং মর্যাদাহানি ঘটায়। শিশু এর ফলে অনুভব করতে পারে যে সে আশাতীতভাবে মন্দ, এবং এইভাবেই তার মনের গুরুতর ক্ষতি হয়। প্রাপ্তবয়স্ককে শান্তভাবে এই সমস্ত ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যাতে শিশুর যৌন সংক্রান্ত আগ্রহ মানুষের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সরিয়ে নেওয়া যায়। শরীরের ক্রিয়ার প্রতি, শিশুর নগ্ন দেহের প্রতি ও তার জননেন্দ্রিয়ের প্রতি স্বাভাবিক মনোভাবই হল যৌন বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যাপারে একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

অধ্যায় ৮। আচরণের প্রেষণার বিকাশ ও আত্ম-সচেতনতা গঠন

শিশুর আচরণের প্রেষণা প্রাক্-স্কুল শৈশবকালের মধ্যেই আমূল পরিবর্তিত হয়। প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু (৩-৪ বছর) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাজ করে যেমন যে করত অতি শৈশবে — নির্দিষ্ট মুহূর্তে জাগ্রত অনুভূতি ও বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং অতি ভিন্ন ভিন্ন কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে, কোন কারণে যে এক বিশেষভাবে আচরণ করছে সে বিষয়ে সে স্পষ্টতই অনবহিত থাকে। একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের (৫-৭ বছর) শিশুর আচরণ অনেক বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। বহু ক্ষেত্রেই সে রীতিমত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বুঝিয়ে বলতে পারে কেন এক বিশেষ ক্ষেত্রে সে একভাবে আচরণ করেছে, অন্যভাবে নয়।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর মধ্যে আচরণের প্রেষণার সারমর্ম

বিভিন্ন বয়সের শিশুর করা একই ক্রিয়ার একেবারে ভিন্ন ভিন্ন প্রেষণা থাকে প্রায়শই। তিন বছর বয়সের শিশু খাবারের টুকরো ছুঁড়ে দেয় মুরগীর দিকে, যাতে

সে সেগুলিকে ছুটোছুটি করে ঠুকরে খেতে দেখতে পারে; আর ছয় বছর বয়সের শিশু তা করে তার মাকে ঘর-গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করার জন্য।

এর পাশাপাশি, নানান ধরনের প্রেষণা আলাদা করে বেছে নেওয়া যায়, যেগুলি সামগ্রিকভাবে প্রাক্-স্কুল বয়সের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক, এবং শিশুদের আচরণের উপরে যেগুলির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। প্রথমত, সেই সমস্ত প্রেষণা প্রাপ্তবয়স্কদের জগৎ সম্পর্কে শিশুদের আগ্রহের সঙ্গে ও প্রাপ্তবয়স্কদের মতো কাজ করার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যেগুলি জড়িত। একজন প্রাপ্তবয়স্কের মতো হওয়ার বাসনা শিশুকে ভূমিকাভিনয়ে নিয়ন্ত্রণ করে। দৈনন্দিন আচরণে একটি শিশুকে দিয়ে কোনো অনুরোধ পালন করাবার একটা উপায় হিসেবে এই বাসনাকে প্রায়শই কাজে লাগানো যেতে পারে। 'তুমি তো এখন বড় ছেলে, আর বড় ছেলেরা তো নিজে-নিজে জামা-কাপড় পরে', শিশুকে নিজেই কতকগুলি কাজ করতে উদ্দীপ্ত করার জন্য আমরা তাকে বলি। 'বড়রা কাঁদে না', একজন শিশুর কান্না ঠেকিয়ে রাখার জন্য একটা জোরালো যুক্তি।

আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রেষণা শিশুদের আচরণে নিয়তই প্রকাশ পায়, সেগুলি হল খেলাটিরই প্রক্রিয়ার আগ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খেলার প্রেষণা। ক্রীড়ামূলক কাজকর্ম আয়ত্ত করার সময়ে এই প্রেষণাগুলি দেখা দেয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মতো কাজ করার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার মধ্যে পরস্পরবিজড়িত থাকে। ক্রীড়ামূলক কাজকর্মের

গণ্ডী পেরিয়ে সেগুলি শিশুর সমগ্র আচরণকেই বেষ্টন করে এবং প্রাক্-স্কুল শৈশবের অনন্য, বিশেষ চরিত্র সৃষ্টি করে। যেকোনো কাজকে শিশু একটা খেলায় পরিণত করতে পারে। প্রায়শই, প্রাপ্তবয়স্করা যখন ভাবে যে একটি শিশু কোনো গুরুগম্ভীর কাজ করছে, কিংবা অধ্যবসায় সহকারে কিছু শিখছে, তখন সে নিজের জন্য এক কাল্পনিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিয়ে বস্তুতপক্ষে খেলছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় শিশুদের বলা হয়েছিল চারটি ছবি থেকে — একজন লোক, একটা সিংহ, একটা ঘোড়া আর একটা টানা-গাড়ির ছবির মধ্য থেকে 'যেটা বেমানান' সেটাকে বেছে নিতে। শিশুদের মনে হয়েছিল যে সিংহটা বেমানান, তারা তাদের বেছে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিল এইভাবে: 'লোকটা গাড়ির সঙ্গে ঘোড়াটাকে জুতে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাবে, তাই সিংহ তার কী জন্য দরকার? সিংহটা তাকে আর ঘোড়াটাকেও খেয়ে ফেলতে পারে। এটাকে চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।'

প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে ও অন্য শিশুদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন ও তা রক্ষা করা প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর আচরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চারপাশের লোকেদের কাছ থেকে অনুকূল মনোভাব শিশুর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শিশুর আচরণের অন্যতম মূল প্রেষণা হল প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে স্নেহ, অনুমোদন আর প্রশংসা পাওয়ার বাসনা। এই বাসনা থেকেই শিশুর অনেক কাজকর্মের ব্যাখ্যা মেলে। প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে ভালো

সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা শিশুকে বাধ্য করে তাদের মতামত ও মূল্যায়নকে গণ্য করতে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত আচরণ বিধি মেনে চলতে।

সমবয়সী অন্য শিশুদের সঙ্গে শিশু যতই সংযোগ গড়ে তুলতে শুরু করে, তার প্রতি তাদের মনোভাব তার কাছে তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিন বছর বয়স্ক একটি শিশু যখন প্রথম একটি কিণ্ডারগার্টেনে যায়, অন্য শিশুদের লক্ষ করতে তার বেশ কয়েক মাস লেগে যেতে পারে, সে এমন আচরণ করতে পারে যেন তাদের অস্তিত্বই নেই। সে যদি নিজে বসতে চায় তো আরেকটি শিশুর কাছ থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এটা পরে বদলে যায়। সম্মিলিত কাজকর্ম আর একটা শিশুসমাজ গঠিত হওয়ার ফলে তার সমবয়স্কদের অনুমোদন আর ভালোবাসা পাওয়াটা তার আচরণের অন্যতম চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে। শিশুরা সমবয়সী অন্য যেসব শিশুদের পছন্দ করে এবং যারা সেই দলটির ভিতরে প্রিয় তাদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে থাকে।

আত্মসম্মান আর আত্মসাম্মুখ্যের প্রেষণা গড়ে ওঠে প্রাক্-স্কুল শৈশবে: তার যাত্রাবিন্দুটি হল অতি শৈশব আর প্রাক্-স্কুল বয়সের মধ্যেকার সেই সীমারেখাটি যখন শিশুরা অন্যদের কাছ থেকে নিজেদের পৃথক করতে শুরু করে এবং প্রাপ্তবয়স্ককে দেখে আচরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে। প্রাপ্তবয়স্করা শুধু যে কাজ করতে যায়, শিশু শ্রদ্ধার চোখে দেখে এমন সব ধরনের কাজ করে এবং নিজেদের

মধ্যে নানান সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তাই নয়, তারা শিশুকে শিক্ষাদানও করে, তার কাছ থেকে অনেক কিছু দাবি করে এবং সেইসব দাবি যাতে পূরণ হয় তা দেখে। শিশু কামনা করতে শুরু করে যে অন্যরা তার কথা শুনুক, তাকে মর্যাদা দিক, তার প্রতি মনোযোগ দিক এবং তার ইচ্ছা পালন করুক।

আত্মসাম্মুখ্যের আকাঙ্ক্ষার একটি রূপ হল শিশুর এই দাবি যে খেলাধুলোয় সে-ই প্রধান ভূমিকাগুলি পালন করবে। ইঙ্গিতমূলক বিষয় এই যে শিশুরা সাধারণত শিশুদের ভূমিকা পালন করতে চায় না। একজন প্রাপ্তবয়স্কের ভূমিকা অনেক বেশি আকর্ষণীয়, কেননা তার সঙ্গে থাকে মর্যাদা আর কর্তৃত্ব।

তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে আত্মসাম্মুখ্যের রূপটা হয় এই রকম: তারা তাদের জানা সমস্ত সদর্থক গুণগুলি নিজেদের প্রতি আরোপ করে, প্রকৃতপক্ষেই সেগুলি আছে কিনা তা বিচার করে না, এবং নিজেদের সাহস, শক্তি প্রভৃতিকে অতিরঞ্জিত করে। তার গায়ে জোর আছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করলে শিশু জবাব দেবে যে নিশ্চয়ই তার গায়ে খুব জোর আছে, এমন কি 'একটা হাতিও' সে উঠিয়ে নিতে পারে।

কোনো কোনো অবস্থায়, আত্মসাম্মুখ্যের আকাঙ্ক্ষার ফলে নেতিবাচক বহিঃপ্রকাশ দেখা দিতে পারে খামখেয়ালিপনা আর একগুঁয়েমির রূপে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের খামখেয়ালিপনা প্রায় তিন বছর বয়সকালে অনেক শিশু যে নেতিবাচকতার পরিচয় দেখায়

তার কথা প্রবলভাবে মনে করিয়ে দেয়, এবং এগুলি হল শিশুর প্রতি বেঠিক মনোভাবের ফল। কিন্তু শিশু যেখানে তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে সেই 'সংকটপূর্ণ' আচরণের থেকে এই সমস্ত 'খামখেয়ালিপনা'-র রূপ মনোগত দিক দিয়ে পৃথক। খামখেয়ালিপনা হল সকলের মনোযোগ আকর্ষণের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের উপরে 'প্রাধান্য লাভের' একটা উপায়। সাধারণত অপেক্ষাকৃত দুর্বল, উদ্যমহীন শিশুরাই, যারা নিজেদের আত্মসাম্মুখ্যের আকাঙ্ক্ষা, বিশেষত তাদের সমবয়স্কদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অন্য কোনোভাবে চরিতার্থ করতে অক্ষম, তারাই খেয়ালি হয়।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে গঠিত হয় নতুন নতুন ধরনের প্রেষণা, শিশুর কাজকর্মের ক্রমবর্ধমান জটিলতার সঙ্গে যেগুলি সংশ্লিষ্ট। অবধারণাগত ও প্রতিযোগিতামূলক প্রেষণা পড়ে এই বর্গের মধ্যে।

তিন বা চার বছর বয়স থেকেই শিশু তার চারপাশের লোকেদের এই ধরনের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে পারে: 'ওটা কী?'; 'কিন্তু কীভাবে?'; 'কিসের জন্য?'; 'কেন?' ইত্যাদি। পরে 'কেন?' প্রশ্নটিই প্রাধান্যশালী হয়ে ওঠে। শিশুরা প্রায়শই শুধু যে প্রশ্ন করে তাই নয়, যেটা পরিষ্কার নয় তা ব্যাখ্যা করার জন্য নিজেদের সীমিত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে নিজেরাই উত্তরটা বার করতে চেষ্টা করে, কখনও কখনও এমন কি 'পরীক্ষানিরীক্ষাও' চালায়। একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হল খেলনা খুলে ফেলে 'ভিতরে কী আছে' তা জানার জন্য শিশুদের প্রিয় বাসনা।

এই ঘটনাগুলিকে প্রায়শই প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের বৈশিষ্ট্যসূচক অনুসন্ধিৎসার লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু শিশুদের প্রশ্নগুলিতে সবসময়েই যে তাদের অবধারণাগত আগ্রহ, বা চার পাশের জগৎ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞাতব্য বিষয় জানার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, এমন নয়। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা যখন প্রশ্ন করে, তখন তারা চেষ্টা করে প্রাপ্তবয়স্কের মনোযোগ আকর্ষণ করতে, তার সঙ্গে আদান-প্রদান উদ্দীপ্ত করে তুলতে এবং অভিজ্ঞতার ভাগ নিতে। প্রায়শই শিশুরা তাদের প্রশ্নের জবাবের জন্য অপেক্ষা করে না, কিংবা উত্তরগুলি পুরোপুরি শোনে না, বরং প্রাপ্তবয়স্ককে বাধা দেয় নতুন নতুন প্রশ্ন করে। তবে ক্রমে ক্রমে, যেসমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুকে শেখায় এবং নানান ধরনের জ্ঞান দেয় তাদের প্রভাবে, শিশু তার পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে এবং নতুন কিছু খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা একজন প্রাপ্তবয়স্কের ব্যাখ্যা পুরোপুরি শোনে তখনই, যখন খেলার জন্য, ছবি আঁকার জন্য অথবা অন্য কোনো হাতে-কলমে কাজের জন্য তথ্যগুলি তাদের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ব্যাপারের কারণ অনুমান করার চেষ্টা অথবা তাদের শিশুসুলভ 'পরীক্ষানিরীক্ষাগুলিও' সাধারণত ব্যবহারিক কাজকর্মের সময়ে উদ্ভূত অসুবিধাগুলির সঙ্গে যুক্ত। শিশু প্রাক্-স্কুল বয়সের উঁচুর দিকে গেলে তবেই শেখার ব্যাপারে

আগ্রহটা তার কাজকর্মের এক স্বতন্ত্র প্রেষণা হয়ে ওঠে এবং তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।

তিন বা চার বছর বয়সের শিশু তার সমবয়স্ক শিশুদের কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের কৃতিত্বের তুলনা করে না। আত্মসাম্মুখ্যের আকাঙ্ক্ষা আর প্রাপ্তবয়স্কের অনুমোদন লাভের বাসনা অপরের চেয়ে ভালো একটা কিছু করার চেষ্টার মধ্যে প্রকাশ পায় না, তা প্রকাশ পায় নিজের প্রতি ইতিবাচক গুণাবলী আরোপ করার মধ্যে অথবা এমন কিছু করার মধ্যে যা প্রাপ্তবয়স্কের প্রশংসা লাভ করে। প্রাক্-স্কুল বয়সের কয়েকজন শিশুকে একটা শিক্ষাদায়ক খেলায় অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছিল এবং তাদের বোঝানো হয়েছিল যে বিজয়ী শিশুটি একটা খেলনা পাবে পুরস্কার হিসেবে। তারা সমস্ত কাজটা পালাক্রমে (খেলার নিয়মে যেমন বলা ছিল) না করে সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করেছিল, এবং নিজেদের সঠিক উত্তরটি জানা থাকলে অন্যদের বলে দেওয়া থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি। আর খেলনাটির ব্যাপারে, প্রত্যেক শিশুও সেটি দাবি করেছিল, সেই শিশুটির ফল যাই হোক না কেন।

একই বয়সের শিশুদের সঙ্গে সম্মিলিত কাজকর্মের বিকাশের ফলে, বিশেষত যেসমস্ত খেলার সঙ্গে কতকগুলি নিয়ম জড়িত, আত্মসাম্মুখ্যের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে গঠিত হয় এক নতুন ধরনের প্রেষণা — জয়লাভের বাসনা, প্রথম হওয়ার বাসনা প্রাক্-স্কুল বয়সের মাঝামাঝি ও উপরের দিকের শিশুদের জন্য টেবিলে বসে খেলার মতো প্রায় সমস্ত খেলা এবং অন্যান্য

অনেক খেলার সঙ্গেই প্রতিযোগিতা জড়িত, এবং কতকগুলির নামও রীতিমত সুস্পষ্ট: 'কে সবচেয়ে চটপটে?', 'কে বেশি তাড়াতাড়ি পারে?', 'কে প্রথম?' ইত্যাদি। প্রাক্-স্কুল বয়সের উপরের দিকের শিশুরা এমন কি যে সব কাজে এমনিতে কোনো প্রতিযোগিতামূলক বিষয় নেই তার মধ্যেও প্রতিযোগিতামূলক প্রেষণা প্রবর্তিত করে। শিশুরা নিয়তই তাদের সাফল্যগুলি তুলনা করে, একটু বড়াই করতে ভালোবাসে, এবং ব্যর্থতায় কষ্টভোগ করে।

যে সমস্ত নৈতিক প্রেষণায় অপরের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক অভিব্যক্ত হয়, আচরণগত কারণগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেষণাগুলি গড়ে ওঠে প্রাক্-স্কুল শৈশবে, নৈতিক মানগুলি আয়ত্ত করা ও উপলব্ধি করার সঙ্গে, তথা অপরের কাছে তাদের ক্রিয়ার অর্থ কী দাঁড়ায় তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে। গোড়ায়, সর্বজনস্বীকৃত আচরণের নিয়ম মেনে চলাটা প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে, যারা এটা দাবি করে তাদের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক রক্ষা করার একটা উপায়মাত্র। কিন্তু ভালো আচরণের জন্য শিশু যে অনুমোদন, স্নেহ ও প্রশংসা পায়, তা তাকে দেয় সুখকর অভিজ্ঞতা, নিয়ম মেনে চলাটাই ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে ইতিবাচক ও অবশ্যপালনীয়। প্রাক্-স্কুল বয়সের ছোট শিশুরা নৈতিক মান অনুযায়ী আচরণ করে শুধু সেই সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশুর সঙ্গে, যাদের তারা পছন্দ করে। শিশু তার সমবয়সী অন্য যেসব শিশুকে পছন্দ করে তার সঙ্গে নিজের খেলনা বা ক্যান্ডি ভাগ করে নেয়। প্রাক্-স্কুল

বয়সের একটু বড় শিশুদের ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণ প্রসারিত হতে শুরু করে এমন সব লোকজনের এক ব্যাপকতর পরিধিতে যাদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করা কেন উচিত নয়, এই প্রশ্ন করলে চার বছর বয়স্ক শিশু জবাব দেবে: 'কক্ষনো মারামারি করা ঠিক না, কেননা কারও চোখে লেগে যেতে পারে' (অর্থাৎ শিশু জোর দেয় তার ক্রিয়ার অপ্রিয় পরিণতির উপরে, ক্রিয়াটির উপরে নয়), কিন্তু প্রাক্-স্কুল কালপর্বের শেষ দিকে পাওয়া যাবে অন্য ধরনের উত্তর: 'বন্ধুদের সঙ্গে কক্ষনো মারামারি করা উচিত নয়, কেননা তাদের গায়ে ব্যথা দিতে লজ্জা হয়।'

সামাজিক প্রেষণাগুলি — অপরের জন্য কিছু করার বাসনা, তাদের কাজে লাগার বাসনা — আরও প্রকট হতে শুরু করে আচরণগত প্রেষণায়। প্রাক্-স্কুল বয়সের বহু ছোট শিশুই অপরদের সন্তুষ্ট করার জন্য একটি সরল কাজ সম্পন্ন করতে পারে, যেমন প্রাপ্তবয়স্কের পরিচালনাধীনে মা বা ভাইদের জন্য একটা সরল উপহার-সামগ্রী তৈরি করা। কিন্তু এর জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে শিশুটি তার কাজের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছে। প্রাপ্তবয়স্ককে তাই শিশুর মনে এই বিষয়ে রেখাপাত করতে হবে যে তার উপহারটি পেলে তার মা দারুণ খুশি হবে।

বেশ কিছু পরে, চার বা পাঁচ বছর বয়সে, শিশুরা তাদের নিজেদের উদ্যোগে অন্যদের জন্য কিছু করতে শুরু করে। এই সময়ের মধ্যেই তারা বুঝতে শেখে যে তাদের কাজকর্ম

তাদের কাছের লোকেদের উপকারে লাগতে পারে। প্রাক্-স্কুল বয়সের ছোট শিশুদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় প্রাপ্তবয়স্করা কিছু একটা করতে বললে সে কাজটা তারা করে কেন, তখন তারা সাধারণত জবাব দেয়: 'আমার ভালো লাগে' অথবা 'মা আমাকে করতে বলেছে'। একই প্রশ্নে একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা জবাব দেয় ভিন্নভাবে: 'আমি সাহায্য করছি, কেননা দিদিমা আর মায়ের পক্ষে একা-একা করা কষ্ট'; 'মাকে আমি ভালোবাসি, তাই তাকে সাহায্য করি'; 'মাকে সাহায্য করার জন্য আর সবকিছু কীভাবে করতে হয় তা জানার জন্য'।

প্রাক্-স্কুল নানা বয়সের শিশুরা সেই সব খেলাতেও ভিন্নরূপ আচরণ করে যে খেলায় দলের সাফল্য নির্ভর করে প্রতিটি সদস্যের ক্রিয়ার উপরে। তিন ও চার বছর বয়সী শিশুরা সাধারণত শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত সাফল্যেরই কথাই চিন্তা করে, আর একটু বড় শিশুরা চেষ্টা করে দলের সাফল্য নিশ্চিত করতে।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে আচরণগত প্রেষণায় পরিবর্তনটা শুধু তার পরিবর্তিত অন্তর্বস্তু আর নতুন নতুন ধরনের প্রেষণার আবির্ভাবই নয়; তা ছাড়াও কিছু কিছু প্রেষণা শিশুর কাছে অন্যান্য প্রেষণার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের ছোট শিশুর আচরণ অনিশ্চিত, তার কোনো মূল গতিমুখ বা কেন্দ্রী অংশ নেই। যে শিশু এইমাত্র তার বন্ধুকে তার ক্যান্ডির ভাগ দিয়েছে, সে-ই আবার তখনই তার কাছ থেকে একটা খেলনা কেড়ে নেয়। আরেকজন উৎসাহভরে তার মাকে ঘর গোছগাছ করতে

সাহায্য করবে, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই বদখেয়ালি হয়ে উঠবে, নিজে জামা-কাপড় পরতে অস্বীকার করবে। এটা হল একটা প্রেষণার জায়গায় আরেকটা প্রেষণার আসার ফল, এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন সাপেক্ষে আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রথমে একটি প্রেষণা দিয়ে, তার পরেই আরেকটি প্রেষণা দিয়ে।

প্রাক্-স্কুল শিশুর ব্যক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে সমন্বয়-সাধক প্রেষণাগুলি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নতুন উপাদান। ধাপে ধাপে ক্রমবর্ধমান প্রেষণাগুলি তার সমগ্র আচরণকে একটা নির্দিষ্ট গতিমুখ দেয়। এই সোপানতন্ত্র বিকশিত হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শুধু কাজেরই নয়, সামগ্রিকভাবে তার আচরণেরও ভালো বা মন্দ বিচার করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সামাজিক প্রেষণাগুলি আর নৈতিক মান মেনে চলা যদি প্রাধান্যশালী হয়, তা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি শিশুর ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করবে, এবং সে এমন কোনো বিপরীত প্ররোচনার শিকার হবে না যা কাউকে আঘাত দিতে পারে, অথবা তাকে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করতে পারে। বিপরীতপক্ষে, যে সমস্ত প্রেষণার প্রাধান্য শিশুকে ব্যক্তিগত সন্তোষ লাভ করা অথবা অপরের তুলনায় নিজের বাস্তব বা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করতে উদ্বুদ্ধ করে, সেগুলির ফলে আচরণের স্বীকৃত নিয়মগুলি গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত হতে পারে। এখানে দরকার বিশেষ শিক্ষামূলক ব্যবস্থাবলী, শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতিকূলভাবে বিকাশমান বনিয়াদ পুনর্নির্মিত করার ব্যবস্থা। স্বভাবতই, প্রেষণাগুলিকে একবার সমন্বিত করতে শিখলে শিশু যে

সমস্ত অবস্থায় একই প্রস্ত প্রেষণার দ্বারা চালিত হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রাপ্তবয়স্করাও তা হয় না। নানা ধরনের সব প্রেষণা আছে, যে কোনো ব্যক্তির আচরণেই যা লক্ষ করা যায়। কিন্তু সমন্বয় ঘটলে, এই বহুবিচিত্র প্রেষণাগুলি তাদের সমতা হারিয়ে একটা প্রণালী হয়ে ওঠে। শিশু কোনো আকর্ষণীয় খেলায় যোগ দেবে না বলেও স্থির করতে পারে, তার মতে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ — যদিও হয়তো আরও একঘেয়ে — কাজের খাতিরে, যে কাজটা কোনো প্রাপ্তবয়স্কের অনুমোদিত। শিশু যদি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে ব্যর্থতা ভোগ করে, তবে 'অন্য কোনো কাজ' থেকে অর্জিত কোনো সন্তোষ তার ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে শিশুটি তাকে যা করতে বলা হয়েছিল সেটা ঠিকমতো করতে না পারলেও চমৎকার ছেলে বলে প্রশংসিত হয়েছিল, এবং বাকি সব শিশুর মতো তাকে একটি ক্যান্ডিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরস্কারটা সে নিয়েছিল কোনোরূপ সন্তোষ ছাড়াই, তার ক্ষোভ কোনোমতেই লাঘব হয় নি: সে অপারগ হয়েছে বলে, তার পাওয়া ক্যান্ডিটা ছিল 'তেতো'।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের মধ্যে আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-মূল্যায়ন

প্রাক্-স্কুল বয়সে শিশু প্রেরণাদায়ক শক্তিগুলি সম্পর্কে ও সে যা করে তার পরিণতি সম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে। এটা সম্ভব হয় তার আত্ম-

সচেতনতা আর সে কী সেই বিষয়ে বোধ বিকশিত হওয়ার, সে কোন কোন গুণের অধিকারী, তার চারপাশের লোকেরা তাকে কী চোখে দেখছে, তাদের মনোভাব কিসের দ্বারা গঠিত হয় সেগুলি জানার ফলে। শিশু সক্ষম হয়ে ওঠে নিজের মূল্যায়ন করতে, নিজের কৃতিত্ব, ব্যর্থতা আর সহায়-সামর্থ্যের মূল্যায়ন করতে।

আত্ম-সচেতনতা বিকাশের একটি পূর্বশর্ত হল অপরের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করা, এটা ঘটে অতি শৈশবকালের শেষে। কিন্তু সে যখন প্রাক্-স্কুল বয়সে এসে পেঁছয়, তখন উপলব্ধি করে শুধু এই ঘটনাটা যে সে আছে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে নিজের সম্পর্কে বা নিজের গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানে না। কম বয়সের শিশু যখন প্রাপ্তবয়স্ককে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে তখন সে তার নিজের ক্ষমতা-সম্ভাবনাকে গণ্য করে না। তিন বছর বয়সী শিশুদের সংকটের পর্যায়ে এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

প্রাক্-স্কুল বয়সের ছোট শিশুর নিজের সম্পর্কেও কোনো সুপ্রতিষ্ঠ ও সঠিক চিত্র থাকে না, প্রাপ্তবয়স্কদের অনুমোদিত সমস্ত ইতিবাচক গুণ নিজের প্রতি আরোপ করে শুধু, প্রায়শই এমন কি জানেও না সেই গুণগুলি আসলে কী। একটি ছেলে দাবি করেছিল যে সে পরিচ্ছন্ন, তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল তার মানে কী, তখন সে উত্তর দিয়েছিল: 'আমি ভয় পাই না'। অন্য শিশুরা, এরাও তাদের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে গর্বিত, জবাবে বলেছিল: 'জানি না'।

সঠিকভাবে নিজের মূল্যায়ন করতে শেখার জন্যে শিশুকে শিখতে হবে অন্যদের, যাদের প্রতি সে 'বাইরে' থেকে দৃষ্টিপাত করতে পারে তাদের মূল্যায়ন করতে। আমরা দেখেছি, এটা সঙ্গে সঙ্গে ঘটে না। সমবয়স্কদের মূল্যায়ন করার সময়ে শিশু শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের প্রকাশিত মতেরই পুনরাবৃত্তি করে। তার আত্ম-মূল্যায়ন সম্পর্কেও ঠিক এই কথাটাই সত্যি ('আমি ভালো, কেননা মা তাই বলে')। কিন্তু নিজের প্রতি ভাবাবেগগতভাবে এক ইতিবাচক মনোভাবই প্রাধান্য পায় তার আত্ম-মূল্যায়নে। 'আমি ভালো!' হল শিশুর আভ্যন্তরিক অবস্থা। 'আমি ভালো, এটাই আসল কথা!' এই হল একজন প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে শিশুর অবস্থান, যে প্রাপ্তবয়স্ক শিশুটির কোনো কাজ সম্পর্কে অপছন্দ প্রকাশ করার চেষ্টা করে। শিশুর নিজের প্রতি এই অবস্থানটা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে: শিশুর ইতিবাচক আত্ম-মূল্যায়ন ব্যক্তিত্বের ভিত্তি সৃষ্টি করে, এবং তার দ্বারাই নানা ধরনের অভিঘাত ও গুরুত্বের প্রভাবের ব্যাপারে ব্যক্তিত্বকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে। প্রাপ্তবয়স্ককে অবশ্যই শিশুর ইতিবাচক আত্ম-মূল্যায়নের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে এবং এই সাধারণ অবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। অপ্রিয় সংঘর্ষ যখন বাধে, তখন এই অবস্থানটা গ্রহণ করাই সঠিক: 'তুমি অবশ্য ভালো, কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই...' কিংবা এই ধরনের কিছু।

অন্যদের সম্পর্কে, তাদের আচরণ ও গুণাবলী সম্পর্কে শিশুর স্বাধীন মূল্যায়ন নির্ভর করে তাদের প্রতি তার

মনোভাবের উপরে। রূপকথা আর গল্পের চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তার মূল্যায়নে এটা বিশেষভাবে দেখা যায়। একজন 'ভালো' সদর্থক নায়ক যা কিছু করে তারই মূল্যায়ন করা হয় ভালো বলে, আর একজন 'মন্দ' নায়ক যা কিছু করে তা খারাপ বলে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে চরিত্রগুলির ক্রিয়া ও গুণগুলির মূল্যায়ন সেগুলির প্রতি সাধারণ মনোভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, গড়ে উঠতে শুরু করে পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং এই সমস্ত ক্রিয়া ও গুণাগুণের তাৎপর্য সম্পর্কে বোধ থেকে।

শিশু প্রচলিত রীতি আর আচরণের নিয়ম মেনে নিতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিই হয়ে ওঠে সেই পরিমাপ, যেগুলি সে প্রয়োগ করে অপরদের সম্পর্কে তার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই মানদণ্ডগুলি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা তার পক্ষে অনেক বেশি কঠিন। যেসব অভিজ্ঞতা শিশুকে উত্তেজিত করে এবং তাকে কোনো কোনো কাজ করতে উৎসাহিত করে, সেগুলি সে যা করেছে তার আসল অর্থ তার কাছ থেকে গোপন করে রাখে এবং সেগুলিকে পক্ষপাতহীনভাবে মূল্যায়ন করতে দেয় না। সঠিকভাবে নিজের কাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় একমাত্র তার নিজের আর অন্যদের সহায়-সামর্থ্য, আচরণ ও গুণাবলী তুলনা করার ভিত্তিতেই, আর শিশু তা করতে সক্ষম হয় একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সে। তবে, নিজে দোষী এটা স্বীকার করা এবং নেতিবাচকভাবে নিজের মূল্যায়ন করা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা রীতিমত

সঠিকভাবে নিজেদের গুণ আর দোষত্রুটি উপলব্ধি করে এবং তাদের চারপাশের লোকেদের তাদের প্রতি মনোভাবটাও গণ্য করে। ব্যক্তিত্বের আরও বিকাশের জন্য আচরণগত রীতিপ্রথার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং ইতিবাচক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য, সেই সঙ্গে, শিশু তার বিভিন্ন গুণ ও ক্রিয়ার প্রতি তার চারপাশের লোকেদের মনোভাবকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতেও সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। এই বয়সের শিশুরা সাধারণত ভালো করেই জানে যে একগুঁয়েমি হল আচরণগত রীতিপ্রথা লঙ্ঘনমূলক ব্যাপার, তারা ইচ্ছা করে একগুঁয়েমি করে শুধু সেই সব প্রাপ্তবয়স্কের কাছেই যারা কিছুটা রেয়াত দেয়। মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিশু তার শিশুত্বের উপরে জোর দিতে পারে, তার মনে স্নেহ-মমতা জাগিয়ে নানা ধরনের সাধ পূরণ করতে পারে। এই বয়সে শিশু ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে তা থেকে কিছু লাভ পাওয়ার জন্য, কিংবা অন্যকে ঈর্ষা করতে পারে, এবং ঈর্ষা করাটা যে দোষ সে বিষয়ে অবহিত হয়ে তা গোপন করতে পারে। কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও, প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু বেশিক্ষণ তার দোষত্রুটিগুলির দিকে নিবদ্ধ থাকতে পারে না, এবং প্রসঙ্গত, নিজের ভালো গুণগুলির দিকেও না। প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর মধ্যে অন্তর্দর্শন যথেষ্ট বিকশিত হলেও, সে নিজের দিকে যতটা চালিত তার চেয়ে বেশি চালিত হয় বহির্জগতের দিকে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর জীবনকে সময়ের সঙ্গে

সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করা খুবই জরুরী। অতি ছোট শিশু, ব্যক্তি হিসেবে যে নিজের সম্পর্কে সচেতন (আমি= পিওতর — ভালো ছেলে), সে নিজের অতীত সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠতে শুরু করে, এই অতীতে সে নিজেকে দেখে সহমর্মিতা, সহানুভূতি আর প্রশ্রয়ের চোখে। সেই সঙ্গে, সে নিজেকে ভবিষ্যতেও দেখতে চায়, এবং সেটা নিশ্চিতভাবেই ইতিবাচক আর চমৎকার গুণাবলীর জ্যোতির্বলয়ে। প্রাক্-স্কুল বয়সে সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে নিজের সম্পর্কে এই কৌতূহল বাড়ে ও প্রসারিত হয়। সে যে শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের তার অতীত সম্পর্কেই বলতে বলে তাই নয়, সে নিজেও তা মনে রাখে। সে অতীতকালে নিজেকে বিষয়গতভাবে বিচার করতে আরও ভালোভাবে সক্ষম (এটা তো যখন সে খুব ছোট ছিল তখনকার কথা!), তা তাকে নিজের সম্পর্কেও সমালোচনামূলক মন্তব্য করতে সক্ষম করে তোলে। ভবিষ্যৎকালে নিজের ব্যাপারে, সে বিচার করে এই আশা নিয়ে যে অসাধ্যতম প্রত্যাশাও সে পূরণ করবে, তার ভবিষ্যৎটা উজ্জ্বল — আর যাই হোক, সে তো এই ভবিষ্যতের মধ্যে খারাপ কিছু করার সময় এখনও পায় নি। শিশুর কাছে, তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেকে উপলব্ধি করার, অতীতে নিজের মূল্যায়ন করার এবং ভবিষ্যতে নিজেকে দেখার সুযোগে পরিণত হয়। শিশুর সামনে যে সম্ভাবনার পথটি উন্মুক্ত হয়, সেটা হয়ে ওঠে তার সম্পত্তি, এবং নিজের মতো করে তা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশকে নির্ধারিত করে।

অধ্যায় ৯। ব্যক্তিত্বের নৈতিক গুণাবলীর গঠন

শিশুর নৈতিক বিকাশ নির্ধারিত হয় নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি দিয়ে: জ্ঞান, আচরণগত অভ্যাস ও নৈতিক মান সম্পর্কে মনোভাব। একটি সামাজিক প্রাণী হিসেবে শিশুর বিকাশের পক্ষে আচরণগত মান বিষয়ে জ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অতি শৈশবকালে ও প্রাক্-স্কুল শৈশবে শিশু তার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামাজিক রীতিপ্রথার সঙ্গে মানিয়ে চলতে এবং তা মেনে নিতে শেখে। এগুলির তাৎপর্য সে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে শুরু করে একটু একটু করে, যার ফলে সে গড়ে তোলে আচরণের অভ্যাস আর রীতিপ্রথা সম্বন্ধে এক বিশেষ ভাবাবেগগত মনোভাব। স্বাভাবিক নিয়ম ভাঙার মতো কিছু একটা করলে শিশু অস্বস্তি বোধ করে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশে ইতিবাচক কৃতিত্ব ও নেতিবাচক গঠনবিন্যাসসমূহ

নৈতিক মান ও সেগুলি পালন করা সম্বন্ধে শিশু এক যুক্তিসহ ও কার্যকর মনোভাব গড়ে তোলে তার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে তার ভাবাবেগগত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুকে একটি বিশেষ নৈতিক ক্রিয়ার

যুক্তিগ্রাহ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে সাহায্য করে, এবং শিশুর আচরণের প্রতি এক সহৃদয় মনোভাবের সাহায্যে বিশেষ এক ধরনের আচরণকে অনুমোদন করে।

প্রাক্-স্কুল বয়সে এক নতুন সামাজিক ও বিশিষ্ট-ভাবে মানবিক অন্তর্বস্তুর সঙ্গে আচরণগত প্রেষণাগুলির এক সম্পৃক্তি ঘটে। এই সময়ে প্রেষণাগত চাহিদাগুলির গোটা জগৎটাই নতুন করে ঢেলে-সাজা হয়, এবং স্বীকৃতির চাহিদা প্রকাশের ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে। শিশুরা তাদের দুরহঙ্কার লুকিয়ে রাখতে শুরু করে, এবং এই বয়সে খোলাখুলি আত্মপ্রশংসা দেখা যায় কদাচিৎ।

স্বীকৃতির এক অপূর্ণ দাবির ফলে অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা দিতে পারে — শিশু ইচ্ছাকৃতভাবে একটা মিথ্যা উদ্ভাবন করতে পারে অথবা বড়াই করতে পারে।

৪·৫। কিরিউশা দুটি ছত্রাক খুঁজে পেয়েছিল, তার জন্য সে প্রশংসিত হয়েছিল। সে আরও খুঁজে পেতে চায়, কিন্তু তা পাওয়া সহজ নয়।

'মা, আমি হলদে মতো কিছু একটা দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম এটা ছত্রাক। কিন্তু যখন নিচু হয়ে তাকালাম, দেখলাম ওটা একটা পাতা। (অনিশ্চিতভাবে বলে চলে)। কিন্তু তলায় একটা ছোট ছত্রাক ছিল।'

'ছত্রাক সম্বন্ধে ওই কথাটা বানিয়ে বললে কেন?'

'আমি চেয়েছিলাম ওখানে একটা ছত্রাক থাকুক।'

একটু পরে।

'একটা ছত্রাক আমি দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা একেবারে পোকা-ভর্তি, তাই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

যেভাবে তার কথাগুলো বেরিয়ে আসছিল, তা থেকে আমি টের পেলাম যে সে সত্যি কথা বলছে না।

'বানিয়ে বানিয়ে বলছ কেন?'

কিরিউশা হাসতে-হাসতে দৌড়ে পালাল।

স্বীকৃতির দাবি প্রকাশ পায় এই ঘটনাতেও যে তার প্রতি কী ধরনের মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে আর তার সঙ্গী বা তার ভাইয়ের প্রতি কী ধরনের মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, সেটা শিশু সমনোযোগে লক্ষ করে।

৪·৫। আন্দ্রিউশাকে বিছানায় শুইয়ে আমি বলি: 'ঘুমোও, লক্ষ্মীসোনা।'

কিরিউশা: 'মা, আমাকেও ওটা বলো'।

'ঘুমোও, লক্ষ্মী ছেলে আমার।'

'না, আন্দ্রিউশাকে যেমন বলেছিলে।'

'ঘুমোও, লক্ষ্মীসোনা।'

'এইবার ঠিক আছে।'

সন্তুষ্ট হয়ে সে পাশ ফিরে শোয়।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু নিশ্চিত হতে চেষ্টা করে যাতে প্রাপ্তবয়স্করা তার প্রতি সর্বদাই তুষ্ট থাকে, সে সর্বদাই চায় তাদের সঙ্গে ভাঙা সম্পর্ক জোড়া দিতে।

৪·১০। আন্দ্রিউশা: 'মা, কিরিউশা আমার মুখে চটি দিয়ে মেরেছে।'

'চমৎকার! কিরিউশা, যাও, চেয়ারে বসে থাকো।'

'মা, তুমি কি ওকে সত্যিই কড়া শাস্তি দেবে?'

'আমার কয়েকটা কাজ করা বাকি আছে, তারপর ওর সঙ্গে আমি কথা বলব।'

আধঘণ্টার মধ্যে আমি যাই কিরিউশার কাছে, আরাম কেদারায় সে চুপ করে বসে আছে ভাগ্যে কী ঘটে তার অপেক্ষায়। তাকে আমি টেনে নিয়ে যাই আমার ঘরে।

'এরকম বিশ্রী ব্যবহার করেছ কেন? একটা চটি খুলে দাও, আন্দ্রিউশাকে তুমি যে রকম মেরেছ, আমিও তোমাকে তেমনি মারব।'

'মা, মেরো না। আমি চাই না। এটা খারাপ।'

'তা হলে, তুমি নিজেই বোঝো, অথচ নিজে এই রকম খারাপ ব্যবহার করো। ভেবো না যে আমি এরকম একটা কাজ করব। আমি তোমার মতো খারাপ হতে চাই না।'

আমি সরে গিয়ে বসে পড়ি, মাথা নিচু করে থাকি।

কিরিউশা: 'কী হয়েছে, মা?'

'কিছু না। আমার খুব দুঃখ হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম কিরিউশা সব সময়েই ভালো হবে, কিন্তু দ্যাখো, কী করেছ তুমি। তোমায় নিয়ে আমরা কী করব?'

'মা, আমি আর এমন কাজ করব না।'

'এ কথা তো তুমি কতবারই বলো।'

আমি সত্যিই বিচলিত।

'মা, ও রকম মুখ করে থেকো না। আমি চাই তুমি আমার জন্য বড়াই করতে পার। আমি ভালো হতে চেষ্টা করব।' (তার চোখে জল, সে মুখ ফিরিয়ে গোপনে তা মুছে ফেলে)।

'চলে যাও এখান থেকে।'

কিরিউশা চলে যেতে থাকে, তারপর থেমে ঘুরে দাঁড়ায়:

'এ রকম দুঃখ করে বসে আছো কেন? তুমি দেখো, মা,

আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না। তুমি আমার জন্য বড়াই করবে।’

প্রাক্-স্কুল বয়সে স্বীকৃতির দাবি প্রকাশ পায় শিশুর নৈতিক গুণাবলী প্রতিপন্ন করার আকাঙ্ক্ষায়। তার ক্রিয়াকে সে অভিক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করে অপরের ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়ার উপরে, সেটা করতে গিয়ে সে চায় লোকে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুক, এবং তার ভালো কাজকে স্বীকার করুক।

শিশুরা যে কাজ করে তার পরিণতি সম্পর্কে এবং তাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সম্পর্কে মূল্যায়নের জন্য আরও বেশি ঘনঘন প্রাপ্তবয়স্কদের শরণাপন্ন হতে শুরু করে। শিশুটিকে সমর্থন যোগানো এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের সব নিরুৎসাহমূলক মন্তব্য করে শিশুকে হতোদ্যম করা কখনোই উচিত নয়: ‘তুমি এটা করতে পারবে না’, ‘তুমি এটা জানো না’, ‘বোকা-বোকা প্রশ্ন করে আমায় জ্বালিও না’, ইত্যাদি। একজন প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে অশ্রদ্ধার ফলে শিশু তার নিজের সামর্থ্যের উপরে আস্থা হারাতে পারে। দেখা দিতে পারে হীনতাভাব, এ রকম একটা অনুভূতি যে শিশুটি অযোগ্য — এটা হল একজন মানুষের পক্ষে সবচেয়ে দুরূহ নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে অন্যতম, অপরের সঙ্গে তার সম্পর্ককে তা বিঘ্নিত করে এবং আত্মিক যন্ত্রণা দেয়।

কিছুটা পরিমাণে, প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের সাফল্য সে কতখানি সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে

পারবে সেটা নির্ধারণ করে। দৈনন্দিন জীবন শিশুর সামনে নিয়তই নিয়ে আসে সব ধরনের পরিস্থিতি, তার কতকগুলি সে সহজেই নিরসন করতে পারে আচরণের নৈতিক মান অনুযায়ী, আর অন্যগুলি তাকে প্ররোচিত করে নিয়ম ভাঙতে এবং মিথ্যা কথা বলতে। এই সমস্ত সমস্যাকীর্ণ পরিস্থিতিতে শিশুর আবেগজ বাসনাগুলি নৈতিক মানগুলির সঙ্গে মেলে না। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই রকম এক পরিস্থিতির ফাঁদে আটকে পড়লে শিশু তার মীমাংসা করতে পারে নিম্নলিখিত কোনো একভাবে: ১—নিয়ম পালন করে; ২—নিজের বাসনা পূরণ করে এবং এইভাবে নিয়মটি ভেঙে, কিন্তু তা প্রাপ্তবয়স্কের কাছে না-লুকিয়ে; ৩—নিজের বাসনা পূরণ করে এবং নিয়মটি ভেঙে, কিন্তু তিরস্কার এড়ানোর জন্য তার সত্যিকার আচরণ লুকিয়ে রেখে। শেষ ব্যাপারটির সঙ্গে একটা মিথ্যার উদ্ভব জড়িত থাকে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর আত্মসাম্মুখ্য প্রায়শই এমন এক রূপ পরিগ্রহ করে যেটা নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করে। 'দ্বিবিধ প্রেষণার' পরিস্থিতিতে শিশুর প্রত্যক্ষ আবেগজ বাসনা আর প্রাপ্তবয়স্কের দাবির মধ্যে সংঘাত বাধে, শিশু তখন নিয়ম ভাঙে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে সত্যবাদিতা অধ্যয়নের জন্য একটি পরীক্ষামূলক মডেল তৈরি করা হয়েছিল, তাতে শিশুর প্রত্যক্ষ আবেগজ বাসনাগুলিকে প্রাপ্তবয়স্কের সামাজিক দাবির সঙ্গে সংঘাতের অবস্থায় আনা হয়েছিল। শিশুর মধ্যে যুগপৎ দেখা দিয়েছিল প্রাপ্তবয়স্কের আদেশ পালন না-করার বাসনা এবং পালন

করার বাসনা: তত্ত্বাবধানহীন অবস্থায় রেখে দেওয়া একটি আকর্ষণীয় বাক্সের ভিতরে তাকিয়ে না-দেখা; একটি আকর্ষণীয় বস্তু ভোগ না করা; এবং যে জিনিসটা যথার্থই তার নয় সেটাকে বস্তুতপক্ষে তার বলে দাবি না-করা।

এই পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছিল সমস্ত প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক কর্তৃক স্বীকৃতিলাভের বাসনা শিশুর কাছে এক বিশেষ ব্যক্তিগত বোধ অর্জন করে। তিন থেকে চার বছর বয়সে, অর্ধেকের বেশি শিশু প্রলোভন ঠেকাতে চেষ্টা করে, ছয় থেকে সাত বছর বয়সে নির্দেশ যারা পালন করে তাদের শতকরা অংশটা অত্যন্ত বেশি। তা সত্ত্বেও, নির্দেশ পালন করা তাদের পক্ষে সহজ হয় না, প্রেষণাগুলির সংঘাত স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যায়। তাই, ‘রহস্যজনক বাক্স’ নিয়ে পরীক্ষার বেলায় পরীক্ষাকারী ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর শিশুরা আচরণ করেছিল ভিন্ন ভিন্নভাবে। কেউ কেউ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে তাদের চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছিল, বাক্সটা পর্যবেক্ষণ করেছিল, স্পর্শ করেছিল, কিন্তু সেটা খুলে ভিতরে উঁকি মারে নি; অন্যরা বাক্সটার দিকে একেবারেই না তাকানোর চেষ্টা করেছিল, নিজেদের বাধ্য করেছিল অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে; তৃতীয় দলটা তাদের বাসনা পূর্ণ করেছিল প্রতীকী কায়দায়। পাঁচ বছর বয়স্ক মিতিয়া যখন নিশ্চিত হল যে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, তখন সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করল বাক্সটার উপরে। সেটার উপর দিয়ে সে আঙুল বোলাল, ঢাকনার উপরে আঙুল

চালাল এমনভাবে যেন সেটা পিয়ানোর কী-বোর্ড, তারপর বাক্সটার গন্ধ শুঁকল। এর পরে সে প্রতীকীভাবে ঢাকনাটা 'খুলল', কিছু বাইরে 'বার করে আনল' এবং নিজের পকেটে 'রাখল'। চারিদিকে তাকিয়ে দেখার পর সে তার পকেটে হাত 'ঢোকাল', এই 'একটাকিছু' 'টেনে বার করল' এবং কল্পিত ক্যান্ডিগুলি 'চাটতে' শুরু করল। পরীক্ষা-কারী যখন ফিরে এলেন, মিতিয়া তখন সগর্বে ঘোষণা করল যে সে বাক্সটার মধ্যে তাকিয়ে দেখে নি।

উল্লেখ করা দরকার যে শিশুর কাছে নিজের উপরে তার জয়লাভ সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্কের মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের যখন অনুমোদন জানানো হয় শিশুরা তখন খুশি হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক যদি শিশুর জানানো খবরে ('বাক্সটার মধ্যে আমি তাকিয়ে দেখি নি!') উদাসীনতার সঙ্গে সাড়া দেয় তা হলে সে দর্শনীয়ভাবেই বিচলিত হয়।

প্রাপ্তবয়স্কের নির্দেশ যারা পালন করে নি, এবারে সেই শিশুদের প্রসঙ্গে আসা যাক। দেখা গেল যে তিন থেকে চার বছর বয়সের একটি শিশু শান্তভাবে জানাতে পারে যে বাক্সটা সে খুলেছিল। পাঁচ, ছয় ও সাত বছর বয়সের যেসব শিশু নির্দেশ অমান্য করেছে তারা চেষ্টা করে এ সম্পর্কে কিছুই না বলতে। একটা মিথ্যা কথা বলার পর তারা প্রাপ্তবয়স্কের কাছে তাদের অকৃত্রিম সত্যবাদিতা প্রদর্শন করতে চেষ্টা করে, যেমন নিজেদের 'সততাপূর্ণ চোখ' দিয়ে সোজাসুজি প্রাপ্তবয়স্কের মুখের দিকে তাকানো। নির্দেশ পালন করে নি এমন বেশির ভাগ পাঁচ ও ছয়

বছরের শিশুই একটা মিথ্যা কথা বলা শ্রেয় মনে করেছিল।

এই নির্দিষ্ট 'দ্বিবিধ প্রেষণার' পরিস্থিতিতে প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের মনোগত বিশিষ্টতাগুলি সম্পর্কে পরীক্ষামূলক অধ্যয়নে শিশুর আচরণের তিনটি মূল ধরন প্রকাশ পায়: নিয়মানুবর্তী, অ-নিয়মানুবর্তী সৎ আর অ-নিয়মানুবর্তী অসৎ।

নিয়মানুবর্তী আচরণ দেখা যায় সমস্ত বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যেই, কিন্তু প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু প্রাপ্তবয়স্কের নির্দেশ পালন করে বিভিন্নভাবে। তিন থেকে চার বছর বয়সে শিশুরা যে পরিস্থিতি নিয়মভঙ্গের প্ররোচনা ঘটায় সেটা থেকে 'চিত্তবিক্ষেপের পদ্ধতি' প্রয়োগ করতে শুরু করে। ছয় ও সাত বছর বয়সের শিশুদের এইসব পদ্ধতি দরকার হয় অনেক কম, কারণ নিজেদের সচেতনভাবে সংযত করার সুস্থিত সামর্থ্য তারা অর্জন করেছে। শিশু যত বড় হয়ে উঠতে থাকে, নিয়মানুবর্তী ধরনের আচরণের প্রেষণায় একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সবচেয়ে কমবয়সী শিশু তিরস্কারের ভয়ে অথবা একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে চায় বলে সাধারণত নির্দেশ পালন করে, কিন্তু একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু নিয়মানুবর্তী ধরনে আচরণ করে, কারণ তারা বোঝে যে আচরণের নিয়মগুলি মেনে চলতে হয়।

এবারে 'রহস্যজনক বাক্স' নিয়ে পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ-লব্ধ ফলের প্রসঙ্গে আসা যাক।

তানিয়া ত. (৩·৪)। পরীক্ষাকারী ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর, সে বাক্সটাকে সব দিক দিয়ে পরীক্ষা করে

দেখে, ঘুরে তাকায়, তারপর একটা রিবন বার করে সেটা নিয়ে খেলতে থাকে। খুবই ঘনঘন সে বাক্সটার দিকে তাকায়, সেটার দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়, তারপর আবার রিবন নিয়ে খেলতে থাকে।

লিওনিয়া ম. (৪·৬)। উঠে দাঁড়ায়, সব দিক দিয়ে বাক্সটাকে দেখে, সেটাকে ঘিরে হেঁটে বেড়ায়, বাক্সটার উপরে ঝুঁকে পড়ে, তার নাক প্রায় বাক্স ছোঁয়-ছোঁয়, কিন্তু হাত দিয়ে সে বাক্সটা ছোঁয় না। তারপর বসে পড়ে, চেয়ারে বসে উশখুশ করতে শুরু করে, আবার বাক্সটার দিকে মুখ ফেরায় এবং টেবিলের তলায় হাতদুটো লুকিয়ে রাখে।

পাভলিক প. (৫·৮)। চারদিকে তাকায়, নিজের হাতের দিকে তাকায়, চেয়ারে বসে উশখুশ করে, বাক্সটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেয়।

ভিকা উ.(৫·৮)। শান্তভাবে বসে থাকে, তারপর গুনগুন করতে শুরু করে। টেবিলের উপর দিয়ে হাতটা এদিক-ওদিক নাড়ায় বাক্সের কাছাকাছি।

সমস্ত বয়ঃগোষ্ঠীর শিশুরাই আচরণের অ-নিয়মানুবর্তী সৎ ধরনটির পরিচয় দিয়েছিল প্রাক্-স্কুল বয়সের অপেক্ষাকৃত ছোট ও একটু বড় শিশুদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সহ। প্রাক্-স্কুল বয়সের সবচেয়ে ছোট শিশুদের একটা লক্ষণ হল অকৃত্রিমভাবে আবেগজ আচরণের প্রাধান্য, তা প্রকাশ পায় এই ঘটনায় যে প্রাপ্তবয়স্কের নির্দেশ যেসব শিশু অমান্য করেছে, তারা রীতিমত ইচ্ছুকভাবেই সে কথা স্বীকার করে।

ভোভা ত. (৩·৮)। পরীক্ষাকারীর অনুপস্থিতিতে বাক্সটা খোলে এবং ভিতরে কী আছে তা পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করে, কোনো অস্বস্তি বোধ করছে বলে মনে হয় না। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়: 'তুমি কি বাক্সটার ভিতরে দেখেছিলে?', সে বলে: 'হ্যাঁ।'

মাঝামাঝি ও একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা নির্দেশ অমান্য করার পর প্রায়শই ভাবাবেগগত অসুবিধা ভোগ করে: এমন কি একা থাকলেও তারা বিভ্রান্ত ও বিব্রত হয়ে পড়ে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যখন আসে, তখন তারা বিব্রতভাবে স্বীকার করে যে তারা নির্দেশ অমান্য করেছে।

অ-নিয়মানুবর্তী অসৎ আচরণ প্রত্যেক প্রাক্-স্কুল বয়সেও ঘটে। তবে, তা সবচেয়ে স্পষ্ট পাঁচ ও ছয় বছর বয়সে।

ইরা ত. (৫·৬)। পরীক্ষাকারী চলে যাওয়ার পর সে দরজার পিছনটা দেখে নেয়, তারপর টেবিলের কাছে ফিরে এসে বাক্সটা খোলে। পরীক্ষাকারী যখন জিজ্ঞাসা করেন: 'তুমি কি বাক্সটা খুলেছিলে?' — সে জবাব দেয়: 'না।'

অ-নিয়মানুবর্তী সৎ আচরণের বেলায়, সেই আচরণের প্রবণতাটা থাকে নিম্নাভিমুখী। এই ধরনের আচরণ বেশির ভাগ সময়েই নিয়মানুবর্তী সৎ অথবা অ-নিয়মানুবর্তী অসৎ আচরণের দিকে যেতে শুরু করে। ভাষান্তরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চরম ধরনের আচরণ প্রাধান্যশালী হয়ে উঠতে চায়।

সত্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি হিসেবে মিথ্যাচার দেখা দেয়

তখন, যখন শিশু বুঝতে শুরু করে যে বিশেষ কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। যে সমস্ত 'দ্বিবিধ প্রেষণার' পরিস্থিতি দেখা দেয় সে সম্পর্কে শিশুর মনোভাব সর্বদাই স্থির হয় প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি তার মনোভাব দিয়ে। প্রাপ্তবয়স্কের স্বীকৃতিলাভের দাবিদার যে শিশু নিয়ম ভঙ্গ করে, সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, কারণ তার ঐচ্ছিক ক্ষেত্রটি এমনভাবে যথেষ্ট বিকশিত নয় যাতে তার পক্ষে যুক্তিসংগতভাবে সেইসব ক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব, যার ফলে স্বীকৃতি পাওয়া যাবে।

বাস্তব পরিস্থিতিতে, মিথ্যা কথা বলার মতো নেতিবাচক ব্যাপারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে প্রাপ্তবয়স্করা যখন ধরে ফেলে যে সে মিথ্যা কথা বলছে, তখন 'তুমি মিথ্যাবাদী!' এই কথা বলে শিশুর দুরহংকারের স্তরটি নামিয়ে আনতে চেষ্টা করে। কিন্তু এর ফলে ইতিবাচক কিছু ঘটে না। প্রাপ্তবয়স্ককে শিশুর প্রতি আস্থা প্রকাশে সক্ষম হতে হবে এবং তার এই প্রত্যয় প্রকাশ করতে হবে যে শিশু ভবিষ্যতে মিথ্যা কথা বলে নিজেকে হতমান করবে না। শিশুর লালন-পালনের ব্যাপারে জোরটা দিতে হবে স্বীকৃতির দাবি হ্রাস করার উপরে নয়, বরং এই চাহিদা বিকাশের সঠিক দিকটি যোগানোর উপরে। শিশুর দুরহংকারের সহজগামী নেতিবাচক উপাদানগুলিকে পৃথক করার একটা উপায় বার করা অত্যাবশ্যক। নেতিবাচক উপাদানগুলি সচেতনভাবে কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারটা শিশুসুলভ দুরহংকারগুলির অন্তর্বস্তুর মধ্যে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে।

শিশু বয়সের মিথ্যাচার শিশুর সামাজিক বিকাশে একটা স্তর নয়, এই বিকাশের তা শুধু সহগামী ততক্ষণ পর্যন্তই, যতক্ষণ অপরের সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ সম্পর্কের চাহিদা গড়ে না-ওঠে, যতক্ষণ পর্যন্ত সততা এমন একটা গুণ হয়ে না-ওঠে, যা প্রাপ্তবয়স্কের চোখে শিশুর মর্যাদা বাড়ায়।

সমবয়সীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বীকৃতির চাহিদা বিকাশলাভ করে একেবারে নতুন এক নীতির বনিয়াদের উপরে। খেলা আর অকৃত্রিম সম্পর্ক উভয় ক্ষেত্রেই শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে শিশুরা সব সময়েই নিজেদের বিশেষ দিকাভিমুখী করে সমবয়সীদের কৃতিত্ব অনুযায়ী। 'অন্য সকলের মতো' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিশুর বিকাশকে কিছুটা পরিমাণে উদ্দীপিত করে এবং তাকে টেনে তোলে সাধারণ গড়ের স্তরে।

স্বীকৃতির দাবি 'অন্যদের চেয়ে ভালো হওয়ার' আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও প্রকাশ পেতে পারে। স্বীকৃতির এই ধরনের চাহিদা অভিব্যক্তি লাভ করে খেলায় একটা পদমর্যাদাবাহী ভূমিকার দাবির মধ্যে। তবে, এই সব দুরহঙ্কার সহজে লক্ষ করা যায় না।

এ কথা সুবিদিত যে শিশুরা ভূমিকা বণ্টন করতে এবং খেলার মধ্যে সেগুলি রূপায়িত করতে সক্ষম। খেলাধুলোয় সেই বিশেষ খেলাটারই জয় হয়, শিশুরা বিষয়টির সব কটি ভূমিকাই গ্রহণ করে। এ থেকে আমরা এই অনুমান করতে পারি যে কোনো আন্তর নৈতিক বিরোধ ছাড়াই তারা ভূমিকাগুলি বণ্টন করে একান্তভাবেই স্বাভাবিক

ঝোঁক অনুযায়ী, আর ভূমিকা বণ্টনের ব্যাপারে একই শিশুরা থাকে নেতৃস্থানে।

তা সত্ত্বেও, যে ভূমিকাকে শিশুরা তাৎপর্যপূর্ণ মনে করে তার প্রতি তাদের দুরহঙ্কারী দাবি সম্পর্কে কোনো রায় দেওয়ার আগে তাদের সমবয়সীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আচরণের অন্তত দুটি দিক বিশ্লেষণ করা অত্যাবশ্যক: একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার প্রতি দুরহঙ্কারপূর্ণ দাবি আর তা পালন করার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করার সামর্থ্য। এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য শিশুর জায়গায় তার বদলি একটা পুতুলকে রাখার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছিল যে শিশুরা সত্যিই এমন এক ভূমিকা দাবি করে যেটি সকলের পক্ষেই তাৎপর্যপূর্ণ।

পরীক্ষাটি চালানো হয়েছিল স্বাভাবিক অবস্থায়, বিভিন্ন ভূমিকা যার সঙ্গে জড়িত এমন এক খেলার সময়ে। শিশুদের সমীক্ষা করা হয়েছিল পাঁচ, ছয় ও সাত বছর বয়সে, আর পরীক্ষার জন্য গঠন করা হয়েছিল তিন ধরনের দল। একটা দল তৈরি করা হয়েছিল পুরোপুরি 'তারকা' খেলোয়াড়দের নিয়ে; দ্বিতীয়টি সমস্ত অ-জনপ্রিয় শিশুদের নিয়ে; এবং তৃতীয়টি যে কোনো আসল দলের ধাপ অনুযায়ী ('তারকা', জনপ্রিয় ও অ-জনপ্রিয়)। পাঁচটি শিশুকে নিয়ে গঠিত প্রত্যেক দলকে পরীক্ষাকারী আসন্ন খেলায় ভূমিকাগুলি সম্পর্কে বলে দিয়েছিলেন, বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন প্রধান ভূমিকার তাৎপর্যের উপরে।

পরীক্ষাকার্য চালানো হয়েছিল তিনটি স্তরে।

প্রারম্ভিক প্রস্তুতিমূলক স্তরে, পরীক্ষাকারী সমস্ত দলের মধ্যে ভূমিকাগুলি স্থির করে দেন, শিশুদের সেই প্রদত্ত ভূমিকানুযায়ী খেলতে হবে, এমন কথা ছিল।

দ্বিতীয় প্রস্তুতিমূলক স্তরে, পরীক্ষাকারী একই শিশুদের আবার সেই একই রকম ভূমিকা দেন, কিন্তু এবারে খেলা হয় বদলি পুতুলগুলি দিয়ে। প্রত্যেক শিশু তার নিজের পুতুলটি জানত এবং সবাই জানত পরস্পরের পুতুলগুলিকে। পুতুলগুলিকে বেছে নেওয়া হয় চারিত্র্য অনুযায়ী এবং শিশুর লিঙ্গ অনুযায়ী, এ ছাড়াও প্রতিটি পুতুলের ছিল সেটি যে শিশুকে প্রতিস্থাপিত করছে তার একটি পরিচয়বাহী ফটো। শিশুদের যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল, পুতুলের সঙ্গে সেই ভূমিকায় তাদের অভিনয় করার কথা ছিল।

তৃতীয় ও মূল স্তরে, প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ভূমিকা বরাদ্দ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। পুতুলগুলিকে সেইসব ভূমিকা দেওয়ার ব্যাপারটা ঘটেছিল কোনো সাক্ষী ছাড়া, অর্থাৎ খেলায় সমস্ত অংশগ্রাহীদের অনুপস্থিতিতে। পরীক্ষাটি চলল এই ভাবে: পুতুলগুলিকে বসানো হয়েছিল পাঁচটি শিশুর চেয়ারে, প্রতিটি শিশুকে ঘরের ভিতরে আনা হয়েছিল ভূমিকা দেওয়ার জন্য। সেটা করার জন্য তাকে পুতুলগুলিকে এমন সব জায়গায় সরিয়ে দিতে হয়েছিল, যেগুলি খেলায় তাদের ভূমিকাগুলির প্রতীকস্বরূপ।

পরীক্ষাকার্যের ফলাফল থেকে খেলায় একটি ভূমিকার প্রতি শিশুর বাস্তব দাবি দেখা গিয়েছিল। জোর দিয়ে বলা দরকার যে ভূমিকাটিকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এক বিশেষ

তাৎপর্য দেওয়া হয়, তা হলে প্রায় সব শিশুই সেটি দাবি করবে। দলটির ভিতরে শিশুর পদমর্যাদা কিংবা যাদের সঙ্গে সে খেলছে সেই সমবয়সীদের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রকৃত সামর্থ্যের উপরে দাবিগুলি নির্ভর করে না।

শিশুকে যখন তার সঙ্গে জড়িত সমবয়সীদের উপস্থিতিতে ভূমিকা নির্দিষ্ট করতে বলা হয়েছিল, তখন কিছু শিশু প্রধান ভূমিকাটা আরেকজনকে দিতে চেয়েছিল নিঃশর্তভাবে, অন্যরা প্রধান ভূমিকায় তাদের অধিকার জাহির করেছিল। বেশির ভাগই ভূমিকা বরাদ্দ করার সময়ে মধ্যস্থতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে: ভূমিকা বরাদ্দ করার অধিকারপ্রাপ্ত শিশু বেছে নেয় অরেকজনকে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে চেষ্টা করে যে তার পালা যখন আসবে তখন সে-ও একই কাজ করবে।

ভূমিকা প্রদান করার সময়ে শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে এই বক্তব্য উপস্থিত করা যায় যে প্রধান ভূমিকার প্রতি তাদের দাবির খোলাখুলি অভিব্যক্তি নির্ভর করে তার প্রতি আভ্যন্তরিক দুরহংকারের চেয়ে সেই স্থানটা তাকে দেওয়ার সম্ভাবনাবোধের উপরেই বেশি। বহুবিচিত্র বিষয় দেখা দেয় বাড়তি উপাদান হিসেবে, তা শিশুর দুরহংকারের সাফল্য সম্বন্ধে তার আস্থা দৃঢ় করে এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঝুঁকি কমায়: খেলাটি যদি শিশুর নিজের চৌহদ্দিতে সংগঠিত হয়, তা হলে এই অবস্থাটা তার কাছে মনে হয় তার অনুকূলে একটা বাড়তি সহায়ক বিষয়; ভূমিকাগুলি প্রদান করার সময়ে একজন আগ্রহী

প্রাপ্তবয়স্ক যদি থাকে, তা হলে প্রত্যেক শিশুই আশা করে যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিটি তাদের প্রত্যেকের দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সাহায্য করবে; খেলার গতি নিজেই ছেলেদের বা মেয়েদের একটা সুযোগ দিতে পারে।

শিশু ঝুঁকি নিতে ভয় পায় এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা আর সে যে স্থানটাকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করে সেই স্থানটি না পাওয়ার সম্ভাবনা এড়িয়ে চলে। কিন্তু এই দাবি শিশুর জন্য ব্যক্তিগত অর্থ অর্জন করে।

সমবয়সীদের সঙ্গে কাজকর্মের সময়ে স্বীকৃতির বিকাশমান চাহিদা প্রকাশ পায় দলটির মধ্যে এমন একটা স্থান দাবি করার ভিতরে, যেটা সকলের পক্ষেই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু, এই ব্যাপারটা উপর থেকে দেখা যায় না, কারণ শিশু তার চারপাশের লোকজনের কাছ থেকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি সাধারণত গোপন করে রাখে, এবং সেগুলি প্রকাশ করে একমাত্র তখনই যখন অবস্থা একান্তভাবেই তার অনুকূল।

'অন্যদের চেয়ে ভালো হওয়ার' আকাঙ্ক্ষা শিশুকে সাফল্য অর্জনে উৎসাহ যোগায় এবং সমস্ত ইতিবাচক লক্ষণসহ নৈতিকতা আর ইচ্ছাশক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর তা একটি শর্ত।

কিন্তু সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব নেতিবাচক উপাদান থাকে স্বীকৃতির দাবির সঙ্গে, সেগুলিও দেখা দেওয়া সম্ভব।

নানান পরীক্ষাকার্যের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে 'অন্য সকলের মতো হওয়ার' বাসনার ফলে প্রথানুগামী

আচরণ দেখা দিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পরীক্ষাকারী প্রত্যেক শিশুকে পালা করে কিছু পরিজ চেখে সেটা মিষ্টি না নোনতা তা বলতে বলেছিলেন (তাদের সবাইকে দেওয়া হয়েছিল চিনি দিয়ে বাঁধা পরিজ, কিন্তু যাকে পরীক্ষা করা হচ্ছিল তাকে দেওয়া হয়েছিল নোনতা পরিজ)। পরীক্ষামূলকভাবে একটা বেঠিক উত্তর দিতে প্ররোচিত করার সিদ্ধান্তে গোষ্ঠীগত আচরণের সমস্ত স্বাভাবিকতাই রক্ষিত হয়, যাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তাকে তা প্রভাবিত করে। যাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সে নিজে যাই বোধ করুক না কেন তা সত্ত্বেও, গোষ্ঠীর নিশ্চয়তা তাকে সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিয়ে 'অন্য সকলের মতো' হতে বাধ্য করে।

দেখা যায় ছোট প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা সাধারণত তাদের সমবয়সী সঙ্গীরা কী ভাবছে সেদিকে তাদের মনোযোগ চালিত করে না। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে। অন্য শিশুরা যা বলে তদনুযায়ী নয়, তারা যা জানে তদনুযায়ী তাদের উত্তরগুলি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি আচরণের স্বাধীন বাছবিচার হিসেবে নয় বরং অন্য শিশুদের প্রতি মনোযোগের অভাব হিসেবে। ছোট প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু যদি গোষ্ঠীকে অনুসরণ করে, তা হলে সেটা হল তার নিজের আঙুলগুলো নিয়ে অথবা টেবিলের উপরকার দাগটা নিয়ে তার মগ্ন থাকার পরিণতি, প্রশ্নটার মূল বিষয়বস্তু ভালোভাবে খেয়াল না করার পরিণতি।

পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে, শিশুরা সক্রিয় মনোযোগ দিতে

শুরু করে সমবয়সী অন্য শিশুরা কী চিন্তা করে, সেই দিকে। একটা জিনিস অন্যরা যা বলেছে সে জিনিস সেটা নয়, কিন্তু অন্যরা বলার পর সেটাই পুনরাবৃত্তি করার ব্যাখ্যাটা তাদের সব সময়ে একই: 'কেননা অন্যরা তাই বলেছিল।' সেই সঙ্গে তারা শঙ্কিত বোধ করতেও শুরু করে। বিষয় নিয়ে খেলা সম্পর্কিত শরিক হিসেবে সঙ্গীর প্রতি একটা সাধারণ মনোভাব গড়ে তোলে, যার মতামত তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে গণ্য করতে হবে।

পরবর্তী বয়ঃগোষ্ঠী হল ছয় থেকে সাত বছরের শিশুরা। সমবয়সী যাদের তারা ভালো করে চেনে, তাদের মধ্যে তারা স্বাধীনতার দিকে একটা প্রবণতা দেখায়; অপরিচিতদের মধ্যে তারা সাধারণত প্রথানুগামী। স্কুলের প্রথম ক্লাসে শিশুদের (সোভিয়েত ইউনিয়নে — সাত বছর বয়সী শিশুদের — অনুঃ) নিয়ে পরীক্ষা করে এই আচরণগত প্রবণতা প্রতিপন্ন হয়েছে। পরে, কিছুটা বিক্ষিপ্তমনা হয়ে তারা প্রাপ্তবয়স্কের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে ঠিক উত্তরটা তারা ভালোভাবেই জানত। তাই একটি ছেলে বলে: 'ওরা এরকম বোকার মতো জবাব দিল কেন? ওরা বলল যে নোনতাটা মিষ্টি, আর নীলটা লাল।' 'কিন্তু তুমি নিজেও একই কথা বললে কেন? 'আমি? আমি তো অন্য সবারই মতো।'

অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে 'অন্য সকলের মতো' হওয়ার বাসনার ফলে গোষ্ঠীটির সঙ্গে অক্রিয়ভাবে মানিয়ে নেওয়ার অর্থে প্রথানুগত্য ঘটতে পারে। কিন্তু, শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর মনোযোগকে 'সকলের চেয়ে ভালো হওয়ার' দুরহংকারের

দিকেও চালিত করে, প্রথানুগত্য গড়ে ওঠার বিপদ তা দূর করে। কিন্তু 'সকলের চেয়ে ভালো হওয়ার বাসনা'-র সঙ্গে থাকতে পারে নেতিবাচক দিকগুলিও।

প্রাক্-স্কুল বয়সে, শিশুরা যখন তাদের দুরহঙ্কার চরিতার্থ করে খেলায় নেতৃভূমিকায়, খেলাধুলোর প্রতিযোগিতায় জয়লাভে ও অন্যান্য অনুরূপ অবস্থায়, তখন ঈর্ষা দেখা দিতে পারে অথবা আরেকজনের স্বাচ্ছন্দ্য আর কৃতিত্বে ক্রোধ জাগ্রত হতে পারে। প্রাক্-স্কুল শিশুদের বেলায় বাহ্যিক সামাজিক সম্পর্ক আর সামাজিক পদবিন্যাস ('কে প্রধান?') প্রাধান্য লাভ করে।

ঈর্ষার সূত্রপাত পর্যবেক্ষণ করার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল বিশেষভাবে আয়োজিত 'ভাগ্যের খেলায়'। পরীক্ষাকারী তিনজন শিশুকে নিয়ে গঠিত এক একটি দলকে বেছে নিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পরীক্ষা চালানো হয়েছিল পাঁচ, ছয় ও সাত বছরের শিশুদের নিয়ে। একটা রুলেটের চাকা ঘুরিয়ে তারা পয়েণ্ট জড়ো করেছিল, সেই পয়েণ্টগুলিই সমাপ্তির দিকে তাদের কাউণ্টারগুলির গতি নির্ধারণ করছিল। তারা ধরে নিয়েছিল যে সাফল্য নির্ভর করছে ভাগ্যের উপরে, কিন্তু আসলে পরীক্ষাকারী স্থির করে দিয়েছিলেন কে জিতবে।

কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল, যে-শিশুটি সর্বদাই 'সৌভাগ্যবান' হচ্ছিল, অচিরেই সে নিজেকে দুজন 'ভাগ্যহীনের' সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে দেখতে পেল। দুজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল তৃতীয়জনের বিরুদ্ধে,

তার আচরণ নিয়ে নানা ধরনের অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, তাদের বিরুদ্ধে তার আগেকার সব দুর্ব্যবহার আর সাধারণভাবে তার আচরণ স্মরণ করতে লাগল। পরীক্ষাকারী যেই এমন কায়দায় বদল ঘটালেন যাতে 'ভাগ্যটা' আরেকজনের উপরে গিয়ে পড়ে, অমনি তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্রুত একটা পুনর্বিন্যাস ঘটে গেল।

নিজের দুরহঙ্কার সহ এক সামাজিক প্রাণী হিসেবে শিশুর পক্ষে স্বীকৃতিধন্য শিশুটির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া, কিংবা বিজয়ীর জয়ে আনন্দ করা কঠিন হয়।

যে বিষয়টি উপেক্ষা করা উচিত নয় তা এই যে প্রাক্-স্কুল বয়সের কিছু কিছু শিশু সহানুভূতির পরিচয় দিতে পারে। যে অসফল তার প্রতি সফলকামের সহানুভূতি সংহতির এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে: সেই পরিস্থিতিতে যারা জড়িত তারা সবাই পরস্পরের প্রতি আরও মনোযোগী, আরও বদান্য হয়ে ওঠে। প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে শিশুরা প্রায়শই আচরণের নেতিবাচক রূপগুলি প্রকাশ করে, যেমন ঈর্ষা, অন্যদের দুর্ভাগ্যে বিদ্বেষপরায়ণ আনন্দ, অবজ্ঞা বা হামবড়াই।

'তোমার ভাগ্য ভালো, এইটুকুই!' পাঁচ বছর বয়সী আলিওনা ম. বলে ঈর্ষাভরে। 'তুমি খাঁটি নও, নাতাশা, এ তো বলতেই হবে!'

'দেখেছিস! ফস্কে গেছে, আমি যেমন বলেছিলাম!' ছয় বছর বয়সী ভোভা ত. চেঁচিয়ে ওঠে বিদ্বিষ্ট উল্লাসে।

'এই, মাশা, ভালো করে টিপ কর!' অবজ্ঞাভরে চেঁচায় সাত বছর বয়সী ভাদ্দিক গ.।

কখনও কখনও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায় ক্রিয়ার রূপে, যখন সফল শিশু সদয় প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে অসফল শিশুকে উপদেশ দেয়।

আরেকজন যাতে সফল হতে না পারে, সে জন্য শিশু এক অদ্ভুত ছেলেমানুষি 'জাদুর' পরিচয়সূচক প্রতীকী ক্রিয়ার আশ্রয় নিতে পারে: 'তুই ওটার গায়ে মারতে পারবি না! 'তুই ওটার গায়ে মারতে পারবি না।'

সমবয়সীদের গোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থানের বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের মধ্যে। শিশু কতখানি স্বচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্ত বোধ করে এবং তার সমবয়সীদের মুখোমুখি আচরণের রীতি-প্রথাগুলি সে কী মাত্রায় আয়ত্ত করে তা নির্ভর করে এর উপরে।

একজন 'তারকা' (এবং আনুকূল্যপ্রাপ্তও বটে) অকৃত্রিম গুণমুগ্ধতার পরিবেশে নিজেকে দেখতে পায়। একটি শিশু 'তারকা' হয়ে ওঠে তার আকর্ষণীয়তা ও সৌন্দর্য, একটা পরিস্থিতি সহজে বুঝতে পারার সামর্থ্যের দরুন, তার আনুগত্যের দরুন, সে যা চায় তা সে জানে বলে, নির্দ্বিধায় দায়িত্ব গ্রহণ করার, ঝুঁকি নিতে ভয় না পাওয়ার সামর্থ্য প্রভৃতির দরুন। কিন্তু বিশেষভাবে জনপ্রিয় শিশুরা অত্যধিক আত্মবিশ্বাস আর অহমিকার দ্বারা 'সংক্রামিত' হতে পারে।

অবজ্ঞার পাত্র ও বিচ্ছিন্ন শিশুরা তাদের সঙ্গীদের দিক থেকে তাদের প্রতি আগ্রহের অভাব বা অবজ্ঞাপূর্ণ প্রশ্রয়ের ভাবটা ('আচ্ছা, ঠিক আছে। তাই হোক!') প্রায়শই টের পায়। এই শিশুদের খেলায় নেওয়া হয় মামুলি ভূমিকাগুলি

পূরণ করার জন্য। শিশুদের ভিতরে ভিতরে গড়ে ওঠে ক্ষত, আর সেইসঙ্গে গোষ্ঠীটির ভিতরে জীবনের চাপানো পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এই শিশুরা 'তারকার' সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে অনুগ্রহভজন হয়ে, উপহার দিয়ে অথবা প্রশ্নহীন বশ্যতার মধ্য দিয়ে। বিচ্ছিন্ন শিশু তার নিজের বয়ঃগোষ্ঠীর সঙ্গে আদান-প্রদানের জন্য এক 'ভাবাবেগগত ক্ষুধা' বোধ করে। তার অনুভূতিগুলি তীব্র: গোষ্ঠীর মধ্যে সে কাউকে তার শৌর্যের (বাস্তব ও স্থায়ী অথবা ক্ষণস্থায়ী) জন্য ভক্তি করতে পারে কিংবা নিজের প্রতি অবজ্ঞা দেখানোর জন্য তার প্রতি প্রবল ঘৃণা বোধ করতে পারে।

কিন্তু শিশুদের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে 'দলছাড়ারা' দেখা দেয় কেন? সম্ভবত শিশুদের একটা গোষ্ঠীর চরিত্রের মধ্যেই একজন 'বেখাপ্পা লোক' দরকার হয়, যাতে বাকি সবাই তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব হাসিল করতে পারে এবং নিজেদের অবস্থানে সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারে? না, তা নয়। শিশুদের আন্তঃ-ব্যক্তিগত সম্পর্ক দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই, সাধারণভাবে, একটি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্ন সদস্য থাকে না।

যেসব খেলার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত শক্তি পরীক্ষা এবং নিজের মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান পরীক্ষা করা, একটি শিশুর জীবনে তা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। শুধু এটাই নয়, প্রতিশোধপ্রবণতাও, প্রতিশোধ যাই হোক না কেন। তাই, 'কে ভালো' আর 'কে আরও ভালো' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'আমি বেশি লম্বা পা ফেলি!', 'আমি সবচেয়ে

বেশি নির্ভুল', 'আমি যে কারও চাইতে বেশি দূরে থুথু ফেলতে পারি!', 'আমি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাই!', 'আমি সবচেয়ে নিপুণ!', 'আমি সবচেয়ে সাহসী!' ইত্যাদি। নিজের সঙ্গীসাথীদের মধ্যে স্বীকৃতি অর্জিত হয় প্রতিশোধ নেওয়ার সংগ্রামে। প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের সম্পর্কে কী চিন্তা করে শুধু তারই উপরে শিশুদের মঙ্গল নির্ভর করে না, তাদের সমবয়সীরা তাদের সম্পর্কে কী ভাবে তার উপরেও নির্ভর করে।

নিজেদের শিশু-সমাজের সদস্যদের মূল্যায়ন করার নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম শিশুদের থাকে, দুর্ভাগ্যবশত, প্রাপ্তবয়স্কের মতের সঙ্গে সব সময়ে তা মেলে না। প্রাপ্তবয়স্করা মনে করে: 'পেতিয়া দেখতে ভারী সুন্দর, কী মমতাময়, কী সুন্দর ব্যবহার শিখেছে! সে কখনও মারামারি করে না, মেয়েদের মারে না, নিজের জুতো ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে না, কখনও কিছু হারায় না।' শিশুদের মতটা বিপরীত: 'ওর হাবভাব মেয়ের মতো ন্যাকা-ন্যাকা।'

প্রাপ্তবয়স্করা প্রায়ই অবাক হয়ে যায় যে যার উপরে তারা আশা পোষণ করেছিল, তারা 'তারকাদের' একজন হয় না। শিশুরা কখনও কখনও স্পষ্টভাবে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতের বিরোধিতা করে: 'আপনাদের, প্রাপ্তবয়স্কের জন্য পেতিয়া ভালো, কিন্তু আমরা মনে করি ও খারাপ।' 'আমরা মনে করি ভানিয়া ভালো, কিন্তু শিক্ষিকারা মনে করেন ও খারাপ।'

শিশুদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনেক কারণ আছে। একটি

শিশু প্রায়ই অসুস্থ হয়, কিণ্ডারগার্টেনে যায় কদাচিৎ, শিশুরা তার সঙ্গে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে পারে না আর সে নিজেও কাউকে চেনে না, সব সময়েই সে নবাগত। আরেকজন শারীরিক নানা সমস্যায় জর্জরিত, তার নাক দিয়ে সব সময়ে সর্দি ঝরে, সব সময়ে কান ব্যথা করে এবং সে কানে কম শোনে, সে তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে না, খুঁড়িয়ে চলে এবং শিশু-সমাজের মধ্যে গৃহীত হয় না, সমাজচ্যুত হয়। তৃতীয়জন আগে কখনও কিণ্ডারগার্টেনে যায় নি, অন্য শিশুদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তার ঘটে নি, আদান-প্রদানের অন্য দক্ষতাও নেই, খেলার অভ্যাসও নেই, তাকেও গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রহণ করা হয় না। শিশুদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ অনেক, অথচ পরিণতিটা এক — সামাজিক বিকাশ হয় অসম্পূর্ণ। যেসব শিশু জনপ্রিয় নয়, নিজেদের সমবয়সীদের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়ার আশা যাদের নেই, তারা প্রায়শই অহংবাদী আর কুনো হয়ে যায়। এই ধরনের একজন শিশু অসন্তুষ্ট হবে, অভিযোগ করবে, বড়াই করবে এবং চেষ্টা করবে দমন করতে, ভান করতে, প্রবঞ্চনা করতে। এই শিশুর একটা অপ্রীতিকর সময় চলছে, আর অন্যদের পক্ষেও তার সঙ্গে থাকাটা অপ্রীতিকর।

সামাজিকীকরণের এই ত্রুটিটা একটা দুরারোগ্য অবস্থা কিংবা ব্যক্তিত্বের একটা অসামাজিক লক্ষণ হয়ে ওঠা উচিত নয়।

অ-জনপ্রিয় শিশুকে সাহায্য করতে হবে যাতে সে তার সমবয়সীদের মধ্যে স্বীকৃতির দাবি পূরণ করতে পারে।

যাকে সামাজিক চিকিৎসা বলা যায়, শিশুকে বেঠিকভাবে গড়ে ওঠা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এবং তাকে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করার জন্য সেই চিকিৎসা একান্ত আবশ্যক।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে সামাজিক চিকিৎসা চলা উচিত দুটি মূল অবস্থান থেকে। প্রথম, প্রতিটি গোষ্ঠীর ভিতরে এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত, যে পরিবেশে প্রত্যেক শিশুই তার স্বীকৃতি লাভের দাবি চরিতার্থ করতে পারবে। দ্বিতীয়, সামাজিক মেলামেশার সুনির্দিষ্ট সব দক্ষতা বিশেষভাবে বিকশিত করতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, জনপ্রিয় নয় এমন একটি শিশু যে খেলায় জিতবে সেই রকম বিশেষভাবে সংগঠিত কতকগুলি খেলার আয়োজন করা হয়েছিল কিন্ডারগার্টেনের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে। প্রাপ্তবয়স্ক সেই শিশুটিকে উৎসাহ ও অগ্রাধিকার দিল, তাকে প্রশংসা করল। তা ছাড়াও বেশ কয়েক দিন ধরে শিক্ষাদাতা অ-জনপ্রিয় শিশুদের প্রশংসা করলেন নানা ধরনের কাজকর্মের জন্য: কর্তব্যরত থাকার জন্য, ভালো ছবি আঁকার জন্য, কারুকার্যের জন্য ইত্যাদি।

সামাজিক চিকিৎসার এই সরল পদ্ধতিতে দ্রুত ও অতি দর্শনীয় ফল পাওয়া গেল। অ-জনপ্রিয় শিশুরা ভাবাবেগের দিক দিয়ে আরও ভারসাম্যপূর্ণ এবং অন্যান্য শিশুর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় হয়ে উঠল। তারা অন্যদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে শুরু করল, এবং তাদের কাছে নিজেদের কৃতিত্বগুলি প্রদর্শন করতে লাগল। অন্যদের চোখে তাদের স্থান বদলে গেল উল্লেখযোগ্যভাবে: প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই, 'অ-জনপ্রিয়' পাঁচ বছর বয়সী শিশুরা হয়ে

গেল 'তারকা', বেশির ভাগ ছয় বছর বয়সী শিশু 'অ-জনপ্রিয়' থেকে 'আনুকূল্যপ্রাপ্ত' পদে প্রবেশ করল।

অবশ্য, শিশুদের একটা গোষ্ঠীর ভিতরে শুধুই একজন প্রাপ্তবয়স্কের উৎসাহদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত জনপ্রিয়তা স্থায়ী হবে না। আরও টেকসই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হবে নিজের সমবয়সীদের সঙ্গে দৈনন্দিন আদান-প্রদানে শিশুর অকৃত্রিম কৃতিত্বগুলির সাহায্যে।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলায় নৈতিক মানের ভূমিকা

চারপাশের লোকজনের সঙ্গে আদান-প্রদানে, এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও অন্য শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজকর্মে অংশগ্রহণের মধ্যে শিশু আচরণের সামাজিক রীতিপ্রথাগুলি শেখে। কোনো কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তার আচরণকে নৈতিক রীতিপ্রথা আর চাহিদার অধীনস্থ করার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে তার সংঘাত বাধে। তাই, নৈতিক বিধি সম্পর্কে জ্ঞান আর তার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা উপলব্ধি প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। সে এই জ্ঞানটা একজন প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে পায় পরস্পরবিরোধী ক্রিয়ার একেবারে বিপরীত মূল্যায়নের রূপে (অন্য কোনো লোকের জিনিস না-নেওয়া ভালো, নেওয়াটা খারাপ), এবং আদেশের রূপে (খবরদার, অন্য কারও জিনিস নিও না!)। সেই বিশেষ বিশেষ রীতিপ্রথার প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের নিজের মনোভাব, সে নিজে সেগুলির

সঙ্গে মানিয়ে চলে কি না, কিংবা নিছক দাবি করে যে শিশুকে সেগুলি মেনে চলতে হবে — এই বিষয়টা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুরা খুব ছোট অবস্থাতেই অবহিত থাকে যে সত্যি কথা বলতে হবে, অন্যদের সাহায্য করতে হবে, তাদের স্বার্থের কথা গণ্য করতে হবে, দুর্বলকে আঘাত দেওয়া চলবে না, অপরের জিনিস নেওয়া চলবে না ইত্যাদি। তা ছাড়া, তারা বুঝতে শুরু করে যে নৈতিক রীতিপ্রথাগুলির সঙ্গে মানিয়ে চলতেই হবে, এমন কি যদি সেগুলি তাদের নিজস্ব বাসনা আর স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তা হলেও।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কয়েকজন শিশুকে একটা গল্প বলা হয়েছিল; গল্পের নায়ক একটা মিষ্টি বা খেলনা পেতে পারত যদি সে মিথ্যা কথা বলত, কিন্তু সত্যি কথা বললে নয়। এই গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে চার বছর বয়সের শিশু থেকে শুরু করে সব শিশুই বিবেচনা করেছিল যে একটা মিষ্টি বা খেলনা পেতে যতই ইচ্ছা করুক, সত্যি কথাই বলতে হবে, এবং তারা পরীক্ষাকারীদের আশ্বাস দিয়েছিল যে তারা ঠিক তাই করত। এটা ঠিক বলে জানা সত্ত্বেও, বেশ কয়েকজন শিশু বাস্তব পরিস্থিতিতে একটা মিষ্টি পাওয়ার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল। সুতরাং, কোনটা ঠিক সে বিষয়ে যে জ্ঞান বলতে গেলে সব শিশুরই আছে, তা স্বতই এটা নিশ্চিত করে না যে প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা আচরণের নিয়ম মেনে চলবে।

দেখা গেছে যে শিশুরা প্রায়শই নৈতিক রীতিপ্রথাগুলি

লঙ্ঘন করে, যদি তারা দেখে যে এই রীতিপ্রথাগুলি তাদের বাসনার বিরোধী এবং তারা মনে করে যে বিনা শাস্তিতে তারা এই কাজটা করতে পারে। একজন শিশুকে বলা হল একটা ঝুড়ি থেকে টিকিট নিয়ে তাতে কী আঁকা আছে সেটা দেখে, গুটিয়ে আবার ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিতে, সমস্ত টিকিটের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে, তারপর এই কথা বলতে যে তারা কোন টিকিটটা টেনেছিল — জয়ের চিহ্ন দেওয়া, না ফাঁকা। ঝুড়িতে যদিও ছিল শুধু কোনো চিহ্ন না আঁকা ফাঁকা টিকিট, তবুও পাঁচ বছর বয়সীদের অর্ধেকই বলেছিল যে তারা জয়ের চিহ্ন দেওয়া টিকিট টেনেছিল, যাতে প্রতারণা করে একটা খেলনা তারা পেতে পারে। কিন্তু প্রাক্-স্কুল বয়সের একটু বড় শিশুদের অনেকেই কতকগুলি নৈতিক নীতি সম্পর্কে শুধু যে সচেতন তাই নয়, এমন কি যখন তাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ ইচ্ছাগুলির সঙ্গে এই নীতিগুলির সংঘাত বাধে তখনও তারা সেগুলি অনুযায়ী আচরণ করতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ তারা একটা সঠিক নৈতিক বাছাই করে নিতে সক্ষম হয়। শিশুর নৈতিক বিকাশে এটা অন্যতম এক কেন্দ্রীয় মুহূর্ত, এবং এই ইঙ্গিত দেয় যে অর্জিত রীতিপ্রথা আর নীতিগুলি বস্তুতপক্ষে তার আচরণকে শাসন করতে শুরু করছে।

'নৈতিক বাছাই' কথাটির মধ্যেই পূর্বানুমিত রয়েছে দুটি পরস্পর **বর্জনকর** ক্রিয়ার মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা। নৈতিক বাছাই নীতিগতভাবে অন্য সমস্ত পরিস্থিতি থেকে আলাদা, কারণ, প্রথমত এই ক্রিয়াগুলির

একটি শিশুর কাছে সুখপ্রদ অথবা সুবিধাজনক, আর বিপরীত পক্ষে, অন্য ক্রিয়াটি তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বাসনা আর পরিকল্পনার বিরোধী। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য লোকের কাছে এই ক্রিয়াগুলির একটা সরাসরি বিপরীত তাৎপর্য রয়েছে, কারণ শিশুর কাছে যে ক্রিয়াটি সুবিধাজনক তা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, অথচ তার ব্যক্তিগত বাসনাগুলির সঙ্গে যে ক্রিয়াটির বিরোধ রয়েছে, তা অন্যদের স্বার্থ পূরণ করে। তৃতীয়ত, শিশু ও অন্য লোকেদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ আর এই সব স্বার্থের অনুষঙ্গী ক্রিয়াগুলি — যেগুলির মধ্য থেকে বাছাই করে নিতে হবে — বিচার করা হয় নৈতিক মান দিয়ে। শিশুকে যে স্বার্থ পূরণে বিরত থাকতে হবে শিশুর এই ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে অন্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বার্থ কখন নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায্য, এ পরিস্থিতিতে নৈতিক বাছাইয়ের স্থান আছে। পরস্পরের বিপরীত স্বার্থগুলির নৈতিক মূল্যে এই পার্থক্যের দরুন ব্যক্তিগত বাসনা পরিতৃপ্তির নিন্দা করা হয় নৈতিক কারণে, আর অন্যের খাতিরে সেইসব বাসনা ত্যাগকে প্রশংসা করা হয়।

এই পরিস্থিতিটা আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাক। চিড়িয়াখানায় যাবে, না টিভিতে শিশুদের একটা অনুষ্ঠান দেখবে, সে ব্যাপারে মনস্থির করতে শিশু যদি ইতস্তত করে, তা হলে তার সঙ্গে কোনো নৈতিক বাছাইয়ের ব্যাপার জড়িত নেই, কারণ দুটি বিকল্পই তার কাছে সুখকর ও উপভোগ্য। শিশুকে যদি ঘর ঝাঁট দিতে (যে কাজ করতে সে পছন্দ করে না) অথবা বাসনপত্র ধুতে (যে

কাজ সে সানন্দে করে) বলা হয়, তা হলে পছন্দসই কাজটি বাছার সঙ্গে অন্য লোকেদের স্বার্থের কোনো সংঘাত বাধে না। এবং সবশেষে, টিভিতে কোন অনুষ্ঠান দেখবে তাই নিয়ে দুটি শিশুর মধ্যে ঝগড়া বাধে, একজনের পছন্দ একটা ফুটবল খেলা, অন্যজনের কার্টুন; তাদের স্বার্থ বিপরীত হলেও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা সমান মূল্যের, এবং দুজনের মধ্যে কে তার সাধ বিসর্জন দেবে, সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নেই। কিন্তু অন্যদের স্বার্থকে গণ্য করা এবং সেগুলি মেনে নেওয়ার সাধারণ নৈতিক শিক্ষা উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এরূপ পরিস্থিতিতে শিশু রীতিমত যুক্তিসংগতভাবেই প্রশ্ন করতে পারে: 'আমি কেন হার মানব?' 'আর আমিই বা কেন হার মানব?' — অপরজনের প্রশ্ন। পরস্পরবিরোধী স্বার্থের নৈতিক মূল্যায়ন ও অনুষঙ্গী ক্রিয়াগুলির গুরুত্ব আরও বেশি একট হয়, যখন নিজের বৈধ স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার সঙ্গে অপরের সংকীর্ণ অহংবাদী স্বার্থপূরণ পূর্বানুমিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে শিশুর অনেক খেলনা আছে সে আরেকজন শিশুর কাছে তার একমাত্র খেলনাটি চায়। সুনীতি পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মধ্যে যথাযথভাবে প্রভেদ টানে। একটি দৃষ্টান্ত হল শিশুকে যখন কোলাহলপূর্ণ খেলা না খেলতে অনুরোধ করা হয়, যাতে পরিবারের কোনো অসুস্থ সদস্য ঘুমোতে পারে, কারণ প্রমোদের চেয়ে শান্তি আর স্বাস্থ্যের মূল্য বেশি। নৈতিক বাছাইয়ের পরিস্থিতি রয়েছে একমাত্র তখনই, যখন নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে অন্যদের স্বার্থকে — শিশুর

স্বার্থের বিরোধী স্বার্থকে — এক নৈতিক স্তরে আরও বেশি মূল্য দেওয়া হয়।

নৈতিক বাছাইয়ের ব্যাপারটা যার সঙ্গে জড়িত এমন একটা পরিস্থিতি অন্য লোকেরা শিশুকে এই কথা বলে সৃষ্টি করতে পারে যে, সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিশুর যেভাবে কাজ করতে ইচ্ছা হচ্ছে, তা থেকে ভিন্নভাবে সে কাজ করুক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি ছোট ছেলে, নতুন একটা বাইসাইকেল চেপে তাতে মেতে গেছে, তাকে বলা হল আরেকটি শিশুকে সাইকেলটায় চাপতে দিতে। এই প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ একটা বাছাইয়ের ব্যাপার তৈরি করে — নিজেই সাইকেল চালিয়ে যাবে, না অন্যকে আনন্দ দেওয়ার জন্য নিজের আনন্দে ছেদ ঘটাবে। নৈতিক বাছাই জড়িত সেই রকম পরিস্থিতি সেইসব ক্ষেত্রেও সৃষ্টি করা যেতে পারে, যখন শিশু খারাপ আচরণ করার দিকে ঝোঁকে — সত্য গোপন করতে, অন্যদের অধিকার অগ্রাহ্য করতে চায়, ইত্যাদি।

সঠিক নৈতিক বাছাই করার ভিত্তি হল বিকল্প ক্রিয়াগুলির মূল্যের পার্থক্য সম্বন্ধে একটা উপলব্ধি; সেগুলিকে তাই নৈতিক মূল্যায়ন করতে হবে: একটি ইতিবাচক, অপরটি নেতিবাচক। এই পরস্পরবিরোধী মূল্যায়ন দিতে হবে যুগপৎ দুটি, পরস্পর বর্জনকর ক্রিয়াকে, এবং এই ক্রিয়াগুলির সর্বদাই থাকে একাধারে এক সমরূপ ও বিরোধী স্বার্থ। কোন কাজগুলি ভালো আর কোনগুলি খারাপ তা আগে থেকে শেখানো যায় না, কারণ মূল্যায়নগুলি নির্ভর করে অনেক মূর্ত

পরিস্থিতির উপরে। ছোট্ট যে মেয়েটি শারীরিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় নয়, সে যদি নিজের চেহারা সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তা হলে অনেকে ভাবে যে সত্যি উত্তর দিলে সে কষ্ট পাবে, তার খুঁত উপলব্ধি করতে তাকে প্ররোচিত করবে, তাই তারা স্থির করে যে এ ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলাটা খারাপ হবে। তাই, সমস্ত মূর্ত পরিস্থিতিতে একটা সঠিক মূল্যায়ন দেওয়ার জন্য এক একটি ক্রিয়ার নৈতিক মূল্যায়নের আরও সাধারণ সব মানদন্ড হাতে থাকা দরকার। এই ধরনের মানদণ্ড আছে নীতিশাস্ত্রগত প্রথায়। মানবিক সংস্কৃতিতে নীতিগত মূল্যায়নের সামান্যীকৃত মানগুলি ঐতিহাসিকভাবে বিবর্ধিত হয়েছে, কাজ করেছে ভালো আর মন্দের মেরুপ্রান্তিক বর্গ হিসেবে। শিশু নীতিগত মানগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সেগুলির সামাজিক সারমর্ম সম্পর্কে এক যুক্তিসহ ও আবেগগত মনোভাবের মধ্য দিয়ে, প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে অথবা অন্য শিশুদের সঙ্গে একত্রে। শিশুর নিজের নৈতিক বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করে নীতিগত মানগুলির সঙ্গে তার নিজের ক্রিয়াগুলিকে পরস্পরসম্পর্কিত করার সামর্থ্য কতখানি বিকশিত, তার উপরে।

একটি শিশু, বিশেষত প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু, এই বর্গগুলির অর্থ ও স্ববিরোধগুলি বুঝতে পারে একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, যদি সেগুলিকে তার সামনে উপস্থিত করা হয় যথেষ্ট মূর্ত ও অধিগম্য রূপে। শিশুর মধ্যে ভালোমন্দের সুনির্দিষ্ট ধারণার আত্মপ্রকাশ এবং সেগুলির ভিত্তিতে নৈতিক মূল্যায়ন করার ক্ষমতার আত্মপ্রকাশ একটা

দীর্ঘ, জটিল প্রক্রিয়া, সে-প্রক্রিয়া পর্যাপ্তভাবে অধীত হয় নি।

প্রাপ্তবয়স্করা যেসব মূল্যায়ন দেয়, এই সব ধারণা গঠনের পক্ষে সেগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। শিল্পকর্মও একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। বহু রূপকথা ও অন্যান্য রচনার বিষয়বস্তু শিশুর কাছে ভালো আর মন্দের মধ্যে সংগ্রাম, সেইসব ভালোমন্দ মূর্ত হয় সুস্পষ্ট ও অভিব্যক্তিমূলক মডেলে, তাদের মধ্যে সংগ্রামকে উপস্থিত করা হয় চিত্তাকর্ষকভাবে। ইতিবাচক নায়কদের প্রতি সহানুভূতি শিশুদের কল্পনাশক্তিকে শুধু যে সমৃদ্ধ করে তাই নয়, ভালো আর মন্দের প্রতি এক সঠিক ব্যক্তিগত মনোভাবেরও জন্ম দেয়, প্রাপ্তবয়স্কের প্রত্যক্ষ মূল্যায়নের সাহায্যে যা সর্বদা সফলভাবে অর্জন করা যায় না।

শিশু মনস্তত্ত্বে ব্যক্তিত্বের নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি গঠনের এক কার্যকর পদ্ধতি আছে। শিশুকে এমন অবস্থায় রাখা হয় যাতে সে নিজের কাজকর্মকে নৈতিক মানগুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখতে বাধ্য হয়।

দুটি বিপরীত নৈতিক মানের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দুটি নৈতিকভাবে বিরোধী নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে সেগুলিকে সঠিকভাবে পরস্পরসম্পর্কিত করার তালিম দেওয়া হয়েছিল। একটি পরিস্থিতিতে শিশুকে বলা হল নিজের আর অন্য দুজন শিশুর মধ্যে খেলনাগুলি সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিতে।

সমান বণ্টন খেলনার প্রতি অন্য শিশুদের সমান অধিকারের প্রতি শিশুর স্বীকৃতিকে বিষয়গতভাবে প্রকাশ

এটা আমি! সুন্দরী না?
ইরা, ৬ বছর
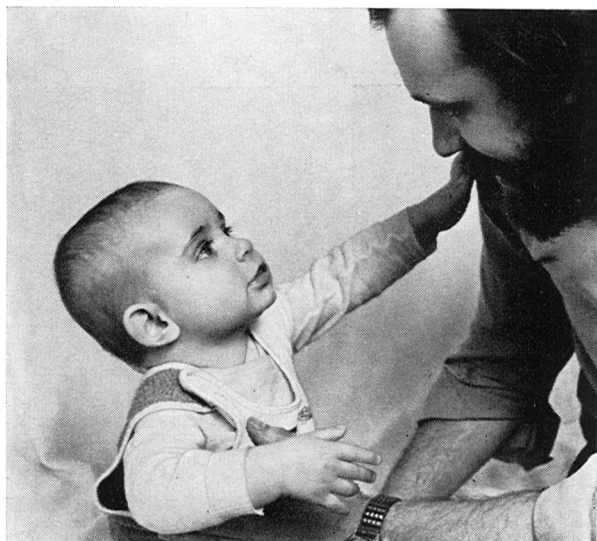
আদান-প্রদানের কামনা

আমি নাবিক। সাশা, ৮ বছর

ওঃ, কী ভালো ছেলে!

ছোট মায়ের দায়দায়িত্ব

আমার বিড়াল আর আমি।
আনিয়া, ৬ বছর

ব্যাপার গুরুতর
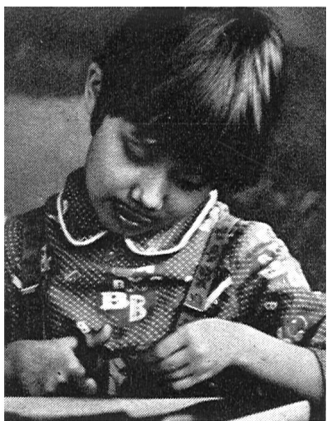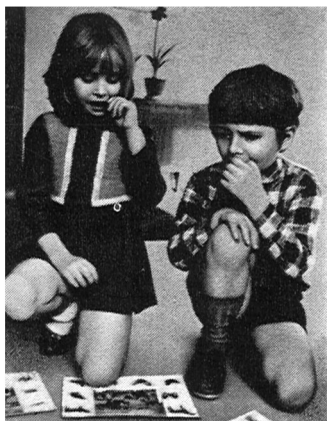
প্রথম পুরস্কারটা জেতা খুবই দরকারি!

অন্তবৃর্ত

করে, এবং নৈতিক দিক দিয়ে তা ইতিবাচক ও ন্যায়সংগত ক্রিয়া। বেশির ভাগ খেলনা নিজেই দখল করে নেওয়ার মধ্যে প্রকাশ পায় এই খেলনাগুলিতে অন্য শিশুদের অধিকার অস্বীকৃতি, এবং তাই নৈতিক দিক দিয়ে তা নেতিবাচক ও অন্যায় ক্রিয়া।

আলেক্সেই তলস্তোয়ের গল্প 'সোনালী চাবি, বা বুরাতিনোর অ্যাডভেঞ্চার' থেকে বুরাতিনো আর কারাবাস হল এই মেরুপ্রান্তিক নৈতিক মানগুলির প্রতিভূ। তারা বিপরীত দুই মেরুর চরিত্র শুধু তাদের নৈতিক গুণাবলীর দিক দিয়েই নয়, তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও, শিশুদের গল্পের স্তরে যা ভালো আর মন্দের মধ্যে লড়াইয়ের মূর্তরূপ। এই চরিত্রগুলির নৈতিক বিরোধ শিশুদের মধ্যে শুধু যে কোনো সন্দেহের উদ্রেক করে না তাই নয়, বরং তার একটা ভাবাবেগগত রঙও আছে কারাবাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুরাতিনোর সমস্ত দুঃখদুর্দশার প্রতি শিশুদের সহানুভূতির দরুন। তাই, গল্পটির দুটি চরিত্র দেখা দেয় আচরণের দুই বিপরীত মানের বাহক হিসেবে।

কতকগুলি পরীক্ষানিরীক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিশুদের কাজ করতে হয়েছিল বুরাতিনো আর কারাবাস যেমন করত সেইভাবে। বুরাতিনো হিসেবে তারা খেলনাগুলি ভাগাভাগি করে নিল ন্যায্যভাবে ('বুরাতিনো সব সময়ে সব কিছু সমানভাবে ভাগ করে দেয়, সে ভালো আর ন্যায়পরায়ণ'), কারাবাস হিসেবে তারা ছিল ন্যায়হীন ('কারাবাস লোভী, সে নিজের জন্য বেশি নেয়')।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, শিশুটির অন্যায় ক্রিয়াটিকে অন্য শিশুরা সম্পর্কিত করেছিল কারাবাসের মডেলের সঙ্গে। যাদের বৈঠিক (অন্যায়) আচরণ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল, তাদের বেশির ভাগই কারাবাসের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করার প্রবল প্রতিবাদ করে এ কথা স্পষ্টভাবেই অস্বীকার করেছিল যে কারাবাস যেভাবে করত তারা ঠিক সেইভাবেই খেলনাগুলো বণ্টন করেছে।

তৃতীয় পর্যায়ে, শিশুটিকে নিজেকেই একটা নেতিবাচক মানের সঙ্গে নিজের অন্যায় বণ্টনের মিলটা স্থির করতে হয়েছিল।

পরীক্ষাকারী: 'খেলনাগুলো তুমি ওইভাবে ভাগ করলে কেন?'

ইউরা ক. (৬·০): 'আমি নিজেকে বেশি দিয়েছি, অন্যদের দিয়েছি কম।'

পরীক্ষাকারী: 'কেন?'

ইউরা: 'এমনিই করলাম।'

পরীক্ষাকারী: 'তুমি কার মতো ভাগাভাগি করেছ?'
ইউরা (মাথা নিচু): 'মনে নেই।'

পরীক্ষাকারী: 'বুরাতিনোর কথা তোমার মনে আছে?'
ইউরা: 'হ্যাঁ। কারাবাসও তো ছিল।'

পরীক্ষাকারী: 'তুমি কার মতো ব্যবহার করেছ?'
ইউরা: 'আমি? (দীর্ঘ নীরবতা) যেমন আমি চেয়েছিলাম।'

পরীক্ষাকারী: 'বুরাতিনোর মতো না কারবাসের মতো?'

ইউরা, মাথা নিচু, মাঝে মাঝে পরীক্ষাকারীর দিকে তাকায়, চুপ করে থাকে।

পরীক্ষাকারী: 'জবাব দিতে পারছ না?'

ইউরা মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানায় যে সে পারছে না।

পরীক্ষাকারী: 'অন্য শিশুরা দেখলে কী বলত?'

ইউরা কথা বলে না।

পরীক্ষাকারী: 'বুরাতিনো কি ওইভাবে ভাগ করত?'

ইউরা: 'না।'

পরীক্ষাকারী: 'আর কারাবাস?'

ইউরা: 'হ্যাঁ।'

পরীক্ষাকারী: 'তা হলে, অন্যরা কী বলত?'

ইউরা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

পরীক্ষাকারী: 'তুমি কী বলতে চাও, কার মতো তুমি খেলনাগুলো ভাগ করেছ?'

ইউরা (অতি মৃদুস্বরে): 'বুরাতিনোর মতো।'

এই কথাবার্তার বিবরণ থেকে দেখা যায়, কারাবাসের মতো আচরণ করেছে এই কথা স্বীকার করা শিশুটির পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক, এমন কি অসম্ভবই বলা যায়। যেন শিশু এই প্রথম বুঝতে শুরু করছে যে নিজের জন্য বেশি খেলনা নেওয়ার 'নিরপরাধ' বাসনাটা কারাবাসের মতো ভয়ংকর একটা চরিত্রের সঙ্গে কোনো একভাবে যুক্ত।

নৈতিক মানগুলির সঙ্গে শিশুর প্রকৃত কাজগুলির পরস্পরসম্পর্কের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক ব্যক্তিগত গুণাবলী গঠন কার্যকর হবে, যদি প্রাপ্তবয়স্ক শিশুর উদ্দেশে আস্থাপূর্ণ ও সদয় স্বরে কথা বলে, এই প্রত্যয় প্রকাশ করে

যে এই শিশুটি সাধারণভাবে অন্যায় কাজ করতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক যদি শিশুর ভবিষ্যৎ আচরণকে একটি ইতিবাচক প্রমাণ আচরণের সঙ্গে সমান করে দেখায়, তা হলে ভবিষ্যতে শিশুর বাস্তব আচরণের এক মৌলিক উন্নতি ঘটাতে তা উৎসাহ যোগাবে। শিশুটির আচরণ স্থিরভাবে ন্যায্য হয়ে দাঁড়ায়।

শিশুর আচরণে যে উন্নতি ঘটছে, তার মনস্তাত্ত্বিক অর্থটি এই যে প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে সাহায্য পেলেও শিশু স্বাধীনভাবেই একটি নৈতিবাচক মানের সঙ্গে তার ক্রিয়ার মিলটি ধরতে পারে, আর সেইসঙ্গে তার চারপাশের শিশুরা আর প্রাপ্তবয়স্করা তাকে দেখায় তাদের নিজেদের ইতিবাচক মনোভাব এবং এই প্রত্যাশা যে তার আচরণ একটা ইতিবাচক নৈতিক মানানুগ হবে।

প্রতিটি স্বাভাবিকভাবে বিকাশমান শিশুর ব্যক্তিত্বের কাঠামোর বনিয়াদে নিজের প্রতি যে ইতিবাচক ভাবাবেগগত মনোভাব থাকে ('আমি ভালো'), তা একটা ইতিবাচক নৈতিক মানানুগ হওয়ার আকাঙ্ক্ষার দিকে তার মনোযোগকে চালিত করে। আত্মমর্যাদা আর চারপাশের লোকেদের মর্যাদার উপযুক্ত হওয়ার ব্যক্তিগত আগ্রহের ফলে দেখা দেয় এক ইতিবাচক নৈতিক মানানুগ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ও ভাবাবেগগত চাহিদা।

এই চাহিদা উদ্ভূত হয় একমাত্র তখনই, যখন একটি বিশেষ কাজ অথবা বিভিন্ন ধরনের আচরণ শিশুর কাছে এক বিশেষ ব্যক্তিগত অর্থ অর্জন করে। যে শিশুর আচরণ

নেতিবাচক সে যদি তার প্রতি স্নেহবর্ষী প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের দরুন নিজেকে আনুকূল্যকর দৃষ্টিতে গণ্য করে, তা হলে তাকে পুনঃশিক্ষিত করা খুবই দুরূহ, কিন্তু সে যদি নিজের সম্পর্কে অসন্তুষ্ট থাকে তা হলে তার আচরণ পরিবর্তিত করার একটা ভিত্তি থেকে গেছে।

বদনামজনিত কিছু কিছু সুবিধা শিশু নিজের জন্য আদায় করে নিতে পারে। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে আমার ছেলে আন্দ্রিউশার পক্ষে একটা বিশেষ সুবিধা হয়েছিল যে সে ছিল দুষ্টু, অলস শিশু।

তিন বছর বয়সে সে পরমানন্দে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখত, বাইরে ছোট ছেলেরা জঞ্জালের গাদায় ঘাঁটাঘাঁটি করছে। তারা টেনে বার করত বাইসাইকেলের চাকা, দড়ি, তক্তা, খালি টিন।

আমি তাকে বলি: ‘ওরা খারাপ ছেলে। ওরা জঞ্জালের গাদার মধ্যে যাচ্ছে।’

সে পরপর কয়েকটি সন্ধ্যা কাটাল ছেলেদের জঞ্জালের পাত্র থেকে নানা ধরনের আজেবাজে জিনিস টেনে বার করা দেখে। প্রত্যেকবারই আন্দ্রিউশাকে আমি বললাম যে ওরা খারাপ ছেলে।

শেষ পর্যন্ত, জঞ্জালের গাদা ঘিরে ছেলেদের কোলাহল থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার জন্য আমি যখন তাকে জানালা থেকে আবার সরিয়ে নিলাম, সে বলে উঠল: ‘আমি খারাপ ছেলে হতে চাই!’

শিশুরা বড় হয়ে ওঠে এবং বুঝতে শুরু করে নেতিবাচক নৈতিক মান বলতে কী বোঝায়, তবুও নেতিবাচক আচরণে তাদের ভাবাবেগগত আগ্রহ তারা তখনও বজায় রাখে। এই আগ্রহ আর খোলাখুলি প্রকাশ পায় না ('আমি খুবই চাই খারাপ ছেলে হতে!', 'আমি তোমাদের আলসে ছেলে!'), পায় পরোক্ষভাবে। প্রাক্-স্কুল বয়সের কোনো কোনো শিশুর (বিশেষত বালকদের) আচরণের মধ্যে নেতিবাচক নৈতিক মানগুলির দিকে অভিমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তারা যা করে সেটা বস্তুতপক্ষে সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী হলেও, তারা একই সঙ্গে নেতিবাচক চরিত্রগুলির সঙ্গে প্রায়শই ভাবাবেগগতভাবে একাত্ম বোধ করে। এটা প্রায়শই আসে এই ঘটনাটি থেকে যে, যেসব নেতিবাচক চরিফ মানবিক দোষত্রুটি আর বিচ্যুতির পরিচয় দেয় সেগুলির মূল্যায়ন করার কাজে নিজের সংস্কৃতি সাধারণত মৃদু, কটুত্বহীন ব্যঙ্গের কিছুটা প্রশ্রয়মূলক মনোভাব গ্রহণ করে।

পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে আন্দ্রিউশা গভীর আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিল শয়তানের মতো সেইসব চরিত্র সম্পর্কে, যারা সব ধরনের চক্রান্ত পাকায়। তার প্রিয় বইদুটি ছিল জাঁ এফেল প্রণীত 'পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টি' আর 'আদম ও ঈভের কাহিনী', যেখানে শয়তান আবির্ভূত হয় অতি সক্রিয় এক নেতিবাচক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। আচরণের নেতিবাচক মানের এই বাহকটির প্রতি গ্রন্থকারের প্রশ্রয়মূলক, অনুকূল মনোভাব শিশু বুঝতে পেরেছিল, শয়তানের যে ব্যবহার আচরণের

ইতিবাচক বিধির বিরোধী, আন্দ্রিউশা খোলাখুলি সেই ব্যবহারের প্রশংসা করতে লাগল। সাধারণভাবে, ভবিষ্যতে সে শয়তান আর গুন্ডাদের ধরনধারন অনুসরণ করবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবারের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসতে ভারী ভালোবাসত।

কিরিউশা (৫·১১) মন দিয়ে টিভির একটা অনুষ্ঠান দেখছে মোজার্ট সম্পর্কে। মোজার্টকে 'রেকুইয়েম' সংগীত রচনা করার বরাত যিনি দিয়েছিলেন সেই বিষণ্ণ-গম্ভীর লোকটির চেহারা দেখে সে বিচলিত হল। টেলিভিশনের কাছ থেকে আন্দ্রিউশা সরে এল। কিছুক্ষণ পরে সে আচমকা ঘোষণা করল: 'এই রকমের সব প্রোগ্রাম আমার একটুও ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে মজার ফিল্‌ম।' চুপ করে যায়। একটু পরে: 'আমি গুন্ডাদের সম্পর্কে প্রোগ্রাম দেখতে ভালোবাসি, তার মানে আমি নিজেই হব একটা মাতাল আর গুন্ডা!'

শিশুর কাছে আচরণের ভাবাবেগগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মানের মডেল আছে শিল্পকর্মের মধ্যে। শিল্পকর্মে (সাহিত্যিক, রেখাঙ্কন, চিত্রবহুল ইত্যাদি) চিত্রিত নায়কদের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে শিশু ভাবাবেগগতভাবে একাত্ম বোধ করে সেই সব নায়কদের আচরণের ধরনের সঙ্গে, যারা তাদের শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে তার উপরে গভীর রেখাপাত করেছে।

একটি চরিত্র সম্পর্কে শিশুর মূল্যায়নে বেশির ভাগ সময়েই মধ্যস্থতা করে তার চারপাশের লোকেদের মনোভাব। নিজের প্রথম নৈতিক মানগুলি অর্জন করার

প্রক্রিয়াটা ঘটে তার ঘনিষ্ঠ প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে বিনিময়কালে।

গোড়ায় শিশু যে নৈতিকভাবে আচরণ করে সেটা এই জন্য নয় যে কতকগুলি নিয়মের সামাজিক তাৎপর্য সে উপলব্ধি করে, বরং এই জন্য যে যারা তার প্রিয় তাদের মতামত গণ্য করা আর তাদের অনুরোধ পালন করার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে। তার চারপাশের লোকেরা যদি তাকে গণ্য করে 'ভালো' বলে, অর্থাৎ একটা ইতিবাচক মানানুগ বলে, তা হলে সেটা করেই তারা শিশুর সামনে নিজের একটি ইতিবাচক মডেল খাড়া করে, এ কথা বলা যায়। এখান থেকে, এক দিকে দেখা দেয় তার প্রিয়জনদের চোখে এই ভাবমূর্তি বিনষ্ট না করার বাসনা, এবং অন্য দিকে, এই ভাবমূর্তি অনুধাবন এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের সম্পর্কে উপলব্ধি ঘটে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু নিয়তই আচরণের এক প্রমাণ মডেল সম্পর্কে নিজের বোধ আর তার নিজের আচরণকে পরস্পরসম্পর্কিত করে, তার ফলে ঘটে মানসিক ও ভাবাবেগগত চাপ। নিজের আচরণের প্রতি একটি শিশু যত সমালোচনাত্মকই হোক না কেন, তা সত্ত্বেও তার মূল্যায়নের ভিত্তিমূলে নিহিত থাকে — এবং আদিতম শৈশবকাল থেকেই তা আছে — নিজের সম্পর্কে ভাবাবেগগতভাবে ইতিবাচক এক মূল্যায়ন।

তার সমবয়সী যারা সেই গোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয় তারাও আচরণের প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে কাজ করে। প্রাপ্তবয়স্কদের এবং সমবয়সী সঙ্গীদের প্রভাব ঘটে মুখ্যত

কাজকর্ম চলাকালে। খেলায়, শিশু যে ভূমিকাটি পালন করে সেটি একই সঙ্গে হয় ওঠে একটা মান যার সঙ্গে সে তার নিজের আচরণের তুলনা করে এবং আচরণকে মানিয়ে নেয়। শিশুদের খেলার মূল সারবস্তু যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিদ্যমান আচরণের মানগুলিই, সেইজন্য এ কথা বলা যায় যে খেলায় শিশু চলে যায় উচ্চতর রূপের মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রাপ্তবয়স্ক জগতে, মানবিক সম্পর্কের পরিণত জগতে।

প্রাক্-স্কুল বয়সে একটি ইতিবাচক নৈতিক মান অনুসরণ করার বাসনার মধ্যস্থতা করে অপরের দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার দাবি। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করা হলে, শিশু সেই পরিস্থিতিতে যে ইচ্ছাই জাগরূক হোক তদনুযায়ী কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। 'তুমি যদি অদৃশ্য হয়ে যাও, তা হলে কী করবে?' এই প্রশ্ন শিশুকে এমন একটা পরিস্থিতিতে ফেলে যেখানে এই বিভ্রম সৃষ্টি হয় যে কোনো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নেই।

অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা শিশুর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বোধ হয়। ছয় বছর বয়সে কিরিউশা আর আন্দ্রিউশাকে যখন রে ব্র্যাডবেরির 'অদৃশ্য বালক' গল্পটি শোনানো হয়েছিল, তারা একটা অদৃশ্য বালক সম্ভাব্য কী কী মজা পেতে পারে তা নিয়ে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। যখন তারা বুঝতে পারল যে বুড়ি চার্লিকে ঠকিয়েছে, আসলে তাকে অদৃশ্য করে দেয় নি, তখন তারা খুবই রেগে গিয়েছিল। বুড়ির কাজের কারণ ব্যাখ্যা করে বা প্রশ্রয় দেওয়ার অনুরোধে কোনো কাজ হল না, অন্তত একটুখানি

অদৃশ্য হওয়া, শস্যের ভিতর দিয়ে সরাসরি ছুটে যাওয়া, সর্বোচ্চ পাহাড়গুলি বেয়ে ওঠা, খামারে সাদা মুরগিগুলোকে গায়েব করা, ছোট্ট শূকরছানাগুলোকে লাথি মারা, নগ্ন হয়ে পাথরের উপরে লাফানো আর অন্য সব ধরনের মজা করার সম্ভাবনার প্রতি তাদের ভাবাবেগগত মনোভাব এত প্রবল ছিল।

অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনায় আমার ছেলেদের প্রতিক্রিয়া আমাকে উদ্বুদ্ধ করল একটা পরীক্ষামূলক পরিস্থিতি উদ্ভাবন করতে। পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: 'তোমরা যদি অদৃশ্য হয়ে যাও, তো কী করবে?' শিশুদের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে পরিস্থিতিটি খুবই মজার মনে হল, তাদের চোখ চক্‌চক্‌ করতে লাগল, তারা যে নিয়ম ভাঙতে প্রস্তুত তা দেখিয়ে দিল।

প্রাপ্তবয়স্কদের উপরে তাদের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সচেতন থাকায়, অদৃশ্য মানুষের ভূমিকায় শিশুরা চেষ্টা করে প্রাপ্তবয়স্কের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যেতে। 'আমি যদি অদৃশ্য হই, যেখানে আমার খুশি সেখানে বেড়াতে যাব' অথবা 'আমি নিজে-নিজে ট্রামে চড়ব।' অদৃশ্য প্রাণী হিসেবে প্রাক্‌-স্কুল বয়সের শিশু অতি সহজে ও অবাধে নিয়ম ভাঙে এবং দুষ্টুমি করে।

একটি নৈতিক মান অনুযায়ী কাজ করে শিশু একজন প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে ইতিবাচক মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষা করে, কারণ এই অনুমোদনই হল তার স্বীকৃতির

দাবি মেনে নেওয়া। যে পরিস্থিতিতে কোনো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে নৈতিক কাজগুলি আর ততটা আকর্ষণীয় থাকে না। চারপাশের লোকের কাছ থেকে অনুমোদন লাভের প্রত্যাশায় শিশু নিজের গুণ বিশেষভাবে প্রদর্শন করতে চাইতে পারে। আমার যমজ ছেলেদুটি প্রায়ই দেখাত, তারা কত ভালোভাবে শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে।

৫·২। ছোটরা নৈশভোজ করছিল। কিরিউশা প্রথমে খাওয়া শেষ করল। শেষ পদ হিসেবে ছিল কলা। তার বাবা বললেন, 'যাও, তোমার পছন্দমতো বেছে নাও'। কিরিউশা নড়াচড়া না করে বসে রইল। 'বসে আছ কী জন্য? কলা খেতে চাও না?'

সে ধীরে ধীরে উঠল, যে ভাগটা একটু ছোট সেটা নিয়ে কলা গিলতে লাগল গোগ্রাসে। খাওয়া শেষ করে টেবিল ছেড়ে মুখ ধুতে যাওয়ার সময়ে আমাকে মৃদুস্বরে বলল: 'যে ডিশটায় একটু খারাপ কলাগুলো ছিল, আমি সেটা নিয়েছি, ভালোগুলো রেখে দিয়েছি আন্দ্রিউশার জন্য।' 'খুব ভালো, তুমি তো ভালো ভাই।'

কিরিউশার সম্প্রতি মিষ্টি জিনিসের উপরে দারুণ লোভ হতে শুরু করেছে। আমার তিরস্কার স্পষ্টতই তার কানে ঢুকেছে। তার দিদিমা বলেন যে এখন সে সব সময়েই জিজ্ঞাসা করে: 'ছোটটা কোথায়?' তারপরে সেটা নেয়।

একটি বিশেষ কাজ সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্কের মূল্যায়ন অনুযায়ী নিজের দিক নির্দেশ করার সময়ে শিশু আসলে

থাকে নৈতিক বিকাশের প্রথম স্তরে। এই পরিস্থিতিতে প্রদর্শনমূলক আচরণ দেখা দিতে পারে, যেখানে শিশু অনুমোদন পাওয়ার জন্য সর্বসাধ্য করে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের দ্বারা তার কাজের এক ইতিবাচক মূল্যায়নের এই একটিমাত্র মানদণ্ড থেকে শিশুর অভিমুখীনতা কাজের দিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করতে হবে। নৈতিক কাজটির মধ্যেই শিশুকে শেষ পর্যন্ত আন্তর সন্তুষ্টি লাভ করতে হবে।

অধ্যায় ১০। অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ

প্রাক্-স্কুল বয়সে, একেবারে শৈশবকালের মতোই, শিশুর জীবনের সমস্ত দিকের উপরে অনুভূতিরই প্রাধান্য থাকে, কারণ সে তখনও পর্যন্ত সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায়, শিশুর অনুভূতিগুলির বাহ্যিক অভিব্যক্তি অনেক বেশি প্রচণ্ড, বেশি প্রত্যক্ষ ও অনিচ্ছাকৃত। শিশুর আবেগানুভূতিগুলি খুব তাড়াতাড়ি ও স্পষ্টভাবে ফেটে পড়ে, আবার ঠিক তেমনই তাড়াতাড়ি প্রশমিত হয়; প্রায়শই হাসির জায়গায় আসে কান্না।

শিশুর অনুভূতিগুলির প্রবলতম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল অন্যান্য লোকের সঙ্গে, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের সঙ্গে, তার সম্পর্ক। শিশুর চারপাশের লোকেরা যখন তার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করে, তার অধিকারগুলি স্বীকার করে এবং তার প্রতি মনোযোগ দেয়, তখন সে বোধ করে ভাবাবেগগত স্বাচ্ছন্দ্য, প্রত্যয়ের ভাব, সুরক্ষিত হওয়ার ভাব। এই পরিস্থিতিতে শিশু সাধারণত হাসিখুশি থাকে। ভাবাবেগগত স্বাচ্ছন্দ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ, তার ইতিবাচক গুণাবলী গঠন ও অপরের প্রতি বদান্যতা গড়ে ওঠাকে সহজতর করে।

শিশুর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তার চারপাশের লোকেদের আচরণ নিয়ত বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি জাগ্রত করে — আনন্দ, গর্ব, অপমান, ইত্যাদি। তার প্রতি বর্ষিত স্নেহ আর প্রশংসাকে সে যেমন গভীরভাবে অনুভব করে, ঠিক তেমন গভীরভাবেই অনুভব করে তার প্রতি আঘাত বা অন্যায় আচরণ।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর অনুভূতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা তার কাছের মানুষদের জন্য — প্রথমত ও প্রধানত বাবা-মা, ভাইবোনদের জন্য — ভালোবাসা ও মমতা বোধ করে এবং তাদের সম্পর্কে প্রায়শই উদ্বেগ ও সহানুভূতি দেখায়।

কিছু লোকের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা সেইসব লোকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর ক্রোধের সঙ্গে যুক্ত যারা শিশুর সেই প্রিয়জনদের আঘাত দিয়েছে বলে শিশু টের পায়। শিশু অজ্ঞাতেই নিজেকে স্থাপন করে সে যে ব্যক্তির অনুরক্ত তার জায়গায়, এবং এই ব্যক্তি যে বেদনা বা অবিচার ভোগ করেছে, তা অনুভব করতে শিশু সক্ষম হয়, যেন সেই বেদনাবোধ তারই।

এ ছাড়াও, যখন সে অনুভব করে যে আরেকজন শিশু (এমন কি প্রিয় ভাইও) বেশি মনোযোগ পাচ্ছে, তখন সে ঈর্ষা বোধ করে। ৪·২। আমি একটা বই পড়তে পড়তে ছবিগুলো দেখাচ্ছিলাম কিরিউশাকে, তারপর অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে-থাকা আন্দ্রিউশাকে। কিছুক্ষণ পরে কিরিউশা খুব আস্তে আমার হাত ধরে টানল।

‘এতক্ষণ ধরে ও কেন দেখছে?’

‘ওর অসুখ করেছে, তাই আমি ওকে পড়ে শোনাচ্ছি। তুমি যদি শুনতে না চাও তো চলে যাও, খেলো গিয়ে।’

‘আমি তোমাদের কাছ থেকে বইটা নিয়ে নেব।’

শিশুর মনে অন্য লোকেদের প্রতি যেসব অনুভূতি জাগ্রত হয়, সেগুলি সহজেই শিল্পকর্মের চরিত্রগুলির প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যায়: বাস্তব লোকেদের প্রতি সে যেমন সহানুভূতি পোষণ করে ঠিক তেমনই সহানুভূতি পোষণ করে এই চরিত্রগুলির প্রতি। একই গল্প সে বারবার শুনতে পারে, কিন্তু যেসব অনুভূতি সেই গল্পটি জাগ্রত করেছে তা দুর্বল তো হয়ই না বরং মজবুত হয়ে ওঠে: শিশু গল্পটায় একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার চরিত্রগুলি পরিচিত ও প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

ইতিবাচক নায়করা শিশুর মনে বিশেষ সহানুভূতি উদ্রেক করে, কিন্তু কখনও কখনও সে খলনায়কের প্রতিও করুণা বোধ করতে পারে, যদি খুবই দুরবস্থায় পড়ে সেই খলনায়ক। কিন্তু শিশুরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক চরিত্রগুলির প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে, এবং তাদের প্রিয় নায়ককে ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়।

শিশুর অনুভূতিগুলি তাকে অক্রিয় শ্রোতা থেকে ঘটনাবলীতে সক্রিয় অংশগ্রাহীতে পরিণত করে। যা ঘটতে চলেছে তাতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সে দাবি করতে শুরু করে যে বইটা বন্ধ করা হোক, আর পড়ার দরকার নেই, অথবা যে অংশটা তাকে ভীত করছে সেই অংশটার অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য ভাষ্য বলে তার যেটা মনে হয় সেই রকম

ঘটনাবলী সে নিজেই উদ্ভাবন করে। এ ব্যাপারে শিশু প্রায়শই নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে।

গল্পগুলির সঙ্গে আঁকা ছবিগুলি দেখতে দেখতে প্রাক-স্কুল বয়সের শিশুরা প্রায়শই ঘটনাপ্রবাহের উপরে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করে: মন্দ চরিত্রগুলির ছবি বা নায়ককে বিপন্ন করে তোলার মতো সব পরিস্থিতির ছবি তারা কালি দিয়ে ধেবড়ে দেয় অথবা ঘষে-ঘষে মুছে ফেলে। চার বছর বয়সের একটি মেয়ে ছবিতে দেখানো প্রমিথিউসকে 'মুক্ত' করেছিল তাকে বেঁধে রাখা শিকলগুলি মুছে ফেলে।

অন্য লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক ও তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর অনুভূতিগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, কিন্তু অবশ্যই একমাত্র উৎস নয়। পশুপাখি, গাছপালা, খেলনা, প্রাকৃতিক বস্তু ও ব্যাপারগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে শিশু আনন্দ, মমতা, সহানুভূতি, বিস্ময়, ক্রোধ ও অন্যান্য অনুভূতি বোধ করতে পারে। মানুষের কাজকর্ম ও অনুভূতিগুলি সম্পর্কে প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু যত শেখে, বস্তুসমূহের উপরেও সেগুলিকে আরোপ করার ঝোঁক দেখা যায় তার। একটি ভাঙা ফুল বা গাছের প্রতি সে সহানুভূতি পোষণ করে, যে বৃষ্টি তাকে বাইরে বেড়াতে যেতে বাধা দেয় তার প্রতি সে ক্ষুব্ধ হয়, অথবা যে পাথরটার গায়ে সে ধাক্কা খায় তার উপরে সে ক্রুদ্ধ হয়।

আতঙ্কের প্রচণ্ড অনুভূতি শিশুর অনুভূতিগুলির মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। আতঙ্ক সাধারণত প্রাপ্ত-

বয়স্কদের তরফ থেকে বেঠিকভাবে লালন-পালন করা এবং অযৌক্তিক আচরণের ফল। একটা বিশিষ্ট লক্ষণাত্মক দৃষ্টান্ত হল সেই সমস্ত ব্যাপার, যখন প্রাপ্তবয়স্করা এমন সামান্যতম জিনিস নিয়ে হা-হুতাশ করতে থাকে, যেটা তাদের মতে শিশুর পক্ষে বিপদস্বরূপ। প্রাপ্তবয়স্কদের এই ধরনের আচরণ শিশুর মধ্যে প্রবল শঙ্কা আর ভীতির একটা অবস্থা সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অতি গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা সঠিকভাবে মোকাবিলা করলে কোনো ঘটনা ছাড়াই কেটে যেত, প্রাপ্তবয়স্করা তাকে রূপান্তর করে এক ভয়ংকর ঘটনায়; এর পরিণতি গুরুতর হতে পারে। প্রাপ্তবয়স্করা শিশুর মধ্যে ভয়ও সঞ্চারিত করতে পারে, এটা ঘটে তখন যখন শিশু প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ভয়ের প্রকাশ দেখে। সেই জন্যই শিশুরা বজ্র, ইঁদুর, অন্ধকার প্রভৃতিকে ভয় করা শিখতে শুরু করে। বাধ্যতা আদায় করার জন্য শিশুদের ভয় দেখানো অনুমতিযোগ্য বলে কেউ কেউ মনে করে ('এখানে এসো, নইলে ও তোমায় ধরে নেবে!'; 'তোমাকে যা বলা হচ্ছে তা যদি না কর তা হলে ওই লোকটা তোমায় থলিতে ভর্তি করে নিয়ে যাবে!')।

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রভাব ছাড়াই শিশুরা কখনও কখনও ভয় পায়। শিশু যখন অস্বাভাবিক বা নতুন কিছুর সম্মুখীন হয়, তখন বিস্ময় আর ঔৎসুক্য ছাড়াও তার ভীষণ ভয় হতে পারে। সে ভয় পেতে পারে পরিচিত একটি মুখের অস্বাভাবিক পরিবর্তনে: যখন তা একটি পর্দা দিয়ে ঢাকা হয়, অথবা মাথার উপরে একটা হুড

টেনে দেওয়া হয়, ইত্যাদি। এর বিশিষ্ট লক্ষণসূচক হল অন্ধকারকে ভয় পাওয়া, এর ব্যাখ্যা অনেকখানি পাওয়া যায় এই ঘটনায় যে পরিচিত বস্তুগুলি গুপ্ত থাকে, আর প্রতিটি অকিঞ্চিৎকর শব্দকে মনে হয় অস্বাভাবিক। একটি শিশু যদি একবারও অন্ধকারে ভয় পেয়ে থাকে, তবে পরে অন্ধকারই তাকে ভীত করে তুলবে। ঘনঘন ভীতির অভিজ্ঞতা শিশুর সাধারণ শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে, সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কদের অবশ্যই শিশুর স্বাধীনতাবোধ ও সাহস উদ্রেক করতে হবে ও তাতে মদত দিতে হবে।

অন্যদের সম্পর্কে ভয় — অর্থাৎ, কিছুই শিশুকে বিপন্ন করে না কিন্তু যাদের সে ভালোবাসে তাদের সম্পর্কে সে ভীত — এইসব ধরনের ভয় থেকে নীতিগতভাবে আলাদা। এই ধরনের ভয় হল সহানুভূতির একটা বিশেষ রূপ আর শিশুর মধ্যে এর আবির্ভাব অভিজ্ঞতায় ভাগ নেওয়ার বিকাশমান ক্ষমতার প্রমাণ।

অনুভূতির বিকাশে মূল প্রবণতাগুলি

তিন বা চার বছর বয়সের শিশুর অনুভূতিগুলি যদিও সুস্পষ্ট, তবুও তখনও সেগুলি অবস্থার উপরে অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং অস্থিতিশীল। তাই মায়ের প্রতি শিশুর ভালোবাসা, মাঝে মাঝে উথলে উঠলে তার দরুন শিশু মাকে জড়িয়ে ধরে, তাকে চুমু খায় অথবা আদরের কথা বলে; কিন্তু সেই ভালোবাসা তখনও কাজকর্মের এমন

একটা অলপবিস্তর নিয়ত উৎস হিসেবে কাজ করে না যা মাকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করতে পারে। অপরের জন্য, এমন কি যাদের সে খুবই ভালোবাসে, তাদের জন্যও সহানুভূতি ও উদ্বেগ দীর্ঘকালব্যাপী ধরে রাখতে সে এখনও অক্ষম।

প্রাক্-স্কুল বয়সের একেবারে গোড়ার দিকের ও মাঝামাঝি বয়সের শিশুদের পরিবার-বহির্ভূত সমবয়স্ক শিশুদের প্রতি অনুভূতিগুলি সাধারণত দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। একটি কিণ্ডারগার্টেনে বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে ব্যাপক সংখ্যাধিক ক্ষেত্রেই একটি শিশু পালাক্রমে অনেক শিশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে অবস্থা অনুযায়ী। এই বন্ধুত্ব তার সমবয়সীর প্রতি এক স্থিতিশীল মনোভাবের ভিত্তিতে হয় না, বরং তার ভিত্তি এই যে তারা একসঙ্গে খেলে অথবা একই টেবিলে একসঙ্গে বসে।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে অনুভূতিগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিপুল গভীরতা ও স্থিতিশীলতা লাভ করে। অপেক্ষাকৃত বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের বেলায় তাদের নিকটজনের জন্য অকৃত্রিম উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ, দুশ্চিন্তা বা দুঃখ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য কাজকর্ম লক্ষ করা যায়।

সমবয়সী একজন শিশুর সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্ব অপেক্ষাকৃত বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর বিশিষ্ট লক্ষণসূচক হয়ে ওঠে, যদিও বন্ধুত্ব বদলানোর বহু ঘটনা তখনও থাকে। শিশুদের মধ্যে যখন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তখন যেটা মৌলিক

গুরুত্বপূর্ণ তা আর বাহ্যিক পরিস্থিতি নয়, বরং পরস্পরের প্রতি পছন্দের ভাব, সেই সমবয়সীর একটি বিশেষ বা একাধিক গুণ সম্পর্কে, তার জ্ঞান ও সামর্থ্য সম্পর্কে এক ইতিবাচক মনোভাব ('ভোভা অনেক খেলা জানে...'; 'ওর সঙ্গে থাকতে ভারী মজা আগে'; 'মেয়েটার দয়ামায়া আছে'।)।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে অনুভূতিগুলির বিকাশের অন্যতম প্রধান দিক এই যে মানসিক দিক দিয়ে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশু আরও বেশি 'যুক্তিসংগত' হয়ে ওঠে। শিশু তার চারপাশের পৃথিবীকে সবেমাত্র চিনতে শুরু করছে, বুঝতে শুরু করছে তার কাজকর্মের ফল কী, কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ।

এরকম একটা বহুল প্রচলিত ধারণা আছে যে ছোট শিশুরা পশুপাখির প্রতি প্রায়শই অ-সংবেদনশীল, এমন কি নিষ্ঠুর। পশুপাখির প্রতি আচরণের ব্যাপারে শিশু মাঝে মাঝে যে উদাসীনতা দেখায় তাতে আমরা প্রায়শই বেদনাবোধ করি। সে মাছি পিষে মারে, গুবরে পোকাকে পা দিয়ে চেপে মারে, প্রজাপতি নিয়ে টুকরো টুকরো করে, অথবা বিড়ালছানার গলা চেপে ধরে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পশুপাখির প্রতি যে সহানুভূতি আর দরদের পরিচয় পাওয়া যায়, এটা দেখে তার একেবারে বিপরীত একটা ধারণা হয়। যাই হোক, বহু ক্ষেত্রেই এই ঔদাসীন্য এবং কখনও বা সাবলীল নিষ্ঠুরতার কারণ হল নিতান্তই বোধের অভাব। যে শিশু সব জিনিসের ভিতরটায় প্রবেশ করতে চায় তার অনুসন্ধিৎসা, আর তার সঙ্গে ফল সম্বন্ধে

নিতান্তই শিশুসুলভ অমনোযোগ, এই দুটো মিলে এমন সব আপাতদৃশ্য ক্রিয়া ঘটায় যাকে আমরা গণ্য করি নির্মম ও পাশবিক বলে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর পরিস্থিতি ও তার উপলব্ধি অনুযায়ী অনুভূতিতে একটা পরিবর্তন পরিষ্কারভাবে লক্ষ করা যায় মজাদার ব্যাপার সম্বন্ধে একটা বোধের বিকাশের দৃষ্টান্তে; মজাদার ব্যাপার সম্বন্ধে এই বোধটা দেখা দেয় তখন, যখন সে সম্মুখীন হয় উদ্ভট, অপ্রত্যাশিত কোনোকিছুর, কিংবা এমন কিছুর যা স্বাভাবিক নিয়ম-ছাড়া। সবচেয়ে ছোট প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের মধ্যে মজাদার ব্যাপার সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ পায় সেই সকৌতুক হাসির মধ্যে, যে হাসি শিশুরা হাসে পেত্রুশকার হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি দেখে, উল্টোপাল্টা কথা শুনে, অথবা কারও বাহ্যিক চেহারায় বা পোশাকে কোনো বৈসাদৃশ্য দেখে (যেমন, একজন প্রাপ্তবয়স্কের মাত্রায় একজন শিশুর টুপি)। তারা নিজেরাও এক-একটা জিনিসের অন্য নাম দিয়ে, মুখ ভেংচে, মুখের কথা উল্টে মজা করে। একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা মজাদার ব্যাপার সম্বন্ধে তাদের বোধটা দেখায় আরও বেশি জটিল পরিস্থিতিতে, লোকের আচরণে গরমিল লক্ষ করে, তাদের জ্ঞান আর দক্ষতায় ত্রুটি লক্ষ করে। শিশুদের ঠাট্টার মধ্যে দেখা দেয় একটা লুকনো চিন্তা, তাদের প্রশ্নের উত্তরদাতাকে এমন একটা উত্তরের 'ফাঁদে ধরে ফেলার' প্রচেষ্টা হয়, যে উত্তর বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। তাই ছয় বছর বয়সী আন্দ্রিউশা

জিজ্ঞাসা করে: 'মা, একটা চামচ কি ডুবে যাবে?' — 'নিশ্চয়ই?' — 'আর একটা কাঠের চামচ?'

প্রাক্-স্কুল শৈশবে অনুরূপভাবেই বিকশিত হয় সৌন্দর্যবোধ, শিশুর মধ্যে তা জাগ্রত হয় বস্তুসমূহ, প্রাকৃতিক ব্যাপার বা শিল্পকর্মের সাহায্যে। তিন বা চার বছর বয়সী শিশুর কাছে উজ্জ্বল, চক্চকে একটা খেলনা, নয়নাভিরাম পোশাক প্রভৃতি সুন্দর। কিন্তু একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সে শিশু সৌন্দর্য দেখতে শুরু করে ছন্দে, বর্ণ ও রেখার সুসামঞ্জস্যের মধ্যে, একটা সংগীতের সুরে অথবা নাচের নমনীয়তার মধ্যে। প্রাকৃতিক ব্যাপার, দৃশ্য, উৎসবমুখর শোভাযাত্রা একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর মধ্যে গভীর ভাবাবেগ উদ্রেক করে। শিশু তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে যত ভালোভাবে নিজেকে মানিয়ে নেয়, তার সৌন্দর্যবোধের কারণগুলিও তত বহুবিধ ও জটিল হয়।

'যুক্তিসংগত' অনুভূতির বিকাশ শুধু যে মানুষ, বস্তু আর ঘটনা সংক্রান্ত ভাবাবেগগুলিকেই বেষ্টন করে তা নয়, শিশুর নিজের আচরণের সঙ্গে যুক্ত অনুভূতিগুলিকেও বেষ্টন করে। তিন বছর বয়সের শিশু তার উপরে বর্ষিত প্রাপ্তবয়স্কের প্রশংসায় খুশী হয়, তিরস্কারে দুঃখ পায়। আমরা জানি যে শিশু গর্ব ও লজ্জা বোধ করতে পারে, তা নির্ভর করে প্রাপ্তবয়স্করা তার আচরণের মূল্যায়ন কীভাবে করছে, তার উপরে। কিন্তু এই অনুভূতিগুলি এখনও পর্যন্ত সেই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, ক্রিয়াগুলির বিষয়ে অন্যদের মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে যে আচরণের মান, রীতিপ্রথা আত্তীকরণ ও আত্ম-মূল্যায়নের গঠন ঘটে, তার ফলে এমন একটা অবস্থা দেখা দেয় যখন এই মানগুলিই পালন করা বা উপেক্ষা করার বিষয়টি শিশুকে উদ্বেগ দিতে শুরু করে, তার মধ্যে জাগ্রত করতে থাকে আনন্দ, গর্ব, অথবা অন্যথায় ক্ষোভ বা লজ্জা, এমন কি যখন সে একা থাকে এবং কেউ জানে না যে সে কেমন আচরণ করছে, তখনও।

অনুভূতিগুলির বাহ্যিক প্রকাশও প্রাক্-স্কুল শৈশবে আমূল পরিবর্তিত হয়। প্রথমত, শিশু অনুভূতির কিছুটা প্রচণ্ড বা তীব্র অভিব্যক্তিগুলি সংযত করার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে অর্জন করে। তিন বছর বয়সের শিশুর মতো না কেঁদে, পাঁচ বা ছয় বছর বয়সের শিশু কান্না চেপে রাখতে পারে, ভয় প্রকাশ না-করতে পারে, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, সে আয়ত্ত করে অনুভূতিগুলি 'প্রকাশের ভাষা'; তার বিশেষ সমাজের মধ্যে সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশ করার জন্য যে ধরনের অভিব্যক্তি প্রচলিত — দৃষ্টি, হাসি, অনুকৃতি, অঙ্গভঙ্গি, চালচালন ও গলার স্বর ব্যবহার করে ভাব প্রকাশ করা সে আয়ত্ত করে।

অনুভূতির তীব্রতম অভিব্যক্তিগুলি (কাঁদা, হাসা, চেঁচানো) যদিও মস্তিষ্কের সহজাত বন্দোবস্তটির ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবুও একমাত্র অতি শৈশবেই সেগুলি অনৈচ্ছিক। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিশু সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে, দরকার হলে সেগুলিকে যে দমন করতে শিখবে শুধু তাই নয়, সেগুলিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করতেও শিখবে, তার চারপাশের লোকদের জানাবে

তার অনুভূতিগুলি এবং সেগুলি অনুযায়ী কাজ করবে। অনুভূতি প্রকাশের জন্য লোকে যেসব অজস্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের আশ্রয় নেয়, সেগুলির একটা সামাজিক উৎস আছে, আর শিশু সেগুলি আয়ত্ত করে অনুকরণ করতে করতে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর আচরণে ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলির ভূমিকা

প্রাক্-স্কুল বছরগুলিতে নিজের আচরণ, নিজের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করার সামর্থ্য হিসেবে ইচ্ছাশক্তি আত্মপ্রকাশ করে। শিশু অর্জন করে তার চালচলন নিয়ন্ত্রিত করার সামর্থ্য, যথা ক্লাস চলার সময়ে শিক্ষিকা যেমন চান সেইভাবে শান্ত হয়ে বসে থাকা, ছটফট বা লাফালাফি না-করা। নিজের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারটা শিশুর পক্ষে সহজসাধ্য হয় না। গোড়ার দিকে এটা একটা বিশেষ কাজ, তার জন্য দরকার হয় নিজের উপরে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ, একটি শিশু অপেক্ষাকৃত স্থির হয়ে থাকতে পারে একমাত্র তখনই যখন সে তার হাত, পা আর দেহের অবস্থান লক্ষ করে এবং নজর রাখে যাতে সেগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না-যায়। শিশুরা দেহের অবস্থান ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে পেশীসংক্রান্ত সংবেদনগুলির মধ্য দিয়ে।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু তার উপলব্ধি, স্মরণশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। তিন বছর বয়সের একটি শিশুকে একটা স্কেটিং রিংকে কতকগুলি

শিশুর ছবি দেখিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ওদের মধ্যে কার হাতের দস্তানা খুলে পড়ে গেছে (বরফের উপরে একটি দস্তানা পড়ে আছে এবং একজন স্কেটারকে দেখানো হয়েছে হাতে একটা দস্তানা না-থাকা অবস্থায়), শিশুটি তা বলতে পারে না। তা বলতে পারার জন্য দরকার হল পর পর সব কটি চেহারা ভালো করে দেখা, কিন্তু শিশুর দৃষ্টি একটা থেকে আরেকটা চেহারার দিকে লাফিয়ে যায় এলোমেলোভাবে। পরে, প্রাপ্তবয়স্কদের সহায়তায় শিশু নিজে থেকে লক্ষ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে, এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করতে শুরু করে সাফল্যের সঙ্গে, বস্তুসমূহ ও রূপগুলি প্রণালীবদ্ধভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তার দৃষ্টির গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্মরণে রাখা আর স্মরণ করার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় চতুর্থ বছরে, শিশু যখন নিজের সামনে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারণ করতে শুরু করে — প্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে পাওয়া কোনো নির্দেশ, বা তার ভালো-লাগা কোনো ছড়া মুখস্থ করার জন্য।

মাঝারি ও বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে মানসিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায় তখন, যখন একটা জট-পাকানো ধাঁধা সমাধান করার চেষ্টায় তারা টুকরোগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে একটা সমগ্র রূপ পাওয়ার নানান উপায় সন্ধান করে, ক্রমাগতভাবে একটা রকমফের থেকে আরেকটা রকমফেরের দিকে যায়।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে নিজের ইচ্ছামতো কাজকর্ম আর সামগ্রিক আচরণে সেগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব, দুইয়েরই

পরিবর্তন ঘটে। প্রাক্-স্কুল বয়সের একেবারে গোড়ার দিকে, শিশুর আচরণ প্রায় সম্পূর্ণতই আবেগজ ক্রিয়া দিয়ে গঠিত, ঐচ্ছিক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় শুধু কালেভদ্রে, এবং তাও বিশেষ অনুকূল অবস্থায়। মাঝামাঝি বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে এই রকম দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত বেশি, কিন্তু আচরণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলি তখনও কোনো তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে না। সবচেয়ে বড় প্রাক্-স্কুল বয়সেই শুধু শিশু ইচ্ছাশক্তির তুলনামূলকভাবে দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রচেষ্টা চালাতে সক্ষম হয়, যদিও স্কুলগামী বয়সের শিশুদের চেয়ে এ ব্যাপারে তা অনেক কম। সুতরাং, ঐচ্ছিক কাজকর্মের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ হল প্রাক্-স্কুল বয়সের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু প্রয়োগের পরিসর আর আচরণে সেগুলির স্থান তখনও সীমাবদ্ধ।

শিশুর ইচ্ছাশক্তির বিকাশ আচরণের প্রেষণাগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে এবং প্রাক্-স্কুল বছরগুলিতে প্রেষণাকে অধীনস্থ করার যে ঘটনাটি ঘটে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এক সুনির্দিষ্ট গতিমুখের এই আত্মপ্রকাশ, শিশুর কাছে যেসব প্রেষণা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সেই একগুচ্ছ প্রেষণাকে পুরোভাগে নিয়ে আসার ফলেই নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য, এবং অন্যান্য একটু কম গুরুত্বপূর্ণ প্রেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রণোদনাগুলির বিক্ষিপ্তকর প্রভাবের কাছে নতিস্বীকার না-করার জন্য তার সচেতন প্রয়াস ঘটে।

শিশুর ঐচ্ছিক কাজকর্মের বিকাশে তিনটি পরস্পরসম্পর্কিত দিক আছে: প্রথম, উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজকর্মের বিকাশ; দ্বিতীয়, ক্রিয়ার লক্ষ্য ও তার প্রেষণার মধ্যে এক সম্পর্ক স্থাপন; এবং তৃতীয়, কাজকর্ম সম্পাদনে বাক্‌শক্তি নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজকর্ম সম্পন্ন করাটা অতি শৈশবেই লক্ষ করা যায়। শিশু যখন তার দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটি খেলনার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়, তখন সেটি হয়ে ওঠে সেই লক্ষ্যবস্তু যার দিকে তার ক্রিয়াগুলি চালিত। কিন্তু এই উদ্দেশ্যপূর্ণতা তখনও পর্যন্ত ক্রিয়াটিকে ঐচ্ছিক করে না। বস্তুটি নিজেই, বলা যেতে পারে, শিশুকে আকর্ষণ করে এবং কাজ করার বাসনা উদ্রেক করে, পক্ষান্তরে, স্বাধীনভাবে একটি লক্ষ্য স্থির করা অথবা অন্য কারও দ্বারা উপস্থাপিত একটি লক্ষ্য মেনে নেওয়া — এটাই সত্যিকার ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ। বাইরে থেকে (একটি বস্তু থেকে) নয়, বরং ভিতর থেকে (শিশুর নিজের বাসনা ও আগ্রহ থেকে) আসা উদ্দেশ্যপূর্ণতা বিবর্ধিত হতে শুরু করে বেশ অল্প বয়সেই, তা আত্মপ্রকাশ করে লক্ষ্যগুলি অর্জন করার চাইতে বরং লক্ষ্যগুলি স্থির করার মধ্যেই বেশি: বাহ্যিক অবস্থাগুলি অহরহই শিশুর চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়, তার ফলে সে লক্ষ্যটি পরিত্যাগ করে, অথবা প্রাথমিক পরিকল্পনা বদলায়।

একটা লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করার সামর্থ্য শৈশবে

ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। একটি পরীক্ষাকার্যে, দুই থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের বলা হয়েছিল একটা সংকীর্ণ মঞ্চ বরাবর একটা বলকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যেতে, বলটাকে দু-হাত দিয়ে আলতোভাবে ধাক্কা দিতে দিতে। তাদের বলটার পিছনে পিছনে যেতে হয়েছিল ঝুঁকে পড়ে, বলা যায়, বলটাকে হাতের বাইরে যেতে না-দিয়েই। শিশু অর্ধেক পথ যখন পেরিয়ে এল, তখন তার অভিমুখে সুন্দর একটা খেলনা মোটর গাড়ি চালিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। বেশির ভাগ দুই বছর বয়সী শিশুই বলটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে গাড়িটাকে নিয়ে খেলতে শুরু করল। গাড়িটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ খেলার পর কয়েকজন শিশুর মনে পড়ল বলটার কথা, তারা শেষ পর্যন্ত সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে গেল নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত, আর বাকিরা বলটার কাছে ফিরেই এল না। মাত্র অর্ধেক শিশু কাজটা সম্পূর্ণ করেছিল, কিন্তু তাও তাদের প্রায় সবাই মাঝপথে গাড়িটিকে নিয়ে খেলার জন্য অন্য দিকে মোড় ফিরেছিল। তিন বছর বয়সীরা অনেক বেশি মনোনিবেশের পরিচয় দিয়েছিল। তাদের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কাজটা সম্পূর্ণ করেছিল, গোড়ার দিকের বয়সের শিশুদের তুলনায় তাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল অনেক কম। পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের থেকে শুরু করে সব শিশুই বলটাকে শেষ জায়গা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল; প্রায় কারও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয় নি বললেই চলে।

এটা ছিল তুলনামূলকভাবে সরল কাজ এবং লক্ষ্যে

উপনীত হওয়া গিয়েছিল খুবই তাড়াতাড়ি। প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের বেলায় একটা লক্ষ্যস্থল চোখের সামনে স্থির রাখার ক্ষমতা নির্ভর করে সরাসরি কাজের ভারটার দুরূহতা এবং সেটা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের দৈর্ঘ্যের উপরে। শিশুদের যখন একটা দাবার ছকের ১৫৬টা ঘরকে এক বিশেষ নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী বিভিন্ন রঙের কাউণ্টার দিয়ে ভর্তি করতে বলা হয়েছিল, চার বছর বয়সের একজনও শিশু তা করতে পারে নি; পাঁচ ও ছয় বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র এক সামান্য অংশ কাজটা শেষ করতে পেরেছিল। কিন্তু ঘরগুলোর সংখ্যা যখন কমিয়ে আনা হল (৬৪ ঘরে) তখন চার বছর বয়সী শিশুরা তৎক্ষণাৎ কাজটা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর সামনে যদি এমন একটা কাজ এসে পড়ে, যার জন্য দরকার তুলনামূলকভাবে জটিল ক্রিয়া-পরম্পরা, যেমন একটি বিশেষ ছবি অনুসারে নানা রঙের জ্যামিতিক আকৃতিকে আঠা দিয়ে জোড়া, তা হলে একের পর এক প্রতিটি পরবর্তী পর্যায়ে কী তাকে করতে হবে সে বিষয়ে বাড়তিভাবে মনে করিয়ে দেওয়া আর নির্দেশনা ছাড়া সে সেটা করতে পারবে না। একটি কাজকে ভেঙে ভাগ করে একের পর একটি যোগসূত্রে পরিণত করা, কাজটা করার সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মনে করিয়ে দেওয়া — এটা শিশুকে যে শুধু তার ক্রিয়াগুলি সংগঠিত করতে সাহায্য করে তাই নয়, এই ক্রিয়াগুলির সাধারণ উদ্দেশ্যপূর্ণতাও বাড়ায়, এবং ক্রিয়াগুলি

স্বাধীনভাবে ও ক্রমাগতভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ্যও বিকশিত করে।

কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর মধ্যে উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়া গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্-স্কুল বয়সের গোড়ার দিকের শিশুদের বেলায় অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার উপরে বা লক্ষ্যটা বজায় রাখার কালসীমার উপরে সাফল্য বা ব্যর্থতার কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তখনও পড়ে না। লক্ষ্যে উপনীত হতে না-পারলে তারা দুঃখবোধ করে না। প্রাক্-স্কুল বয়সের মাঝামাঝি পর্যায়ের শিশুদের বেলায়, কাজ সম্পন্ন করায় ব্যর্থতা ঘটলে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দীপনা থেকে তারা বঞ্চিত হয়; কিন্তু যদি কাজ সফল হয়, শিশুরা তা হলে কাজটা সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। প্রাক্-স্কুল বয়সের একটু বড় শিশুদের অধিকাংশই একই রকম আচরণ করে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ নানা জিনিস সম্পর্কে একটা ভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করে এবং যে কোনো মূল্যে অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে, তাদের সামর্থ্য আবার পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ প্রার্থনা করে, পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকার করে একগুঁয়ে হয়ে। যেসমস্ত পরীক্ষাকার্যে একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের দুটি ধাঁধা সমাধান করতে দেওয়া হয়েছিল এবং গোড়ার দিকের প্রচেষ্টার পর তাদের একা একা থাকতে দেওয়া হয়েছিল (কিন্তু গোপনে তাদের উপরে নজর রাখা হয়েছিল), তাতে বেশির ভাগই সফলভাবে সমাধান করার মতো সহজ ধাঁধাটির দিকে ফিরে গিয়েছিল, শুধু কয়েকজন

মাত্র প্রবৃত্ত হয়েছিল তাদের পক্ষে যেটি কঠিন সেটি সমাধান করার কাজে।

স্কুল বয়সের শিশুদেরই বিশিষ্ট লক্ষণসূচক উদ্দেশ্যপূর্ণতার এক নতুন, উচ্চতর স্তর আবিষ্কার করা যায় অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায়।

সরাসরি অনুভূতি ও বাসনা-শাসিত শিশুর কাজকর্মে লক্ষ্য আর প্রেষণাগুলি মিলে যায়। এর অর্থ এই যে কাজকর্মের প্রত্যক্ষ ফলটা যে লক্ষ্যের জন্য তা সম্পন্ন করা হয়েছিল সেই লক্ষ্যও বটে। ছোট শিশু যখন একটি খেলনার দিকে হাতদুটি বাড়ায়, তখন সেটা ঘটে সেই খেলনাটার প্রতি আগ্রহ থেকেই, সেটা পাওয়ার জন্য। লক্ষ্য অর্জন করে — খেলনাটা হস্তগত করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু তার প্রেষণাকেও চরিতার্থ করে। প্রেষণা আর লক্ষ্যের এই সমাপতন প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের অনেক কাজকর্মেরই বিশিষ্ট লক্ষণসূচক। ছবি আঁকার সময়ে শিশু সাধারণত পরিচালিত হয় তার হাতের তলা দিয়ে যে রূপগুলি আত্মপ্রকাশ করছে তার প্রতি আগ্রহের দ্বারা; ব্লক সাজিয়ে বাড়ি তৈরি করার সময়ে সে শুরু করে সুন্দর একটা বাড়ি বানাবার বাসনা থেকে।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে নিজের আচরণকে শাসনে রাখার যে সামর্থ্য দেখা দেয়, তা এমন সমস্ত নতুন ধরনের কাজকর্ম গঠিত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত, যেগুলির লক্ষ্য আর প্রেষণার সমাপতন ঘটে না। একই ছবি আঁকার কাজ শিশু করতে পারে কোনো প্রাপ্তবয়স্কের প্রশংসা পাওয়ার জন্য। সে একটা বাড়ি তৈরি করে যাতে একটা পুতুলকে তার

মধ্যে রাখা যায়। তার ছবি আঁকার বা কিছু তৈরি করার কাজটির প্রত্যক্ষ ফলের সীমানা পেরিয়ে শিশুর নিজের বাসনা ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুদূরতর ফলগুলির রূপরেখা তার সামনে উপস্থিত হয়। এখানে দুটি সম্ভাব্য ঘটনা ঘটতে পারে। একটিতে, যে সুদূরতর প্রেষণার চরিতার্থতার জন্য শিশু কাজটি করছে, সেটা লক্ষ্য — কাজটিরই প্রতি আগ্রহ এবং তার ফলের সঙ্গে মিলে যায়। শিশু ছবি আঁকছে শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য, কিন্তু একই সঙ্গে ছবি আঁকার প্রক্রিয়াটিতেও সে আগ্রহী। এখানে বাড়তি প্রেষণাটি কাজে প্রত্যক্ষ আগ্রহকে শক্তিশালী, দৃঢ় করে এবং রূপায়ণের উচ্চ মান অর্জনে সহায়তা যোগায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি — শিশুর পক্ষে অনেক বেশি দুরূহ — ঘটে তখন, যখন অল্পবিস্তর সুদূর চিত্তাকর্ষক চূড়ান্ত ফল লাভ করার জন্য এমন কিছু করা দরকার, যা এমনিতে আগ্রহ উদ্রেক করার মতো নয় এবং চিত্তাকর্ষকও নয়। এই ক্ষেত্রে ইচ্ছার পরিচয় দরকার হয়।

প্রাক্-স্কুল বয়সের তিন বা চার বছর বয়সী শিশুদের পক্ষে, যে সব কাজের লক্ষ্য ও প্রেষণার সমাপতন ঘটে না সেগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব হয় একমাত্র তখনই, যখন খাস কাজটিই জটিলতাবর্জিত এবং প্রেষণা খুব বেশি সুদূর নয়। একটি দৃষ্টান্ত হল, পরবর্তী **একটি** খেলার জন্য খেলনাগুলিকে প্রস্তুত করা। এই বয়সেও শিশুরা পরিস্থিতিসাপেক্ষ আচরণ দেখিয়ে চলে, তাদের প্রত্যক্ষভাবে গোচরীভূত কোনো কিছু তাদের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এটা দেখা যায় তখন, যখন একটি চিত্তাকর্ষক নতুন খেলনা

লাভ করার মতো শিশুর পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেষণা তার আকর্ষণহীন একটা কাজ করাতে (একটি মোজাইকের টুকরোগুলো কয়েকটা বাক্সের মধ্যে রাখা) বাধ্য করতে পারে শুধু সেই ক্ষেত্রে, যখন সে এই খেলনাটা দেখতে পাচ্ছে না, নিজের মনে কল্পনা করে নিচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কের বর্ণনা থেকে। শিশুর সামনে খেলনাটি রেখে দেওয়াটা খুবই যথেষ্ট যাতে প্রেষণা আর লক্ষ্যের সম্পর্ক তার পক্ষে অদৃশ্য হয়ে যায়। যে খেলনাটি এখন অর্জনসাধ্যতার গণ্ডীর মধ্যে, সেটি শিশুর মনোযোগকে এতখানি আচ্ছন্ন করে ফেলে যে সে আকর্ষণহীন কাজ চালিয়ে যেতে অক্ষম হয় এবং আরও প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে বাঞ্ছিত বস্তুটি পেতে চেষ্টা করে (যেমন তাকে খেলনাটি দেওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের কাছে কাকুতিমিনতি করা)।

একেবারে গোড়ার দিকের প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের এবং প্রায়শই মাঝামাঝি প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদেরও বিশিষ্ট লক্ষণসূচক হল এই বিষয়টি: সুদূরতর কোনো প্রেষণার প্রভাবে কোনো আকর্ষণহীন কাজ সম্পন্ন করা যেখানে দরকার হয়, সেই পরিস্থিতিতে শিশুরা কাজটা করতে শুধু অস্বীকারই করে না, বরং সেটাকে বদলে নিয়ে একটা খেলায় পরিণত করে, এবং এইভাবে সেটাকে আগ্রহোদ্দীপক করে তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন প্রাপ্তবয়স্ক যখন শিশুকে খেলনাগুলিকে তুলে রাখতে বলে (এখানে প্রেষণা হল অনুমোদন লাভ করা), শিশু সেগুলিকে গোছাতে শুরু করে, কিন্তু অচিরেই একটা খেলা

দিয়ে সেই কাজটাকে প্রতিস্থাপিত করে, অথবা তার কাজের মধ্যে খেলার উপাদান ঢোকায়।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে শিশু ক্রমেই বেশি শিক্ষালাভ করতে থাকায়, সে তার কাজকর্মকে কাজকর্মের লক্ষ্য থেকে রীতিমত সুদূর প্রেষণার, বিশেষত সামাজিক চরিত্রের প্রেষণার (আরও ছোট শিশুদের জন্য বা নিজের মায়ের জন্য উপহার তৈরি করা) অধীনস্থ করার সামর্থ্য ক্রমে ক্রমে অর্জন করে। তবে, কাজটা যদি তুলনামূলকভাবে জটিল ও দীর্ঘ হয়, তা হলে, গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাঝামাঝি, এমন কি বেশ বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু প্রেষণাটি মনে রাখে এবং তার কাজকর্মকে তার অধীনস্থ করে একমাত্র সেই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিটির উপস্থিতিতে, কাজটি যে নির্ধারিত করে দিয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি ঘর থেকে চলে যায়, শিশুরা এমন সব জিনিস করতে শুরু করে যা কর্তব্যকর্মটির সঙ্গে মেলে না, অথবা সেই কাজ করা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। এর কারণ এই যে, শিশুর কাছে প্রাপ্তবয়স্ক হল তাদের প্রতিনিধি যাদের জন্য কাজটা করা হচ্ছে। নিজেদের মতো থাকতে দিলে তারা অচিরেই সেই লক্ষ্যটা হারিয়ে ফেলে এবং সে সম্পর্কে আর চিন্তাই করে না। শিশুর কাজকর্ম সংগঠিত করার ব্যাপারে একজন প্রাপ্তবয়স্কের উপস্থিতির যে ঠিক এই গুরুত্ব আছে (কাজটা নিছক তার নিজের কর্তৃত্বের কল্যাণেই ঘটে না), সেটা প্রকাশ পায় প্রাপ্তবয়স্ক যখন চলে যায় এবং নিজের জায়গায় রেখে যায় বার্তাবহের ভূমিকা পালনকারী একটি বা দুটি শিশুকে, যাদের কাজ হয় আগে

প্রস্তুত করা উপহারগুলি বাকি শিশুদের দেওয়া। বার্তাবহদের উপস্থিতি তাদের সমবয়সীদের সক্ষম করে তোলে লক্ষ্যে অটল থাকতে এবং কাজটা শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে।

এইভাবে, কাজকর্মকে তুলনামূলকভাবে সুদূর প্রেষণার অধীনস্থ করা এবং সেই সমস্ত প্রেষণা ও লক্ষ্যের — সেই কাজকর্ম প্রত্যক্ষ ফলের মধ্যে সম্পর্কসূত্র প্রতিষ্ঠা করা যদিও প্রাক্-স্কুল বয়সে প্রকাশমান হয়, কিন্তু তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে গঠিত নয় এবং বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা তার শক্তিবৃদ্ধি দরকার।

যে পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ক্রিয়াশীল দুটি সংঘর্ষশীল প্রেষণা থাকে, সেখানে শিশুর ইচ্ছাশক্তির উপরে বিশেষ চাপ পড়ে। তার পক্ষে বেছে নেওয়া দরকার হয় দুটি সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে একটিকে, এবং এই পরিস্থিতিতে দেখা দেয় প্রেষণাগুলির সংগ্রাম, শেষ পর্যন্ত তার একটি জয়যুক্ত হয়।

অতি কম বয়সে শিশুর আচরণের বিশিষ্টতাগুলি পরীক্ষা করে দেখার সময়ে আমরা দেখেছি যে বিপরীত প্রেষণাগুলির সংঘাতে উদ্ভূত আভ্যন্তরিক সংঘাত ঘটা সম্ভব। কিন্তু শিশু বেশির ভাগ সময়েই প্রবলতর প্রেষণার প্রভাবে সচেতনভাবে বাছাই না করেই কাজ করে। বাছাইয়ের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, তেমন পরিস্থিতি অতি ছোট শিশুর পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই বাছাই করতে গিয়ে সে কোনোরূপ সিদ্ধান্তই নিতে অপারগ। একটি শিশুকে যখন বলা হয় অনেকগুলো খেলনার ভিতর থেকে তার যেটা

সবচেয়ে বেশি পছন্দ সেটাকে বেছে নিতে, তখন সে অনেকক্ষণ ধরে ইতস্তত করে, অবশেষে সেগুলির মধ্যে একটিকে নেয়। কিন্তু এর পরে যদি তাকে তার বেছে নেওয়া খেলনাটি নিয়ে আরেক ঘরে চলে যেতে বলা হয়, তা হলে যেতে রাজী হবে না, খেলনাটিকে তার জায়গায় রেখে দিয়ে বাকি খেলনাগুলির মধ্য থেকে আবার তাড়াতাড়ি বাছতে শুরু করবে।

খেলনা বেছে নেওয়ার ব্যাপারটি যেখানে জড়িত সেই পরিস্থিতিতে প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। এমন কি কনিষ্ঠতম প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর বেলাতেও আমরা নির্বাচনের ব্যাপারে এক ধীরস্থির ও গুরুগম্ভীর মনোভাব লক্ষ করি; ইতস্তত ভাবটা সংক্ষিপ্ত হয়। শিশুদের বাছাইয়ের একটা ভিত্তি থাকে এবং সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তে তাদের কাছে যেটা নেই অথচ যেটাকে তারা পেতে চায়, তারা সেটাকেই নেয়। এটা দেখায় যে প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা, কিছু পরিমাণে, তাদের প্রেষণাগুলি বিচার-বিবেচনা করতে পারে এবং সেগুলির একটিকে সচেতনভাবে অগ্রাধিকার দিতে পারে। কিন্তু, প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু এই ধরনের বিবেচনাবোধ দেখায় একমাত্র সরলতম ক্ষেত্রগুলিতেই, যেখানে ব্যাপারটা হল অনুরূপ বাসনাগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া (একটি অথবা অন্য একটি খেলনা নেওয়া)। যে পরিস্থিতিতে এক দিকে যেসব নৈতিক মান ও আচরণের রীতির সঙ্গে সে ইতিমধ্যেই পরিচিত আর অন্য দিকে সেই পরিস্থিতিজনিত বাসনা ও

অনুভূতিগুলির মধ্যে যখন সংঘাত বাধে, তখন শিশুর পক্ষে একটা যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক বেশি কঠিন হয়।

শিশুদের যেখানে একটি আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছিল সেই পরিস্থিতিতে শিশুদের আচরণ দেখায় যে অপেক্ষাকৃত ছোট প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা প্রায়শই খুব ছোট শিশুর মতো আচরণ করে এবং তাদের বাসনাগুলি জয় করতে পারে না। আবার অন্য দিকে, তিন থেকে চার বছর বয়সের অনেক শিশুই প্রলোভন প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এই বয়সের একটি শিশু হঠাৎ বিশেষ একভাবে আচরণ করতে চাইতে পারে, যেমন বাবা-মার সঙ্গে দোকানে গেলেও তাদের সে একটা খেলনা কিনে দিতে বলে না, অন্য শিশুদের সঙ্গে নিজের খেলনাগুলি ভাগ করে নেয়, সে দাবি করে না যাতে তার জন্য বসার জায়গা দেওয়া হোক। এরূপ অভিপ্রায়গুলি শিশুর আচরণকে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। ছোট একটি শিশু কোনো কিছু চাইবার আবেগজ বাসনা দমন করছে, এমনটা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। এটা করার সময়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রলোভনের বস্তুটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সে সমাধানগুলির একটা যুক্তিসংগত বাছাইয়ের সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায়। এর ভিত্তি হল শিশুর মধ্যে ক্রমবিকাশমান প্রেষণাগুলির সমন্বয়: সিদ্ধান্তটা নির্ধারিত হতে শুরু করে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রেষণা দিয়ে, সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে প্রেষণাটি প্রবলতর সেটি দিয়ে নয়। এর ফলে ঘটে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বিকাশ, পরিস্থিতিভিত্তিক বাসনা,

অনুভূতি ও সেগুলির বহিঃপ্রকাশ সংযত করার সামর্থ্যের বিকাশ এবং তা শিশুর ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করে। কিন্তু প্রাক্-স্কুল বয়সের বড় শিশুর বেলাতেও, বাছাই আর ভিন্ন ভিন্ন প্রেষণার সংঘাত যার সঙ্গে জড়িত এমন সব ঐচ্ছিক কাজকর্ম সব সময়েই যে অপেক্ষাকৃত বেশি তাৎপর্যপূর্ণ প্রেষণাটির অনুকূলে একটি সিদ্ধান্তের মধ্যে শেষ হয়, মোটেই তা নয়। তা নির্ভর করে শিশুর বিশিষ্ট প্রলক্ষণগুলির উপরে এবং বাছাইটা যে পরিস্থিতিতে করা হচ্ছে তার উপরে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত শিশুর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে তার একটি হল অন্য লোকেদের, হয় প্রাপ্তবয়স্কদের না হয় তার সমবয়সী শিশুদের উপস্থিতি এবং তাদের মূল্যায়ন। শিশু যখন তার সমবয়সী সঙ্গীদের মধ্যে অথবা প্রাপ্তবয়স্কদের উপস্থিতির মধ্যে থাকে তখন তার প্রত্যক্ষ আবেগের তাড়নাগুলিকে সে যত সংযত রাখতে পারে, একা থাকলে সেগুলিকে সংযত রাখতে পারে তার চেয়ে অনেক কম।

ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করা নির্ভর করে মৌখিক পরিকল্পনা আর নিয়মনের উপরে। মৌখিক রূপেই শিশু তার অভিপ্রায়গুলি সূত্রায়িত করে নিজের জন্য, নানান প্রেষণার মধ্যে সংগ্রামে সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের সঙ্গে আলোচনা করে, একটা জিনিস সে কেন করছে নিজেকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং তার অভীষ্ট অর্জন করার জন্য নিজেকে নির্দেশ দেয়। বাক্শক্তি সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর আচরণে এই নিয়মনমূলক গুরুত্ব অর্জন করে না। নিজের কাজকর্মকে মৌখিকভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত

করার সামর্থ্য সে ক্রমে ক্রমে অর্জন করে, তার আচরণ পরিচালিত করার যে রূপগুলি আগে প্রাপ্তবয়স্করা প্রয়োগ করেছিল, সেগুলিকে সে নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

প্রাক্-স্কুল শৈশবের শুরুতেই শিশু ভালোভাবে কথা বুঝতে পারে এবং তার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আদান-প্রদানে ব্যাপকভাবে তা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তা হলেও মৌখিক নির্দেশনা থেকে আসা জটিল কাজকর্ম সে তখনও পর্যন্ত সম্পন্ন করতে অক্ষম। প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে নির্দেশনা তাকে কিছু করতে বা তা বন্ধ করতে উদ্দীপিত করতে পারে। শিশুর নিজের বাক্‌শক্তির ব্যাপারে বলা যায়, এই সময়ে তা তার কাজকর্মের সহগামী এবং তার ফল প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত কাজটার পরিকল্পনা করে না বা কাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। শিশু তার কাজের লক্ষ্য কথায় বর্ণনা করতে পারে বটে (একটা বাড়ি আঁকা বা তৈরি করা, ডাক্তারের ভূমিকায় খেলা), কিন্তু অভিপ্রেত কাজটি সে কীভাবে করবে তা সে কখনও মৌখিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে না।

চার বছর বয়সী শিশুর পক্ষে প্রাপ্তবয়স্কদের মৌখিক নির্দেশগুলি দৃঢ়তর তাৎপর্য অর্জন করে। নির্দেশগুলি পাওয়া ও বোঝার পর শিশু তৎক্ষণাৎ সঠিকভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা বোতাম টেপে, এবং যখন নিষ্প্রয়োজন তখন টেপে না), প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশ তার দরকার হয় না। শিশু তার নিজের মুখের ভাষাকে ব্যবহার করতে শুরু করে নিজের কাজকর্মের পরিকল্পনা করার জন্য (‘আমি একটা জঙ্গল

আঁকতে যাচ্ছি। আমি অনেকগুলো গাছ আঁকব, তার পরে আঁকব একটা খরগোস।') এবং সেই কাজকর্ম পরিচালন করার জন্য। এটা করার সময়ে শিশু সাধারণত জোরে জোরেই কথা বলে। কিন্তু শিশুদের বেলায় নিজেদের কাজকর্মের মৌখিক নিয়ন্ত্রণ খুবই ত্রুটিপূর্ণ। শিশুকে যখন তার কাজকর্মের প্রেষণা আর লক্ষ্য দুটোকেই স্বাধীনভাবে বজায় রাখতে হয় তখন সে যেসব অসুবিধা ভোগ করে, তার অনেকখানি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই থেকে। যেসব বাহ্যিক উৎস শিশু কী করছে এবং কেন করছে তা তাকে মনে করিয়ে দেয়, সেগুলির গুরুত্বও সুস্পষ্ট।

পাঁচ বা ছয় বছরের একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনা-মূলকভাবে জটিল মৌখিক নির্দেশ পালন করতে পারে। নিজের কাজকর্মের মৌখিক পরিকল্পনা করার ব্যাপারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার আশ্রয় নেয় না, বরং নিজের মনে মনে পরিকল্পনা স্থির করে এবং নিজের ক্রিয়া পরিচালনা করে। কিন্তু কোনো প্রবল বাসনা দমন করা দরকার এমন ধরনের কোনো কঠিন অবস্থায়, এমন কি ছয় বছর বয়সের শিশুও প্রায়শই নিজেদের পরিচালিত করে জোরে জোরে কথা বলে।

অধ্যায় ১১। খেলাভিত্তিক কাজ

শিশুর পক্ষে খেলা একটা গুরুতর ব্যাপার। তা স্বয়ং জীবন, অবধারণ ও কাজ; তা হল আত্ম-জয় করা।

শিশুদের খেলা পরিচালনা করা প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে একটা সমস্যা। সম্ভবত এখানেই প্রাপ্তবয়স্কের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ, ধৈর্য, সুবিবেচনাপূর্ণ আচরণ আর শিশুকে পক্ষপাতহীনভাবে দেখার সামর্থ্য দরকার। ভূমিকা পালনের খেলায় শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে এক সম্মিলিত জীবনের জন্য নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে এবং এক বিশেষ খেলার রূপে প্রাপ্তবয়স্কের সম্পর্ক ও কাজমূলক ক্রিয়াকে নতুন রূপে সৃষ্টি করে।

ভূমিকা পালনের খেলার উপাদানগুলি বিকশিত হতে শুরু করে অতি শৈশবে। প্রাক্-স্কুল বয়সে খেলা হয়ে ওঠে কাজের প্রধান রূপ।

খেলাভিত্তিক কাজের সাধারণ চারিত্রবৈশিষ্ট্য

একটি শিশু যখন কোনো একটি জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে অথবা এমন কিছু করে যেটা কীভাবে করতে হয় তা একজন প্রাপ্তবয়স্ক তাকে দেখিয়ে দিয়েছে (বিশেষত

এই ক্রিয়াটি যদি করা হয় একটি খেলনা দিয়ে, আসল বস্তুটি দিয়ে নয়), তখন আমরা বলি যে শিশুটি খেলছে। কিন্তু প্রকৃত খেলাভিত্তিক ক্রিয়া দেখা দেয় একমাত্র তখনই, যখন শিশু একটি ক্রিয়াকে ব্যবহার করে আরেকটি ক্রিয়া হুবহু অনুকরণ করা বা বোঝাবার জন্য, এবং একটি বস্তুকে ব্যবহার করে আরেকটি বস্তুকে বোঝাবার জন্য। খেলাভিত্তিক ক্রিয়া প্রতীকী, আর এখানেই শিশুর চৈতন্যের বিকাশমান প্রতীকীকরণ ক্রিয়াটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। খেলায় তার আত্মপ্রকাশের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। খেলায় যে প্রতিকল্পগুলি নানান বস্তুর বদলে ব্যবহৃত হয় সেগুলির মধ্যে সাদৃশ্যটা উপস্থাপিত বাস্তবের সঙ্গে একটা আঁকা ছবির যতটা মিল থাকে তার চাইতে অনেক কম হতে পারে। তা সত্ত্বেও, সেগুলি দিয়ে কাজ করা অবশ্যই সম্ভব হয়, যেমনভাবে কাজ করা যায় প্রতিকল্পিত বস্তুটি দিয়ে। সুতরাং, নিজেই প্রতিকল্প বস্তুটির নাম দেওয়া এবং তার প্রতি কতকগুলি গুণ আরোপ করার সময়ে শিশু সেই প্রতিকল্প বস্তুটিরই কিছু কিছু গুণকে গণ্য করে। বস্তু-প্রতিকল্পগুলি নির্বাচনের সময়ে প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু বাস্তব বস্তু-সম্পর্ক থেকে অগ্রসর হয়। যেমন, সে মেনে নিতে রাজী যে একটা অর্ধেক দেশলাই কাঠি হবে বাচ্চা ভালুক, গোটা দেশলাই কাঠি মা ভালুক, আর দেশলাই বাক্সটা বাচ্চা ভালুকের ছোট্ট বিছানা। কিন্তু আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, সে এমন একটা পরিবর্তিত ভাষ্য কখনোই মেনে

নেবে না যে বাক্সটা বাচ্চা ভালুক আর দেশলাই কাঠিটা বিছানা। একটি শিশুর প্রতিক্রিয়া হয় সাধারণত এই: 'এ রকম হয় না।'

খেলায় শিশু শুধু বস্তুগুলির প্রতিকল্পই খাড়া করে না, নিজেও একটা ভূমিকা নেয় এবং এই ভূমিকা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে। খেলায়, লোকজনের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আর প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকার ও ও দায়দায়িত্ব শিশুর কাছে প্রথম উন্মোচিত হয়।

ভূমিকার খেলায়, শিশুদের মধ্যে প্রতিফলন ঘটে তাদের চারপাশের বহুবিচিত্র বাস্তব অবস্থার। তারা পুনরুপস্থাপিত করে পারিবারিক জীবন থেকে, প্রাপ্তবয়স্কদের সক্রিয় কাজকর্ম ও শ্রম-সম্পর্ক থেকে নানান দৃশ্য, এবং তাদের দেশের জীবনে যুগান্তকারী ঘটনাগুলির প্রতিফলন ঘটায়। যে বাস্তবের সংস্পর্শে শিশু আসে তা যত বিস্তৃত হয়, খেলার বিষয়গুলি ততই বেশি ব্যাপক ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তাই, ছোট প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর খেলার বিষয়বস্তু স্বভাবতই সীমিতসংখ্যক থাকে, আর একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর থাকে অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিধি।

বিষয়ের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যের সঙ্গে আসে খেলাগুলির স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি। তিন থেকে চার বছরের শিশুদের বেলায় একটা খেলার স্থায়িত্বকাল মাত্র ১০-১৫ মিনিট, চার থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের বেলায় তা বেড়ে হয় ৪০-৫০ মিনিট, আর একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের

শিশুদের বেলায় খেলা চলতে পারে কয়েক ঘণ্টা ধরে, কিংবা এমন কি কয়েক দিন ধরেও।

প্রাক্-স্কুল বয়সের সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে বড় উভয় প্রকার শিশুদেরই অভিন্ন কতকগুলি খেলার বিষয় থাকে (মা আর মেয়ে, কিণ্ডারগার্টেন), কিন্তু সেগুলি কার্যকর করা হয় ভিন্নভাবে: একই বিষয়বস্তুর ছকের মধ্যে খেলাটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'মেরু অভিযাত্রী' খেলাটা সবচেয়ে ছোট শিশুর বেলায় সংকুচিত হয়ে আসে একটি ক্রিয়ায় — একটা বরফ-ভাঙা জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া। পরে এই মেরু মহাকাব্যে অংশগ্রাহীদের মধ্যে একটা সামাজিক পদমর্যাদার সোপানতন্ত্র দেখা দেয় (সবচেয়ে প্রধান কে?), যেমন দেখা দেয় ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনিয়ার, রেডিও অপারেটর প্রভৃতির আচরণ বিধি। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রে আনা হয় আভ্যন্তরিক সামাজিক সম্পর্ককে (নৈতিক ও উচ্চতর ভাবাবেগগত বিষয়গুলি)।

বিষয়বস্তুর পাশাপাশি আমাদের চিনে নিতে হবে ভূমিকার খেলার অন্তর্বস্তুটিকেও, অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মূল বিষয় হিসেবে শিশু কী বেছে নেয়। বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীর শিশুরা একটা খেলার মধ্যে নিয়ে আসে বিভিন্ন ধরনের অন্তর্বস্তু। সবচেয়ে ছোট প্রাক্-স্কুল বয়ঃগোষ্ঠীর শিশুরা একই বস্তু দিয়ে একই ক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করবে বারবার। 'ডিনার খাওয়া' খেলতে গিয়ে ছোট শিশুরা রুটি কাটে, পরিজ রাঁধে এবং পিরিচগুলো

ধোয়, কিন্তু টেবিলের কাছে বসে-থাকা পুতুলগুলোকে সেই কাটা রুটি দেয় না, রাঁধা পরিজ তুলে এক-একটা পিরিচে পরিবেশন করে না, আর পরিষ্কার থাকা অবস্থাতেই পিরিচগুলো ধোয়। এখানে খেলার অন্তর্বস্তুটা একান্তভাবেই বস্তুগুলি নিয়ে ক্রিয়াকলাপে পর্যবসিত।

খেলার বিষয়বস্তু, খেলার ভূমিকার মতোই, ছোট প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর দ্বারা সাধারণত পরিকল্পিত হয় না, বরং হাতের কাছে যে জিনিসটা পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। একটা থার্মোমিটার পেলে সে একজন ডাক্তার; একটা রান্নার পাত্র পেলে সে রাঁধুনি। শিশুদের মধ্যে মূল বিরোধটা বাধে এমন একটা জিনিসের দখল নিয়ে, যেটা দিয়ে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যায়। তাই প্রায়শই একটা গাড়িতে থাকে দুজন ড্রাইভার, একাধিক ডাক্তার পরীক্ষা করে একজন রোগীকে, রান্না করে একাধিক রাঁধুনি। এখান থেকে আমরা পাই ভূমিকার ঘনঘন পরিবর্তন, যা একটি বস্তু থেকে আরেকটি বস্তুতে স্থানান্তরণের সঙ্গে জড়িত। সেই সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই তিন থেকে চার বছর বয়সের শিশুদের বেলায় লোকজনের মধ্যেকার সম্পর্ক একটা খেলার অন্তর্বস্তু হতে পারে, কিন্তু তখনও বিষয়বস্তুগুলি পরিধিতে অত্যন্ত সংকীর্ণ, সীমিতসংখ্যক। সাধারণত এমন কতকগুলি খেলা থাকে যেগুলি শিশুদের নিজেদেরই প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

পরে লোকজনের সম্পর্ক যথাযথ পুনরুপস্থিত করাই

হয়ে ওঠে খেলায় প্রধান বিষয়। চার থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশু একটা খেলায় যে ক্রিয়াগুলি করে সেগুলি আর অন্তহীনভাবে পুনরাবৃত্তি হয় না, বরং একটা ক্রিয়া আরেকটা ক্রিয়ার স্থান নেয়। এর মধ্যেই প্রকাশ পায় গৃহীত ভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকজন লোকের প্রতি বা একটি পুতুলের প্রতি এক বিশেষ মনোভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'ডিনার খাওয়া' খেলতে গিয়ে একটি শিশু রুটি কেটে সেটা টেবিলের উপরে রাখে। শিশুদের প্রতিভূ পুতুলগুলিকে পরিজ খেতে দিয়ে যে শিশু মায়ের বা সেবিকার ভূমিকা গ্রহণ করেছে সে নজর রাখে যাতে শিশুরা (পুতুলগুলি) নিজের নিজের পরিজ খেয়ে শেষ করে এবং খেতে-খেতে পরস্পরের সঙ্গে কথা না বলে।

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে বুঝতে পারে লোকেদের সামাজিক ক্রিয়াগুলি এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারক নিয়মগুলি।

পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুদের ভূমিকার খেলার অন্তর্বস্তু হয় গৃহীত ভূমিকা থেকে উৎসারিত নিয়মগুলির অধীনতা। এই বয়সের শিশুরা নিয়ম মেনে চলার ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে হয় এবং যা ঘটে তাই নিয়ে ঝগড়া করে: 'মায়েরা এরকমভাবে করে না।'; 'ডাক্তার কি এইভাবে রোগীকে দেখে নাকি?'

এইভাবে ভূমিকার খেলায় বিষয়বস্তু আর অন্তর্বস্তুর বিকাশ শিশুর চারপাশের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের মধ্যে তার গভীরতর প্রবেশকে প্রতিফলিত করে।

খেলায় শিশুদের দুই ধরনের সম্পর্ক থাকে — ভান-করা আর বাস্তব। ভান-করা সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বিষয়বস্তু ও ভূমিকা অনুযায়ী সম্পর্ক। তাই, কোনো শিশু যদি খলনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে, তা হলে বিষয়টি অনুযায়ী সে অন্যান্য ভূমিকা পালনকারী শিশুদের প্রতি আচরণ করবে অতিরঞ্জিত শয়তানির সঙ্গে। বাস্তব সম্পর্ক হল একটা অভিন্ন ক্রিয়ায় রত অংশীদার ও সাথী হিসেবে শিশুদের সম্পর্ক। একটি বিষয় সম্পর্কে, ভূমিকা বণ্টন সম্পর্কে তারা কথা বলতে পারে, এবং খেলার সময়ে যেসব সমস্যা ও ভুল-বোঝাবুঝি দেখা দেয় তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক দেখা দেয়। খেলা শিশুর কাছে দাবি করে এইসব গুণ, যেমন — উদ্যোগ, মিশুক হওয়ার ক্ষমতা আর তার সমবয়সী গোষ্ঠীর কাজের সঙ্গে নিজের কাজের সমন্বয়সাধনের সামর্থ্য, যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা করার গুণ।

যোগাযোগের প্রাথমিক উপাদানগুলি দেখা দেয় খুব কম বয়সেই, শিশুরা যখন পর্যন্ত কোনো এক বিষয়ের ভিত্তিতে একটা বিশদ খেলা গড়ে তুলতে পারে না অথচ প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে খেলতে পারে, সেই সময়েই। খেলার বিকাশের এই কালপর্বে শিশু সাধারণত নিজের কাজকর্মের দিকেই মনোনিবেশ করে, অন্য শিশু কী করছে সে দিকে নজর দেয় সামান্যই। তা সত্ত্বেও, এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে, যেখানে নিজের খেলা যথেষ্ট হয়ে যাওয়ার পর শিশু আরেকটি শিশুর খেলা লক্ষ করতে

শুরু করে। তার সমবয়সীর খেলার প্রতি আগ্রহের ফলে নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা ঘটে। সম্পর্কের প্রথম ধরনগুলি প্রকাশ পায় অপর শিশুটির কাছাকাছি যাওয়ার বাসনায়, তার পাশাপাশি খেলার বাসনায়, নিজের খেলায় যে জায়গাটি অধিকৃত তার একটা অংশ ছেড়ে দেওয়ার বাসনায়, অথবা তাদের চোখাচোখি হওয়ার মুহূর্তে অপরের প্রতি মৃদু হাসিতে। এই সমস্ত সামান্য যোগাযোগ তখনও পর্যন্ত খেলার সারমর্মকে পরিবর্তিত করে না; প্রত্যেক শিশু তখনও নিজের নিজের খেলাই খেলে।

পরবর্তী পর্যায়ে (তিন থেকে চার বছর বয়সে) সে তার সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে মেলামেশা করতে শুরু করে। সম্মিলিত কাজকর্মের জন্য, যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সে কারণ সন্ধান করে সক্রিয়ভাবে। এই ক্ষেত্রে, সম্পর্কের স্থায়িত্বকাল নির্ভর করে শিশু খেলার বস্তুগুলির ব্যবহার কতখানি আয়ত্ত করেছে, তার উপরে, এবং খেলার একটা পরিকল্পন সৃষ্টি ও রূপায়িত করার সামর্থ্যের উপরে।

খেলা যখন শুধু খেলনা নিয়ে প্রাথমিকতম নাড়াচাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেই সময়টায় সমবয়সী কারও সঙ্গে শিশুর সম্মিলিত কাজকর্ম স্বল্পস্থায়ী হয়। খেলার অন্তর্বস্তুটি তখনও পর্যন্ত একটা স্থিতিশীল আদান-প্রদানের ভিত্তি যোগায় না, এই পর্যায়ে শিশুরা খেলনা বিনিময় করতে পারে, একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে।

খেলার দক্ষতা যত বেড়ে উঠতে থাকে এবং খেলার

পরিকল্পনগুলি যত বেশি জটিল হয়ে উঠতে থাকে, শিশু তত দীর্ঘস্থায়ী আদান-প্রদানের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। তার চাহিদাটা আসে সেই খেলা থেকেই এবং সেই খেলাই তার সহায়তা দেয়। প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করে শিশু লক্ষ করে যে এই জীবন অবিরত চলে সমাজের মধ্যে, অন্য লোকেদের সঙ্গে সম্পর্কিত রূপে। মা বাবার সঙ্গে কথা বলেন, পারিবারিক ভোজন পরিবেশন করেন এবং টেবিলে শিশুসন্তানের আচরণের দিকে নজর রাখেন। দোকানের কর্মচারী ক্রেতাদের সেবা করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে আর নার্স তাকে সাহায্য করে, ইত্যাদি। খেলার মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুপস্থিত করার বাসনার ফলে শিশু তার সঙ্গে খেলার মতো শরিকদের প্রয়োজন বোধ করতে শুরু করে। এ থেকেই দেখা দেয় অন্য শিশুদের সঙ্গে ঐকমত্যে আসার এবং একাধিক ভূমিকা যাতে জড়িত এমন সব খেলা একসঙ্গে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা।

সম্মিলিত খেলায় শিশুরা সামাজিক মেলামেশার ভাষা শেখে, আরেকজনের কাজকর্মের সঙ্গে নিজের কাজের সমন্বয়সাধন করতে শেখে এবং পরস্পরকে বুঝতে ও সাহায্য করতে শেখে।

সম্মিলিত খেলায় শিশুদের একত্র হওয়াটা খেলার অন্তর্বস্তুকে আরও সমৃদ্ধ ও জটিল করার কাজকে সহজতর করে। প্রতিটি শিশুর অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ: প্রাপ্তবয়স্কের কাজকর্মের তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ একটা গণ্ডির সঙ্গেই সে পরিচিত। খেলায় একটা অভিজ্ঞতা বিনিময় ঘটে।

শিশুরা পরস্পরের অর্জিত কৃতিত্বগুলি নকল করে এবং সাহায্যের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের শরণাপন্ন হয়। ফলে, খেলাগুলি হয়ে ওঠে আরও চিত্তাকর্ষক ও নানাবিধ। একটা খেলার অন্তর্বস্তুর জটিলতার ফলে আবার প্রকৃত সম্পর্কের জটিলতা ঘটে, অংশগ্রাহীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় এবং তাদের কাজকর্মের বিশদতর সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

শিশুদের বিষয়বস্তুভিত্তিক খেলা আর তাদের বাস্তব সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য থাকে মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্বস্তুর দিক দিয়ে। বিশেষভাবে চালানো নিরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বিষয়বস্তুগত ভূমিকার সম্পর্ক যেখানে জড়িত, এমন সব পরিস্থিতিতে শিশুরা নৈতিক মান ও নিয়মগুলি মেনে চলে দৈনন্দিন জীবনের পরিস্থিতির তুলনায় অনেক ভালোভাবে। বাস্তব জীবনের সম্পর্ক শিশুদের মধ্যে খেলার সম্পর্কের তুলনায় অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি করে: খেলায় বিশেষ একটি ভূমিকা গ্রহণকারী একটি শিশু সহজেই সেই ভূমিকাটির প্রয়োজনানুযায়ী সমস্ত করণীয় কাজ সম্পন্ন করে, নৈতিক নিয়মগুলি সহ। একজন শিশু স্বীয় ভূমিকায় কাজ করে, তখন নৈতিক আচরণের মানগুলি চাপ সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে আভ্যন্তরিক বিরোধ দেখা দিতে পারে।

একটা বিশদ প্রকল্প সৃষ্টি করা এবং সম্মিলিত কাজকর্মের পরিকল্পনা করার সামর্থ্য বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে শিশু বোধ করে যে খেলোয়াড়দের মধ্যে তার স্থানটা আবিষ্কার করা দরকার, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা,

খেলোয়াড়দের ইচ্ছা বোঝা এবং তাদের সঙ্গে নিজের ইচ্ছা আর ক্ষমতাকে মানিয়ে নেওয়া দরকার। এটা করতে গিয়ে প্রত্যেক শিশুই খেলাটির সাধারণ পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং শিশুদের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীটির গঠনবিন্যাস অনুযায়ী আচরণ করতে শেখে। একটা খেলায় যোগ দিয়ে শিশুরা ব্যক্তিগত অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। একজন আদেশের স্বরে চেঁচিয়ে বলে: 'আমি হব সর্দার! আমি!' শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ শান্তভাবেই এটা মেনে নেবে। কিন্তু এমনও একটি শিশু থাকতে পারে, যার কাছে এই প্রস্তাবটা পছন্দসই নয়, তখন দেখা দেয় বিরোধ। ভূমিকা ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট শিশুটি খেলায় অংশগ্রহণে অস্বীকার করতে পারে সোজাসুজি: 'তোমাদের সঙ্গে আমি খেলব না। ব্যস!' আবার প্রধান ভূমিকার দাবিদারকেও সে হটিয়ে দিতে পারে: 'সবাই এ দিকে এসো! আমি হুকুম দেব!'

শিশুরা যদি নিজেদের মধ্যে একমত হতে না পারে তো খেলাটা ভেঙে যাবে, কিন্তু খেলায় আগ্রহ আর অংশগ্রহণ করার বাসনার ফলে শিশুরা পারস্পরিকভাবে কিছু কিছু রেয়াত দেয়।

মনোগত ক্রিয়ার বিকাশে খেলার ভূমিকা

একজন শিশুর মনোগত গুণগুলি ও ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাগুলি সবচেয়ে নিবিড়ভাবে বিকশিত হয় খেলাভিত্তিক কাজকর্মে। অন্য ধরনের যেসব কাজ পরে নিজস্ব এক গুরুত্ব অর্জন করে, সেগুলিও গড়ে ওঠে খেলার সময়ে।

আগ্রহ হিসেবে, সে আগ্রহ খেলার জন্য একটা পরিকল্পন অনুযায়ী একটা ছবি আঁকা বা কিছু বানানোর প্রক্রিয়াটির দিকে চালিত; একমাত্র মাঝামাঝি ও একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সেই আগ্রহটা স্থানান্তরিত হয় কাজটির ফলের দিকে এবং তা খেলার প্রভাবমুক্ত হয়।

খেলার ভিতরেই গড়ে উঠতে থাকে শেখার কাজ, পরে যা হয়ে ওঠে প্রধান কাজ। শিক্ষণ ব্যাপারটা চালু করে একজন প্রাপ্তবয়স্ক, খেলা থেকে তা সরাসরি উদ্ভূত হয় না। কিন্তু প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশু খেলতে-খেলতে শেখা শুরু করে, আর এই শেখাকে সে দেখে বিশেষ নিয়মবিশিষ্ট এক পৃথক বৈশিষ্ট্যসূচক ভূমিকার খেলা হিসেবে। তা হলেও, এই সমস্ত নিয়ম মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে শিশু অচেতনভাবে প্রাথমিক শিক্ষামূলক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে। খেলার তুলনায় শেখার প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের যে আমূল ভিন্ন মনোভাব শিশুরও তার প্রতি ক্রমে ক্রমে মনোভাব বদলে যায়। সৃষ্টি হয় শেখার বাসনা এবং শেখার প্রারম্ভিক সামর্থ্য।

শিশুর মনোগত বিকাশের উপরে খেলনার প্রভাব

ঐতিহাসিকভাবে, খেলনার আবির্ভাব ঘটেছিল শিশুকে তার কালের সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থার মধ্যে, সমাজে লোকজনের মধ্যে জীবনের জন্য প্রস্তুত করার উপায় হিসেবে। খেলনা এমন এক বস্তু যা যুগপৎ প্রমোদ আর চিত্তবিনোদন হিসেবে এবং একই সময়ে মানসিক বিকাশের উপায় হিসেবে কাজ করে।

একেবারে শৈশবেই শিশু ঝুমঝুমি পায়, তার আচরণগত ক্রিয়ার অন্তর্বস্তুকে তা নির্ধারণ করে। তার সামনে ঝোলানো খেলনাগুলি সে একদৃষ্টে দেখে এবং এটা তার উপলব্ধিকে সক্রিয় করে (আকৃতি আর রঙ সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে, যা নতুন তার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, এবং পছন্দ-অপছন্দ দেখা দেয়)।

শিশুকে দেওয়া হয়, যাকে বলা যায় শিক্ষামূলক খেলনা (পুতুলের বাসা, পিরামিড প্রভৃতি), শারীরিক ও দর্শনগত সমন্বয় বিকাশে সাহায্য করার উপযোগী রূপেই সেগুলি তৈরি হয়। এগুলি নিয়ে খেলার আনন্দ উপভোগ করতে-করতে শিশু আকৃতি, আয়তন আর রঙকে পরস্পরসম্পর্কিত ও পৃথক করতে শেখে।

শিশুদের বহু আধুনিক খেলনারই আছে ঐতিহাসিক পূর্বপুরুষ, সেগুলি আবির্ভূত হয়েছিল মানুষের বিকাশের এক বিশেষ স্তরে। ছোট্ট তীর-ধনুক, বুমেরাং, ছুরি প্রভৃতির বিশেষ গুরুত্ব ছিল প্রাচীন জাতিগুলির কাছে। প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের জন্য যে শিশু প্রস্তুত হচ্ছে, তাকে তারা বস্তু দিয়ে সুনির্দিষ্ট কাজকর্ম শেখাত। আজ এই বস্তুগুলি হয়ে উঠেছে স্বাতন্ত্র্যসূচক খেলনা, সেগুলি এক দিকে বস্তু-পূর্বপুরুষটির ক্রিয়াগুলিকে একভাবে বজায় রাখে (ধনুক দিয়ে তীর ছোঁড়া যায়, যে দিকে নিশানা করা হয় তীরটি সেই দিকেই যায়, এবং শিশুর দৃষ্টি তীক্ষ্ন আর হাত বাধ্য হলে তীরটি লক্ষ্যস্থলে দিয়ে লাগে, বুমেরাং ফিরে আসে, ছুরি দিয়ে কাটা যায়, ইত্যাদি), কিন্তু অন্য দিকে

খেলা স্বতঃপ্রণোদিত মনোগত প্রক্রিয়াগুলির গঠনকে প্রভাবিত করে। খেলার মধ্যে, স্বতঃপ্রণোদিত মনোযোগ ও স্বতঃপ্রণোদিত স্মৃতিশক্তি বিকাশলাভ করতে শুরু করে। বিশেষভাবে আয়োজিত পরিস্থিতির তুলনায় খেলার পরিস্থিতিতে শিশুরা আরও ভালোভাবে মনোনিবেশ করে এবং আরও বেশি স্মরণে রাখে। শিশুর পক্ষে একটা সচেতন লক্ষ্য বেছে নেওয়াটা খেলার মধ্যেই সবচেয়ে আগে ও সবচেয়ে সহজে হয়। একটা খেলার শর্তগুলিই দাবি করে যে খেলার পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলির দিকে এবং তার সঙ্গে জড়িত কাজ ও বিষয়বস্তুর দিকে শিশুকে মনোনিবেশ করতে হবে। কোনো শিশু যদি মনোযোগ দিতে না-চায়, খেলার নিয়মগুলি মনে না-রাখে তা হলে অন্যরা তাকে খেলা থেকে স্রেফ বাদ দিয়ে দেয়। আদান-প্রদান আর ভাবাবেগগত উৎসাহের প্রয়োজনই শিশুকে বাধ্য করে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে এবং সবকিছু মনে রাখতে।

খেলার পরিস্থিতি ও তার সঙ্গে জড়িত কাজকর্ম শিশুদের মানসিক ক্রিয়ার বিকাশকে নিয়ত প্রভাবিত করে। খেলায় শিশু কাজ করতে শেখে একটি প্রতিকল্প বস্তু দিয়ে, যেটি হয়ে ওঠে চিন্তা করার আলম্ব। প্রতিকল্প বস্তুগুলি দিয়ে কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শিশু আসল বস্তুটি সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখে। বস্তু দিয়ে খেলা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায়, এবং বস্তু সম্পর্কে আর সেগুলি দিয়ে কাজকর্ম সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখে মানসিক স্তরে, সেটা আবার কল্পনাশক্তির বিকাশে উৎসাহ যোগায়।

সেই সঙ্গে, খেলার অভিজ্ঞতা, এবং বিশেষ করে ভূমিকা-বিষয়বস্তুভিত্তিক খেলায় প্রকৃত সম্পর্কের অভিজ্ঞতা নিহিত থাকে চিন্তার এক বিশেষ ধরনের মধ্যে, শিশুকে তা সক্ষম করে তোলে অন্যের অভিমত অনুধাবন করতে, তাদের ভবিষ্যৎ আচরণ আন্দাজ করতে, নিজের ক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করতে এবং এর ভিত্তিতে তার নিজের আচরণ গড়ে তুলতে।

বাক্‌শক্তির বিকাশের উপরে খেলার প্রভাব বিরাট। খেলার একটা পরিস্থিতিতে প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকেই কণ্ঠোচ্চারিত আদান-প্রদানের একটি নির্দিষ্ট স্তর দরকার হয়। শিশু যদি খেলার অগ্রগতি সম্পর্কে তার ইচ্ছা বোধগম্যভাবে প্রকাশ করতে না-পারে, খেলায় যারা অংশগ্রহণ করছে তাদের মৌখিক নির্দেশ-পরামর্শগুলি বুঝতে না-পারে, তা হলে সে তাদের কাছে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সমবয়সী শিশুরা যাতে তাকে বুঝতে পারে, এই প্রয়োজন-বোধ সুসংলগ্ন কথাবার্তার বিকাশকে উদ্দীপিত করে।

ছবি আঁকা আর নানান জিনিস বানানোর মতো শিশুর উৎপাদনশীল কাজকর্ম প্রাক্‌-স্কুল শৈশবের নানান স্তরে খেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। ছবি আঁকার সময়ে শিশু প্রায়শই বিশেষ একটা বিষয়বস্তু নিয়ে খেলাচ্ছলে কাজ করে। যে পশুগুলির ছবি সে এঁকেছে, তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে, পরস্পরকে তাড়া করে, লোকে কারও সঙ্গে দেখা করতে যায় তারপর বাড়ি ফিরে আসে, হাওয়া গাছ থেকে আপেলগুলোকে ফেলে দেয় ইত্যাদি। ছবি আঁকা আর নানান জিনিস বানানোর ব্যাপারে আগ্রহ প্রারম্ভিকভাবে উদ্ভূত হয় খেলার একটা

বাস্তব অস্ত্র হিসেবে আর কাজে লাগে না। যেসব খেলনা প্রকৃত বস্তুর নকল, সেগুলি সেই বস্তুগুলির কাজ থেকে রীতিমত পৃথক কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। শিশুর মধ্যে বিশেষ বৃত্তিগত গুণাবলীর বিকাশসাধনের চেয়ে সেগুলি বরং তার মধ্যে যথাযথতা আর নৈপুণ্যের মতো কতকগুলি সাধারণ গুণের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

শিশু বস্তুগুলির কার্মিক উদ্দেশ্য জানতে পারে, তা তাকে সাহায্য করে মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্থায়ী বস্তুসমূহের জগতে প্রবেশ করতে।

বিশেষভাবে তৈরি শিশুদের খেলনা ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের নানান জিনিস (খালি কাটিম, দেশলাই বাক্স, পেনসিল, ন্যাকড়া, দড়ির টুকরো ইত্যাদি), এবং প্রাকৃতিক পদার্থ (স্প্রুস বা পাইন গাছের শঙ্কু, ডালপালা, কাঠের টুকরো, গাছের বাকল, শুকনো শিকড় ইত্যাদি) প্রায়শই খেলার জিনিস হিসেবে কাজে লাগে। কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুকে বুদ্ধি দেয় যে অনুরূপ বস্তুগুলিকে আসল জিনিসের প্রতিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

খেলনার জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে পুতুল আর খেলনা জীবজন্তুগুলি: ভালুক, খরগোশ, বাঁদর, বিড়াল, ইত্যাদি। প্রথম দিকে, শিশু পুতুলগুলিকে ব্যবহার করে শুধু সেই সমস্ত কাজকর্ম করার জন্যই, যেগুলি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক তাকে দেখিয়ে দেয় — পুতুলকে দোলায়, প্র্যামে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বিছানায় শুইয়ে দেয়। প্রথম পর্যায়ে থাকে প্রতিবিম্বিত ক্রিয়া, প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কের

পরিচয়সূচক ক্রিয়া নয়। প্রাপ্তবয়স্ক নিরন্তরভাবে একটি পুতুল বা খেলনা পশু নিয়ে খেলায় আগ্রহ উদ্দীপিত করে। শিশু তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজে যেসব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তার মধ্যে খেলনাটিকে রক্ষা করতে শেখে, তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে, তার সঙ্গে কষ্টভোগ করতে শেখে।

পুতুল হল শিশুর ভাবাবেগগত ও নৈতিক বিকাশের এক বিশেষ বস্তু। শিশুর ইচ্ছাশক্তি ও কল্পনাশক্তির কল্যাণে পুতুলটি শিশুর সঙ্গে আচরণ করে ঠিক সেইভাবেই, সেই মুহূর্তে শিশু যে আচরণকে আবশ্যক মনে করে। পুতুলটি চালাক-চতুর ও বাধ্য। সেটি স্নেহময় ও হাসিখুশি, একগুঁয়ে ও জেদি, মিথ্যাবাদী ও কাঁদুনে। শিশু তার বোধশক্তির আওতার মধ্যে সব রকম ভাবাবেগগত ও নৈতিক বহিঃপ্রকাশে তার নিজের জীবনের সমস্ত ঘটনা এবং অন্যদের জীবনের সমস্ত ঘটনার অভিজ্ঞতা ভোগ করে পুতুলটির সঙ্গে। পুতুলটি অতএব এমন এক আদর্শ বন্ধুর প্রতিকল্প, যে সবকিছু বোঝে এবং খারাপ কিছু মনে রাখে না। শিশুর কাছে একটি পুতুল বা খেলনা ভালুক শুধুই তার ছেলে, মেয়ে বা অন্য যেকোনো যত্নের জিনিস নয়, বরং সর্বপ্রকার সম্পর্কের বস্তু, শিশুর খেলায় আদান-প্রদানের অংশীদার।

প্রত্যেক শিশুই তার পুতুল বা খেলনা পশুটির সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলে। শৈশবের বছরগুলি ধরে সে নিজের মতো করে তার খেলার জিনিসটির প্রতি অনুরক্ত হয়, তার কাছাকাছি বিকাশলাভ করতে করতে,

এবং তার কল্যাণে বহুপ্রকার ভাবাবেগের নানাবিধ অনুভূতি ভোগ করতে করতে।

একটা খেলনার প্রতি মনোভাব কী হবে তার উপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে সেটির নির্মাণোপকরণের বুনট। যে সমস্ত খেলনা একই প্রাণীর পরিচয়বাহী অথচ বুনট আলাদা, সেগুলির প্রতি শিশুদের আচরণ হয় বাছাইধর্মী। নরম, ফুলো-ফুলো খেলনা শিশুর ইতিবাচক ভাবাবেগগুলি জাগ্রত করে এবং খেলায় উৎসাহ যোগায় কিন্তু খশখশে, নির্জীব খেলনা নিতে সব শিশু রাজী হবে না। একটা খেলনার মাথা আর শরীরের অনুপাতের পরস্পরসম্পর্কও তাৎপর্যপূর্ণ। পুতুল বা পশুর ছোট মুখ, ফোলা গাল, ছোট নাক আর বড় বড় চোখ শিশুর মধ্যে প্রবল স্নেহের উদ্রেক করে। বুনট ছাড়াও, শিশুর প্রিয় পুতুলগুলির সাধারণত এমন কিছু কিছু মৌলিক সুসামঞ্জস্যের চিহ্ন থাকে যা রক্ষণমূলক প্রতিক্রিয়া জাগ্রত করে।

যেসব খেলনা শিশুদের অতি প্রিয় সেগুলির মধ্যে পুতুল একটা বিশেষ বর্গের মধ্যে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের পুতুলের নিজ নিজ অবস্থান থাকে। চিরাচরিত একটা 'সুন্দর' পুতুল আছে — দীর্ঘ অক্ষিপক্ষ্ম, বড় বড় চোখ, ছোট্ট নাক আর ছোট্ট চকচকে মুখ। চুলের প্রাচুর্য (সাদা, সোনালী, লাল বা কালো) অবশ্যই থাকা দরকার। এই ধরনের পুতুলের একটা নাম দেবে তার মালিক, আর সেই মালিক সাধারণত ছোট একটি মেয়ে। 'সুন্দর' পুতুলটি হতে পারে মেয়ে, রাজকন্যা বা মা। মূলত মেয়েরাই 'সুন্দর' পুতুল নিয়ে খেলে।

চরিত্রসূচক পুতুল (ছেলে-পুতুল বা মেয়ে-পুতুল) হল সেই রকম পুতুল যার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট মানবিক গুণ প্রকাশ পায়: সারল্য, বোকামি, দুষ্টুমি ইত্যাদি। এই ধরনের পুতুল একটা পূর্ব-কৃত ধারণানুযায়ী চরিত্রের কাঠামোর পরিচায়ক এবং তাই বিষয়বস্তুমূলক খেলার মধ্যে তা প্রায়শই খেলার ধারাটিকে নির্ধারিত করে।

এ ছাড়াও আছে ব্যক্তিরূপারোপিত পুতুল — লোককাহিনীর, শিশুদের গল্পের, চলমান কার্টুন প্রভৃতির নায়করা — সেগুলিরও বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় বাহ্যিক চেহারা দিয়ে কিন্তু সেগুলি হল আচরণের এক পূর্ব-স্থিরীকৃত আদর্শ, খেলার কাহিনীগত পরিবর্তন সত্ত্বেও স্থিতিশীল নৈতিক চরিত্র। এই ধরনের পুতুলগুলি মনে হয় শিশুর কাছ থেকে আচরণের একটা মান দাবি করে। তাই, বুরাতিনো আর স্নো-হোয়াইট সর্বদাই ভালো, সহৃদয়, ন্যায়পরায়ণ ও সৎ, আর কারাবাস ও জাদুকর মন্দ, বিদ্বেষী, ন্যায়হীন ও অসৎ। কৌতূহলের বিষয়, গল্পগুলির মধ্যে কিন্তু ইতিবাচক নায়কদের সেই সমস্ত ইতিবাচক গুণ নেই, যেসব গুণ পরে তাদের প্রতি আরোপ করে শিশুরা, নেতিবাচক নায়করাও অত বেশি দোষত্রুটির অধিকারী নয়। গল্পগুলির পুতুল-নায়করা নৈতিক মেজাজের একটা মানের প্রতিনিধিত্ব করে বলে, শিশু তার নিজের সমস্ত নৈতিক অভিজ্ঞতাকে সেটির মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে, এবং খেলে এমন একটা বিষয়ের মধ্য দিয়ে যার পরিস্থিতিগত আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্কের সমস্যা আছে। চরিত্রসূচক

পুতুলগুলি ছেলেদের কাছে যেমন, মেয়েদের কাছেও তেমনই প্রিয়।

একটি প্রিয় পুতুল শিশুকে শেখায় দয়ামায়া এবং পুতুলটির সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে ও অন্য লোকের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা। পুতুলগুলি বিষয় নির্বাচনকে সমৃদ্ধ করে এক শিশুর কল্পনার জগৎকে প্রসারিত করে।

শিশুর খেলার আগ্রহের বিষয়গুলিকে গোড়ার দিকের বয়সে 'বিশেষীকৃত' করলে তার বিকাশমান ক্ষমতাগুলি দীনতাপ্রাপ্ত হয় এবং তাতে তার ক্ষতি হতে পারে। ছোট একটি ছেলে যদি একটি পুতুল নিয়ে কিছুক্ষণ খেলতে চায়, কিন্তু তার বাসনা অপূর্ণ থাকে, এবং ভাবাবেগগত অসন্তোষের অভিব্যক্তি শোনে এই কারণে যে সে — একটা ছেলে — পুতুল নিয়ে খেলছে মেয়ের মতো, তা হলে এর ফলে তার মধ্যে হীনতাবোধ গড়ে উঠতে পারে।

শিশুদের খেলাগুলির কঠোরভাবে মান-নির্ধারণ করে দেওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের উচিত নয়: একটি ছেলের জন্য ছেলের খেলনাপত্রের একটা সংগ্রহ আর মেয়ের জন্য মেয়ের খেলনাপত্রের একটা সংগ্রহ কিনে দেওয়াই যথেষ্ট। যে খেলনাটি প্রথাগতভাবে তার জন্য নয়, কোনো শিশু যদি সেই খেলনাটি নেয়, তা হলে তার মনোযোগ সেই বিষয়টার দিকে কেন্দ্রীভূত করার কোনো দরকার নেই: সে নিজেই ক্রমে ক্রমে তার নিজের আগ্রহগুলি নিজ লিঙ্গগোষ্ঠীর আগ্রহের সঙ্গে চিহ্নিত করতে শিখবে।

আমার দুই ছেলের খেলার মতো সব ধরনের পুতুল ছিল: ভালুক, ছেলে, মেয়ে, বুরাতিনো, মহাকাশচারী ও

আরও অনেক। বাড়িতে তারা সবগুলো নিয়েই খেলত, তাদের মধ্যে কতকগুলোকে ভালোবাসত, অন্যদের প্রতি কোনোপ্রকার অপছন্দ দেখাত তা-ও নয়। আমার মতে, একটি শিশুর তার খেলনাগুলির প্রতি এভাবেই আচরণ করা উচিত। আমি স্থিরনিশ্চিত যে ছোটদের কখনোই এমন এক বিশেষ পুতুল দেওয়া উচিত নয় যাকে সে চড়-চাপড় মারতে পারে অথবা এমন সব আক্রমণাত্মক খেলনা কিনে দেওয়া উচিত নয় যেগুলি ধর্ষকামমূলক প্রবণতায় উৎসাহ যোগায়। সবাই জানেন যে কোনো কোনো দেশে খেলনা কোম্পানিগুলি বিস্তারিত সব খেলনা তৈরি করে — 'আতঙ্ককর জিনিসপত্রের সংগ্রহশালা', মডেল গিলোটিন, বৈদ্যুতিক চেয়ার আর তার সঙ্গে সেগুলির শিকার। এই খেলনাগুলি শিশুদের মধ্যে এক নিরুত্তাপ বিচ্ছিন্নতা গড়ে তোলে, প্রাণ হরণের উপরে নৈতিক নিষেধাজ্ঞাটিকে দূর করে এবং মানুষের ব্যক্তিগত মূল্যকে নিশ্চিহ্ন করে।

একটা পুতুলের শক্তি আর মূল্য হওয়া উচিত শিশুর কল্পনাশক্তি, তার প্রতিবর্তী ক্ষমতাগুলির এবং সেই সঙ্গে শিশুর নৈতিকতা-অভিমুখীনতার বিকাশ ঘটানোর কাজে তার সামর্থ্য। কিন্তু একটা পুতুল কখনও কখনও শিশুর ক্ষতিও করতে পারে। সেগুলি হল সেই ধরনের সব পুতুল যা আক্রমণমুখিতাকে উৎসাহিত ও বিকশিত করে। বিখ্যাত মার্কিন বার্বি পুতুল শিশুকে পেটি-বুর্জোয়ায় পরিণত হতে সাহায্য করে, শিশুর পদমর্যাদা তার বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয় তার বার্বি পুতুলকে সাজাবার জন্য তার যেসব তৈরি পোশাকসামগ্রী, বাড়ি আর অনুরূপ সব

'মর্যাদাপূর্ণ' বাড়তি জিনিসপত্র আছে, তার দরুন। শিশুদের খেলা সংক্রান্ত গোটা ধারণাটিকেই বার্বি পুতুল অর্জনাভিলাষে পর্যবসিত করতে সাহায্য করে।

মানুষের কাজকর্মজাত প্রতিটি জিনিসের মতোই, একটা খেলনার দ্বৈত চরিত্র থাকতে পারে: তা ভালোকে উৎসাহিত করায় সাহায্য করতে পারে এবং সমান সাফল্যের সঙ্গেই ক্ষতি করায় সাহায্য করতে পারে। একটি বিশেষ খেলনার ক্রিয়া সঠিকভাবে নির্ণয় করা এবং যে উদ্দেশ্যে সেটি তৈরি হয়েছিল তা চিন্তা করা এবং বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশুকে সহৃদয় ও সুখী করতে হলে পুতুলটিকেও সহৃদয় হতে হবে।

অধ্যায় ১২। চিত্রলেখভিত্তিক কাজ

খেলাই একমাত্র কাজ নয় যা শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশকে প্রভাবিত করে।

শিশু আঁকে, মডেল বানায়, তৈরি করে এবং কেটেকুটে জিনিস বানায়। এই সমস্ত কাজের একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য এই যে সেগুলি প্রত্যক্ষগোচর একটা কিছু সৃষ্টি করার দিকে চালিত — একটা চিত্রাঙ্কন, একটা নির্মিতি বা একটা কারুকার্য। কিন্তু তার প্রত্যেকটিরই আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তার জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের কাজ আয়ত্ত করা দরকার হয়, এবং তা শিশুর মানসিকতার গঠনের উপরে সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

শিশুদের আঁকার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয় নানা বিষয় দিয়ে। একটি হল শিশুর লিঙ্গগোষ্ঠী এবং লিঙ্গগত পার্থক্যের ব্যাপারে তার সংবেদনশীলতা। নিজের লিঙ্গগোষ্ঠীর সঙ্গে ঐকাত্ম্যবোধের সাধারণ প্রবণতাও তাঁর আঁকাকে নির্দিষ্ট কিছু অন্তর্বস্তু দান করে: ছেলেরা আঁকে শহর আর বাড়ির নির্মাণ, রাস্তা আর তার উপর দিয়ে ছুটে চলা মোটরগাড়ি, আকাশে বিমান, সমুদ্রে জাহাজ, এবং যুদ্ধ আর লড়াইয়ের ছবিও। মেয়েরা আঁকে সুন্দর মেয়ে আর রাজকন্যা, ফুল,

বাগান, সব ধরনের অলঙ্কারধর্মী নকশা, মা আর সন্তানদের মধ্যে বন্ধুত্ব, মা তার মেয়েদের নিয়ে বেড়াচ্ছে — এই সব ছবি।

যে সব মূল্যকে সাধারণত বিপরীত লিঙ্গের অভিমুখীনতা বলে মনে করা হয় তার প্রতি কোনো কোনো শিশুর একান্ত আকর্ষণ থাকে — একটি ছেলে হঠাৎ বোনা আর ফুলের ছবি আঁকার দিকে আকর্ষণ বোধ করা শুরু করতে পারে, আর একটি মেয়ে আঁকতে শুরু করতে পারে লড়াইয়ের দৃশ্য। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে এই ঐকাত্ম্যবোধ হল বিপরীত লিঙ্গের লোকেদের মধ্যে শিশুর একটি ভক্তির পাত্র বেছে নেওয়ার ফল এবং তার সমস্ত বহিঃপ্রকাশকে অচেতনভাবে নকল করার ফল (সাধারণত বড় ভাই বা বোন)। তবে, ক্রমে ক্রমে ভক্তির পাত্রের প্রাধান্যশালী প্রভাব স্বাভাবিক সামাজিক ছাঁচের কাছে হার মানে।

যে সব আঁকার অন্তর্বস্তু সুনির্দিষ্ট জাতীয় সংস্কৃতির মূল্য, অভিমুখীনতা আর সামাজিক কাঠামো দিয়ে নির্ধারিত হয়, সেগুলি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

আমরা বিভিন্ন জাতিসত্তার শিশুদের আঁকা ছবি অধ্যয়ন করেছি। মনে হয়েছে যে শিশুদের যখন ‘সবচেয়ে সুন্দর’ আর ‘সবচেয়ে কুৎসিত’ জিনিসের ছবি আঁকতে বলা হয়েছিল, তখনই ঘটেছিল সাংস্কৃতিক অভিমুখীনতার বিশিষ্ট চরিত্র প্রকাশক অনেক বেশি ছবি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সুযোগ, যেটা অবাধে বেছে নেওয়া বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আঁকা ছবির তুলনায় অনেক বেশি।

পাঁচ বছর বয়সেই শিশুরা তাদের আঁকা ছবির মধ্যে

রূপ দিতে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সব সামাজিক ঘটনা, জাতীয় ঐতিহ্য ও দেশের সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি। সুন্দর আর কুৎসিতকে কীভাবে উপস্থিত করা হয় তার অন্তর্বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন দেশের শিশুদের অনেকগুলি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। সব শিশুই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য, প্রাকৃতিক ব্যাপারের এক ইতিবাচক আন্তর অভিজ্ঞতা, আশপাশের লোকেদের অনুমোদিত মানুষের ভালো কাজ, মানুষের কাজকর্মের ফলগুলিকে সুন্দর মনে করে। কুৎসিত হল সেই সবকিছুই যা অপ্রীতিকর, ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ, যা কিছু চারপাশের লোকের নিন্দাভাজন: নোংরা, অপরিচ্ছন্ন শিশুরা; লড়াই আর হত্যা; অসভ্য, মাতাল লোক; যুদ্ধ আর হিংসা। একটি নির্দিষ্ট পরিসরে, সব জাতির সব শিশুই সুন্দর আর কুৎসিতের এই একই রকম মূল্যায়ন করে।

সুন্দর আর কুৎসিতের যে প্রতিরূপ শিশু উপস্থিত করে, তাতে প্রতিফলিত হয় প্রতিটি দেশের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্য — অভিমুখীনতার প্রভাবের ফল। একটি জাপানী শিশুর কাছে ফুজিয়ামার ছবি আঁকাটা শুধু একটা পাহাড়ের ছবি আঁকা নয়, তার দেশের ও সৌন্দর্যের একটা প্রতীক আঁকাও বটে। মঙ্গোলীয় শিশু আঁকে বিস্তীর্ণ পাথুরে প্রান্তর, রুশ শিশু আঁকে বার্চ গাছ, অরণ্য বা স্তেপ, জর্জীয় শিশু আঁকে পাহাড়পর্বত। এই পছন্দটা নির্ধারিত হয় বৈষয়িক ও আত্মিক উভয় ক্ষেত্রে ইতিবাচক তাৎপর্যের অধিকারী

মূল্য হিসেবে স্বদেশভূমির প্রকৃতি সম্পর্কে যে মনোভাব গড়ে উঠেছে তার দ্বারাই।

নৃজাতিগত আত্মসচেতনতার প্রকাশ শিশুদের আঁকা ছবিগুলির জন্য বিশিষ্ট লক্ষণসূচক, যেমন একটি জাপানী শিশুর আঁকা কমলা রঙের আকাশে এক বিরাট হলুদ রঙের সূর্য আর একটি লাল ফুলের প্রস্ফুটিত দল। শিল্পী বুঝিয়ে বলল: 'সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হল, উদিত সূর্যের কিরণ যখন উন্মুক্ত পদ্ম ফুলকে স্নান করিয়ে দেয়।' তার কাছে উদিত সূর্য শুধুই প্রভাত সূর্য নয়, তা একটা জীবন্ত প্রাণী, যে জন্মগ্রহণ করছে এবং তা তার দেশের — উদিত সূর্যের দেশের এক প্রতীক; বিকচমান পদ্মটি ও তার পাপড়িগুলি সূর্যকিরণস্নাত, সেটি নিতান্তই সুন্দর একটা কিছু, কোনো চিত্তাকর্ষক রূপক নয়, বরং এক জীবন্ত প্রাণীর ক্রিয়ার মূর্ত বর্ণনা। আনন্দ ও সৌন্দর্যের আন্তর্জাতিক প্রতীকগুলি আর এইসব ব্যাপারের জাতীয় ঐতিহ্যাশ্রিত ভাষ্যরূপের জটিল মিশ্রণ আঁকার মধ্যে পরিণত হয় সেই সমাজের এক নৃজাতিগত প্রতীকে, যে সমাজ শিশুশিল্পীকে লালিত করেছে।

শিশুরা তাদের আঁকা ছবির দ্বারা যে সমাজে তারা বাস করে তার ভাবাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক অভিমুখীনতার প্রতিফলন ঘটায় অচেতনভাবে, বাস্তবের মূল্যায়ন করতে শেখে প্রাপ্তবয়স্কদের মূল্যায়নকে প্রতিফলিত করতে করতে। প্রত্যেক সংস্কৃতিই বিকশিত হয় নিজস্ব ধরনে, তাই যে সমস্ত মূল্যমান সকলের পক্ষেই অভিন্ন তার পাশাপাশি মানুষ-হয়ে-ওঠা শিশু যে দেশে ও সমাজে বাস করে

সেখানকার বিশিষ্ট মূল্যবোধগুলি গ্রহণ করে। তার চারপাশের লোকেদের অভিমুখীনতা আত্মস্থ করতে করতে শিশু নিজের ব্যক্তিগত অবস্থান ও আদর্শগুলিও গঠন করে।

পরিবারের ছবিগুলিতে থাকতে পারে আকাঙ্ক্ষিত অথচ অস্তিত্বহীন আত্মীয়স্বজন: ছোট ভাইবোন, বাবা বা মা। কিন্তু সেই ধরনের ছবি বিশেষভাবে ঘনঘন আঁকা হয় না, এবং শিশু সাধারণত সেগুলি দেখাতে লজ্জা পায়, না-দেখানোরই চেষ্টা করে। আঁকা ছবিগুলির মধ্যে পরিবারের বিশেষ একজন সদস্যের প্রতি শিশুর ভালোবাসাও প্রায়শই লক্ষ করা যায়। ভালোবাসা, মমতা ও বিশ্বাস, মনোযোগ, আবার শত্রুতা, বিদ্বেষ, ভয় ও উদাসীনতাও মানুষের পরস্পরের প্রতি আদিতম মনোভাব।

'সবচেয়ে সুন্দর' এই বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকতে গিয়ে শিশুরা প্রায়শই তাদের ভালোবাসার পাত্রদের প্রতিকৃতি আঁকে: তাদের মা, বাবা, ঠাকুমা/দিদিমা, দাদু, ছোট বোন বা ভাইয়ের। একটা সমস্যাকীর্ণ পরিবারের শিশু একজন মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি বা গুন্ডাকে কুৎসিত হিসেবে উপস্থিত করতে পারে, কিন্তু সে সাধারণত স্বীকার করবে না যে এই ব্যক্তি তার মাতাল বাবা বা বড় ভাই। সে শুধু বলবে: 'মদ খাওয়া খারাপ।'

শুধু পরিবারের সদস্যদের ছবিই নয়, পারিবারিক জীবনের যেসব দৃশ্য তাদের ভাবাবেগগতভাবেও নাড়া

দেয় সেগুলি আঁকাও শিশুদের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক। তারা প্রায়শই নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার ছবি আঁকে এবং সেগুলিকে মেশায় এমন কিছু জিনিসের প্রতিরূপের সঙ্গে, যেগুলি সেই মুহূর্তে তাদের নেই বটে, তবে থাকলে ভালো হত। এই ক্ষেত্রে শিশু তার বাস্তব ও কল্পিত জীবন সম্পর্কে একসারি কাহিনী সৃষ্টি করে ছবিতে। পাঁচ বছরের একটি মেয়ে যে ঘটনাগুলি ভবিষ্যতে হবে সেগুলির দৃশ্য এঁকেছিল, যেমন খেলনা কেনা এবং গ্রামের কুটিরে যাওয়ার ছবি। এই সব দৃশ্যে কুকুর ও তার কাচ্চাবাচ্চা উপস্থিত হয়। এই চরিত্রগুলি মেয়েটির গোপন বাসনার নায়ক।

শিশুরা নিজেদের প্রতিকৃতিও আঁকে, তাতে প্রায়শই প্রতিফলিত হয় নিজের প্রতি এক ইতিবাচক মনোভাব: শিশু নিজেকে আঁকে তার পছন্দমতো পোশাকে, কোনো বাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে, কোনো এক বাঞ্ছিত স্থানে। নিজের এই ধরনের আশাবাদী প্রতিরূপায়ণ স্বাভাবিকভাবে বিকাশমান একটি শিশুর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মেলে: নিজের মূল্য সম্পর্কে তার আছে একটা সুসংজ্ঞায়িত বোধ এবং চারপাশের পৃথিবীর উপরে আস্থাবোধ। উপরে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, শিশুর আত্মসচেতনতায় প্রথম যে জিনিসটি প্রকাশ পায় তা হল তার নিজের সন্দেহাতীত মূল্য সম্পর্কে ধারণা, যেটা সাধারণত সূত্রায়িত হয় এই কথাগুলির মধ্যে: 'আমি ভালো।' শিশু তার আঁকার মধ্যেও এই 'ভালোত্ব'-কে উপস্থিত করে: ভালো বলতে বোঝায় সুন্দরভাবে পোশাক-

পরা, ভালো বলতে বোঝায় ভালো কোনো লোককে প্রদত্ত সমস্ত সুযোগসুবিধা।

একটি শিশু যখন নিজেকে আঁকতে শুরু করে অসুবিধাজনক সব পরিস্থিতিতে, কিংবা দিনের পর দিন এঁকে চলে তার দুঃস্বপ্নের ছবি, তখন এটা বোঝায় যে ভাবাবেগগতভাবে সে বিচলিত।

শিশুদের আঁকার অন্তর্বস্তুর গতিমুখ নির্ধারণ করে আরেকটি বিষয়ও, তা হল শিশু কতটা প্রকৃত ও কল্পিত বাস্তব-অভিমুখী। এই ঝোঁকের উপরে ভিত্তি করে আমরা শর্তসাপেক্ষে শিশুদের ভাগ করতে পারি দুইভাগে — বাস্তববাদী ও স্বপ্নদ্রষ্টা: প্রথমোক্তরা বস্তুসমূহ ও প্রাকৃতিক ব্যাপারকে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ঘটনাকে চিত্রিত করে; শেষোক্তরা চিত্রিত করে তাদের অপূর্ণ বাসনা আর স্বপ্নগুলিকে। এখানে এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধান করা উচিত যে শিশুরা যত বড় হয়ে ওঠে, ততই ঘনঘন স্বপ্ন আর বাসনাগুলি তাদের আঁকা ছবিতে উপস্থাপিত হয়। তা ছাড়া একেবারে বিশেষ এক কল্পনা জগতে শিশুরা আগ্রহী। ভূতপ্রেত, দৈত্যদানব, মৎস্যকন্যা, মায়াবী-জাদুকর, পরী, রূপকথার রাজকন্যা ও আরও অনেক চরিত্র ঠিক বাস্তব জীবদের মতোই নির্ধারিত করে শিশুর মানসিক ও সাধারণ অবস্থাকে।

বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালের শিশুদের আঁকা ছবি অধ্যয়ন করে দেখা গেছে যে তারা যে সমাজে বাস করে তার ঘটনাবলী ও আগ্রহকেই প্রতিফলিত করে শিশুরা।

সমসাময়িক কালের শিশুদের আঁকা যুদ্ধের বিষয়ে ছবিগুলিকে বলা যেতে পারে যুদ্ধের নৈতিক মূল্যায়ন প্রতিফলনকারী প্রতীক। একটা স্বস্তিকা, বিশাল কামানের নলযুক্ত একটা ক্রুজার, হিটলারের মতো দেখতে একটা ফাশিস্ত অথবা সামরিক উর্দি পরা একটা কঙ্কাল — এ-সবই যেন যুদ্ধের সাধারণ আন্তর্জাতিক প্রতীক। কিন্তু শিশুরা নিজেরাই নতুন নতুন প্রতীক উদ্ভাবন করে, এ থেকে দেখা যায় যে শিশু আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আত্মস্থ করতে, বিশেষভাবে তার সারনির্যাস গ্রহণ করতে এবং স্পষ্টভাবে তা চিত্রিত করতে সক্ষম।

মস্কোয় অনুষ্ঠিত 'হিরোশিমা—নাগাসাকি' প্রদর্শনীতে (১৯৭০—১৯৮০) ছিল সেই সব শিশুর আঁকা ছবি, যাদের জীবনের উপর দিয়ে চলে গেছে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ অগস্টের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা। যেদিন নীল আকাশ থেকে মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল ব্যাপক ধ্বংসের অস্ত্র।

সেই মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, পাঁচ বছর বয়সী ওর্খিরি পুতোমু এঁকেছিল সূর্য আর হিরোশিমার উপরে বোমা পড়ার পাঁচটি ছবি। প্রত্যেকটি আঁকায় সূর্য আর বোমার সম্পর্কের মধ্যে একটা পরিবর্তন চিত্রিত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে, ইতিমধ্যেই গনগনে লাল হয়ে-ওঠা ভোরবেলার সূর্য রয়েছে নির্মল আকাশে, আর একটি ছোট বিন্দু বোঝাচ্ছে যে অ্যাটম বোমাটি রয়েছে কাছেই। তারপর, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এই দুটি জিনিসের অনুপাত বদলে যাচ্ছে: বোমাটা আয়তনে বেড়ে যাচ্ছে, আর তেমনিই

বোধাতীত দ্রুততায় সূর্যের আয়তন হ্রাস পাচ্ছে। পঞ্চম ছবিটিতে বোমার বিস্ফোরণ তার রক্তাভ পদার্থ দিয়ে সমস্ত জায়গাটাকে ভরিয়ে ফেলছে।

আমাদের পৃথিবীর বহু প্রান্তের শিশুরা আজ সামরিক আগ্রাসন, হিংসা আর মৃত্যুর বিভীষিকাকে চিত্রিত করে।
শিশুদের আঁকা ছবিগুলি এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে যুদ্ধের সমস্ত রূপই শিশুদের আতঙ্ক উদ্রেক করে। সর্বত্র সমস্ত শিশুই যুদ্ধ চায় না।

যুদ্ধ আর বিপদের অজস্র তমিস্র প্রতীককে ছাপিয়ে যায় শান্তিকে প্রতীকায়িত করে আঁকা ছবি। শান্তির প্রয়োজনীয়তা থেকে জন্ম নিয়েছে এই চিন্তাকে ব্যক্ত করার মতো প্রতীকের প্রয়োজনীয়তা। প্রাপ্তবয়স্কদের তৈরি প্রতীকগুলি ব্যবহার করে শিশুরা।

মানব সংস্কৃতির বহু শতাব্দীর স্থায়ী সব প্রতীক হল সূর্য, পায়রা, মানুষের হৃদয়, জলপাই শাখা ইত্যাদি, এগুলি হল বিশেষ প্রতীক, বিভিন্ন সংস্কৃতির পরম্পরাগত শিল্পে তা দেখা যায় কতকগুলি চিহ্নের রূপে; শিশুরা এগুলিকে 'উপযোজন করে' এবং তাদের আঁকা ছবিতে ব্যবহার করে।

শিশুদের আঁকা ছবিগুলির অন্তর্বস্তু নির্দিষ্টভাবেই এই ইঙ্গিত দেয় যে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের ঘটনাবলীতে শিশু সাড়া দেয় খুব তাড়াতাড়ি: প্রাপ্তবয়স্করা যদি অতীতকে স্মরণ করে, তবে তা শিশুরও সম্পত্তি হয়ে ওঠে; যা ঘটছে তাতে যদি প্রাপ্তবয়স্করা বিড়ম্বিত বোধ করে, শিশুরাও বিড়ম্বিত বোধ করে। শিশুদের শত শত আঁকা

ছবি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে শিশুদের সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক মেজাজ আর আগ্রহের মতো একই রকম। শিশুদের আঁকা ছবির বিশ্লেষণ সুযোগ দেয় সত্যিই সেগুলিকে কালের প্রকৃত দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে।

একটি শিশুর ব্যক্তিগত অভিমুখীনতাগুলি নির্ধারিত হয় সব ধরনের সামাজিক প্রভাব আর এইসব প্রভাবের প্রতি তার ব্যক্তিগত মনোভাব দিয়ে। সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু তার বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটিকে আলাদা করে নেয় এবং তাকে করে ছবি আঁকার একটা বিষয়।

সামগ্রিকভাবে, শিশুদের আঁকার পরিধির মধ্যে থাকে বহুবিস্তৃত বিষয়বস্তু এবং তা দেখায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় শিশুদের আগ্রহ, নিজেদের দেশের জীবনের সঙ্গে, তাদের জাতি, তাদের পরিবার ও তাদের বন্ধুদের জীবনের সঙ্গে তাদের যোগ।

অধ্যায় ১৩। সক্রিয় জীবনাবস্থানের জন্য প্রস্তুতি

প্রাক্-স্কুল বয়সের শেষদিকে শিশুর মধ্যে কোন-এক ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সে ভালোভাবে তার স্ত্রী-পুরুষত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। সে জানে, কোন দেশে সে বাস করে, কোন আবাসস্থলে তার বাড়ি আছে; তার এক ধরনের ধারণা জন্মে মূলভূখণ্ড ও অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে। সে উপলব্ধি করে লোকেদের মধ্যে এখন তার অবস্থান কোথায় (সে প্রাক্-স্কুলবয়স্ক) এবং আশু ভবিষ্যতে সে কী স্থান গ্রহণ করবে (সে স্কুলে পড়বে)। এক কথায় সে পরিবেশ ও কালে তার জায়গা খুঁজে নেয়। সে ইতিমধ্যে পারিবারিক-আত্মীয় সম্পর্ক উপলব্ধি করে এবং তার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ জনের মধ্যে নিজ স্থান গ্রহণ করে। সে প্রাপ্তবয়স্ক ও সমবয়স্কদের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করতে পারে: তার আছে আত্মসংযমের, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ও দৃঢ় ইচ্ছা পোষণের ক্ষমতা। সে ইতিমধ্যে বোঝে যে তার আচরণ সম্পর্কে মনোভাব নির্ধারিত হয় নিজের প্রতি তার নিজস্ব মনোভাব দিয়ে ততটা নয় ('আমি ভালো শিশু'), যতটা চারপাশের

লোকেদের চোখে তার আচরণের নিরিখে। প্রাক্-স্কুলবয়স্ক শিশুর মধ্যে অন্তর্লীন মনোগত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই উপলব্ধি জন্মে। শিশু ব্যক্তিত্বের বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের ক্ষেত্রে 'আমি চাই' এই প্রেরণার উপর 'আমার উচিত' অনুভূতির প্রাধান্য স্বীকার্য হবে। প্রাক্-স্কুল বয়সের শেষ দিকে স্কুলে পড়ার জন্য প্রেষণামূলক প্রস্তুতি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে।

শেখা ও কাজ করার উপাদানগুলির বিকাশ

শেখা ও কাজ করার উন্নত রূপগুলি গড়ে ওঠে প্রাক্-স্কুল বয়সের গণ্ডীর বাইরে। শেখা হল স্কুলগামী বয়সের শিশুদের প্রধান ক্রিয়া। শ্রম হল প্রাপ্তবয়স্ক ক্রিয়ার মূল রূপ। প্রত্যেকটির — শেখা ও কাজ করা — আছে একটি জটিল গঠনকাঠামো এবং একজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থার উপরে প্রত্যেকটির দাবি অনেকখানি। সাফল্যের সঙ্গে শেখা ও কাজ করার জন্য দরকার হয় এমন সব মনোগত বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য, প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর মধ্যে যেগুলি তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি।

প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়ন ও তার পরবর্তীকালে উৎপাদনশীল শ্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি হল প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের বড় করে তোলা ও শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম মূল কাজ। এই প্রস্তুতি ঘটে প্রধানত খেলা আর উৎপাদনশীল ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু, এগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্করা চায় যে শিশুরা উপযুক্ত শিক্ষামূলক ও

কাজধর্মী জিনিসও করুক, ক্রমে ক্রমে এটা নিশ্চিত করে যাতে এই সব কাজ সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তারা শিক্ষা ও কাজের জন্য অত্যাবশ্যক কিছু কিছু মানসিক কাজকর্মও করতে শেখে।

প্রাক্-স্কুল শৈশবে শেখা আর কাজ করার উপাদানগুলির বিকাশের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই কথাটা দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গেলে চলবে না যে, কাজের সংগঠক প্রাপ্তবয়স্কের কাছে কাজটির যে মূল কেন্দ্রবিন্দু, সেটা শিশুর কাছের কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রায়শই আলাদা হয়ে থাকে। শিশু যে শেখার প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত করে, তাকে যে কর্তব্যটা করতে বলা হয় সেটা করে অথবা ফুলগাছ লাগায়, সে ঘটনাটা এখনও পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত টানার ভিত্তি যোগায় না যে সে শেখার ও কাজ করার (এমন কি অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের) অভ্যাস অর্জন করেছে। একটা নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত শিশুরা চালিত হয় সেই ক্রিয়াটিতেই আগ্রহ দ্বারা, প্রাপ্তবয়স্কদের মতো হওয়া, প্রাপ্তবয়স্কদের অনুমোদন লাভ করার বাসনা দ্বারা; অর্জিত জ্ঞানের তাৎপর্য কিংবা তাদের যা করতে বলা হয়েছে সেই কাজটা করে ফেলার ফল তারা উপলব্ধি করে না। কিন্তু এই উপলব্ধি প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়ন ও কাজের এক অত্যাবশ্যক শর্ত।

শিক্ষার লক্ষ্য হল কাউকে নতুন জ্ঞান, সামর্থ্য ও দক্ষতা দান করা, একটা বাহ্যিক ফল লাভ করা নয়।

একটি শিশু যদি ছবি আঁকে, ছবি আঁকার প্রক্রিয়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয় অথবা একটা সুন্দর ছবি আঁকার চেষ্টা

করে, তা হলে সে ব্যাপৃত রয়েছে খেলায় অথবা উৎপাদনশীল ক্রিয়ায়। কিন্তু যখন আঁকার সময়ে সে একটি বিশেষ লক্ষ্য স্থির করে নেয় — আগের চেয়ে আরও ভালোভাবে আঁকতে শেখা, সমান রেখা আঁকতে শেখা অথবা নিজের আঁকায় ঠিকভাবে রঙ করা — তখন তার কাজকর্ম অর্জন করে এক শিক্ষামূলক চরিত্র।

যদিও শিশুর সমস্ত মনোগত বিকাশই ঘটে শেখার প্রক্রিয়ায়, পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলির অর্জিত অভিজ্ঞতা তার মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে, তবুও শিশুরা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার বেশির ভাগটাই অর্জন করে প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে আদান-প্রদানের মধ্যে, তাদের অনুরোধ ও আদেশ পালন করে, তাদের উপদেশ শুনে এবং খেলার মধ্যে, ছবি এঁকে, নানান জিনিস বানিয়ে এবং সব ধরনের দৈনন্দিন অবস্থার মধ্যে। শিশুদের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের আদান-প্রদানের মধ্যে শিক্ষা উপস্থিত থাকে নানান রূপে। তবে, শিশু যত বিকাশলাভ করে, শিক্ষা হয়ে ওঠে তত প্রণালীবদ্ধ।

প্রাক্-স্কুল সামাজিক লালন-পালনে শিশু শেখে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী চালানো বিশেষ বিশেষ শিক্ষণের মধ্য দিয়ে। খেলার পদ্ধতি ব্যবহার ও উৎপাদনশীল দায়িত্বপ্রদান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই সঙ্গে, শিশুদের বিভিন্ন শিক্ষণ-প্রয়াসে তাদের কাছে রাখা হয় তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত করার সম্পূর্ণতা গুণগত উৎকর্ষ, আর শিক্ষকদের পরামর্শ শোনা ও পালন করার সামর্থ্য সংক্রান্ত কিছু

কিছু দাবি। বিভিন্ন (শিক্ষণে) পড়াশোনায় শিশুদের নিযুক্ত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান, শেখার কাজের উপাদানগুলি প্রারম্ভিকভাবে লাভ করার পক্ষে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ।

শিশু তার চার পাশের পৃথিবী সম্বন্ধে নানা ধরনের যেসব খবরাখবর পায় — প্রাপ্তবয়স্করা তাকে যা দেখিয়ে দেয় এবং বলে দেয়, আর সে নিজে যা দেখে, দুটোই — সেগুলি সৃষ্টি করে অনুসন্ধিৎসা, যা কিছু নতুন তার প্রতি আগ্রহ। প্রাক্-স্কুল শৈশবে শিশুদের ক্রমবর্ধমান অনুসন্ধিৎসা লক্ষ করা যায় বিশেষভাবে শিশুদের প্রশ্নগুলির অধিকতর সংখ্যায় আর প্রশ্নের চরিত্র পরিবর্তনে। তিন থেকে চার বছর বয়সে শিশু যেসব প্রশ্ন করে সেগুলির খুব কমই নতুন জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বা যা বোঝা যাচ্ছে না তার ব্যাখ্যা পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়; একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সে এই ধরনের প্রশ্নগুলি প্রাধান্য পায় এবং বিভিন্ন ব্যাপার কী কারণে ঘটে ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক কী সে বিষয়ে শিশুরা প্রায়শই আগ্রহী হয়ে ওঠে। ‘বৃষ্টি হয় কেন?’; ‘গাছে কেন আমাদের জল দিতে হয়?’; ‘ডাক্তারবাবু রোগীর পেটে-বুকে ঠুকঠুক করে কেন?’; ‘তারাগুলো কোথা থেকে আসে?’; ‘একটা বাড়িকে চাকার উপরে বসিয়ে দিলে একটা ট্রাক্টর কি ওটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারত?’ — ছয় বছর বয়সের শিশু সাধারণত অজস্র যেসব প্রশ্ন করে এগুলি হল তার মধ্যে কয়েকটিমাত্র।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসা তখনও পর্যন্ত অধ্যয়ন করার এবং

প্রণালীবদ্ধভাবে জ্ঞান অর্জন করার আগ্রহকে নিশ্চিত করে না। একটা বিশেষ ব্যাপারে দ্রুত তার কৌতূহল জাগতে পারে, কিন্তু এই কৌতূহল তেমনই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, তার স্থলে দেখা দিতে পারে আরেকটি কৌতূহল। বাস্তব অবস্থার বিচিত্রতম ক্ষেত্রে যা ঘটে শিশু সেই সবেতেই কৌতূহলী। অধ্যয়নের বিকশিত রূপের ক্ষেত্রে পূর্বানুমিত থাকে নানা ব্যাপারের নির্দিষ্ট কতকগুলি ধরন ও দিক সম্পর্কে এক স্থিতিশীল কৌতূহল, যে ব্যাপারগুলি গণিত, মাতৃভাষা, জীববিদ্যা প্রভৃতির মতো স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলির অন্তর্বস্তু যোগায়।

কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের মধ্যে বেশ আগে থাকতেই এমন সব বহুমুখী ও অবিচল কৌতূহল আবিষ্কার করা যায়, যেগুলির ফলে জ্ঞানার্জনে সাফল্য ঘটে।

সুসংগঠিত শিক্ষণে শিশু প্রাক্-স্কুল বয়সের শেষেই সাধারণত রীতিমত স্থিতিশীল অবধারণাগত কৌতূহলের পরিচয় দেয়। প্রাক্-স্কুল শিক্ষণের অন্তর্বস্তু এই ব্যাপারে বুনিয়াদি বিষয়।

গবেষণায় দেখা যায় যে সব শিশুই গণিত, ভাষা, জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় কৌতূহল গড়ে তোলে, যদি তাদের অধ্যয়নে বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন টুকরো টুকরো তথ্য না দিয়ে এমন এক সুনির্দিষ্ট প্রণালীর জ্ঞান দেওয়া হয় যা বিভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে মূল সম্পর্কগুলিকে, তথা বাস্তবের প্রতিটি ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করে। গণিতে তা হল

গণনীয়ক ও গুণিতের মধ্যে, অংশ ও সমগ্রের মধ্যে, একক ও সমষ্টির মধ্যে সম্পর্ক; ভাষায়, একটি শব্দের গঠনরূপ ও তার অর্থের মধ্যে সম্পর্ক; জৈব প্রকৃতিতে, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের গড়নের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আর তাদের অস্তিত্বের অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি।

এই সমস্ত সাধারণ নিয়মের সঙ্গে একবার পরিচিত হয়ে গেলে শিশুরা সকৌতূহলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলির বহিঃপ্রকাশ খুঁজে বার করতে সমর্থ হয়; তাদের চারপাশের পৃথিবীর নতুন নতুন দিক খুলে যায় এবং তারা দেখতে শুরু করে যে আশ্চর্য সব জিনিস আবিষ্কার করার উপায় হল অধ্যয়ন।

অবিচল, বহুবিধ অবধারণাগত কৌতূহল শিশুর মধ্যে অধ্যয়ন করার বাসনা ও নিয়ত নতুন জ্ঞান অর্জনের বাসনাকে উৎসাহ যোগায়। অধ্যয়ন করার সামর্থ্যের ক্ষেত্রে পূর্বানুমিত হল, প্রথমত ও প্রধানত, শেখার জন্য যে শিক্ষামূলক দায়িত্ব সম্পূর্ণ করা হল তার মূল বিষয়টি সম্পর্কে উপলব্ধি এবং শিক্ষামূলক কাজ আর ব্যবহারিক দৈনন্দিন পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্যনির্ণয় করার সামর্থ্য। এমন ব্যাপার ঘটে যে প্রাক্-স্কুল বয়সের যে শিশু একটি গাণিতিক সমস্যা শোনে, সে সেটি সমাধান করার জন্য কোন কোন কাজ সম্পন্ন করতে হবে সে-বিষয়ে আগ্রহী হবে না বরং সমস্যাটির গণ্ডীর মধ্যে বর্ণিত পরিস্থিতির বিষয়ে আগ্রহী হবে। সে অস্বীকার করবে এই সমস্যাটি সমাধান করতে: ‘একজন মা চারটি মিষ্টি খেল, আর তার ছেলেকে দিল দুটি মিষ্টি। তারা দুজনে মিলে কটা

খেল?' এতে বর্ণিত 'অন্যায্যতায়' ক্ষুব্ধ হয়ে শিশু প্রশ্ন করবে: 'ও তার ছেলেকে এত কম দিল কেন? তাকেও তো সমান দেওয়া উচিত ছিল।' অন্যান্য ক্ষেত্রে, শিশু চেষ্টা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তরটা পেতে, এবং তার জন্য সে তার জানা যোগ-বিয়োগের প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যবহার করে এলোমেলোভাবে। দুটিই অধ্যয়ন করার অক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। শিশুকে বুঝতে হবে যে সমস্যায় বর্ণিত পরিস্থিতিটা একটা বাস্তব দৃষ্টান্তের বর্ণনা হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং একটা সম্পাদ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, যে বিষয়টা তাকে সাধারণভাবে সমস্যা সমাধান করতে শেখায়। তাকে এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা উত্তর দেওয়াটাই সমস্যাটি সমাধানের আসল কথা নয়, বরং আবারও, নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে শুরু করে, কোন পাটিগাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হবে সেটা সঠিকভাবে স্থির করতে শেখা এবং ভবিষ্যতে এই দক্ষতা ব্যবহার করতে শেখাই আসল কথা।

সবচেয়ে ছোট ও মাঝামাঝি প্রাক্-স্কুল বয়সে শিশুরা সাধারণত শিক্ষামূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, যদি এর ফলে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে খেলায়, ছবি আঁকায় বা তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক অন্য ধরনের কাজকর্মে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগানো যায়।

বিশেষভাবে সংগঠিত শিক্ষণ ঘটলে, বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা সেই সব শিক্ষামূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণের সামর্থ্য অর্জন করে, যার সঙ্গে তাদের আয়ত্ত করা দক্ষতাকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগাবার সম্ভাবনার কোনো

সম্পর্ক নেই। 'ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য' জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়ে ওঠে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে গোটা প্রাক্-স্কুল শৈশবেই শিক্ষামূলক খেলা প্রত্যক্ষ শিক্ষণের ধরনগুলির চেয়ে জ্ঞান অর্জনের পক্ষে বেশি কার্যকর উপায়। কিন্তু সবচেয়ে ছোট ও মাঝামাঝি প্রাক্-স্কুল বয়সে পার্থক্যটা খুবই বিরাট, অথচ অপেক্ষাকৃত বড় বয়সে অনেক কম। শিশুদের শিক্ষামূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্রমবর্ধমান সামর্থ্যের এটা একটা সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

শিক্ষামূলক কাজগুলির তাৎপর্য একবার বোঝার পর শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া কাজকর্মের উপায়গুলির দিকে মনোযোগ দিতে, এবং এই উপায়গুলিকে তাদের নিজস্ব করে নেওয়ার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করতে শুরু করে। প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা শেখে বস্তুগুলির উদ্দেশ্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, বর্ণনা, তুলনা ও গোষ্ঠী-বিভাগ, গল্প আর ছবির অন্তর্বস্তুর সুসংলগ্ন বিবরণ প্রচার, গোনা আর পাটিগাণিতিক সমস্যাগুলি সমাধান করার পদ্ধতি, ইত্যাদি। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতির সঠিকতা এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক তার কাছে যা দাবি করে সেগুলি পালন করা মূল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে, নির্দিষ্ট কিছু কিছু শিক্ষাগত চাহিদা তারা কতটা ঠিকভাবে পূরণ করেছে তার একটা মূল্যায়নের জন্য শিশুরা অহরহই প্রাপ্তবয়স্কদের শরণ নেয়।

শিশুদের কাজ সম্বন্ধে প্রাপ্তবয়স্কের মূল্যায়ন, এবং তার দিক থেকে বিভিন্ন শিশুর কাজের অগ্রগতি ও ফলাফলের

তুলনা থেকে শিশু নিজেই তার ক্রিয়াগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে, এবং নিজের জ্ঞান ও দক্ষতাগুলির মূল্যায়ন করতে শুরু করে, শিক্ষামূলক কাজগুলি সম্পন্ন করার ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-মূল্যায়নের অভ্যাস গড়ে তোলে। একটু বড় প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুরা অহরহ যেসব কাজকে অত্যধিক সহজ বলে মনে করে সেগুলি সম্পন্ন করবে অনিচ্ছাভরে, এবং চেষ্টা করবে সেই ধরনের কাজ পেতে যেগুলিকে তারা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার স্তরের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করে।

নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়নে শিশুরা প্রায়শই ভুল করে থাকে। কাজে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তখনও অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-মূল্যায়নের আত্মপ্রকাশই শিক্ষামূলক কাজকর্ম আয়ত্ত করার দিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, সেই কাজটা শেষ হয় স্কুলে শেখার কালপর্বে।

স্কুল শিক্ষণের মনোগত প্রস্তুতি

প্রাক্-স্কুল শৈশবে শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলগুলির অন্যতম হল স্কুল শিক্ষণের জন্য তার মনোগত প্রস্তুতাবস্থা।

স্কুলে ভর্তি হওয়া একটি শিশুর জীবনে এক সন্ধিক্ষণ, এক নতুন জীবনযাত্রা ও কাজকর্মের অবস্থার দিকে, সমাজে এক নতুন অবস্থানের দিকে, প্রাপ্তবয়স্কদের

সঙ্গে ও সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে নতুন নতুন সম্পর্কের দিকে পরিবর্তন।

যে শিশু স্কুলে যাচ্ছে তার অবস্থানের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তার লেখাপড়া একটা অবশ্যকরণীয়, সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ, এবং তার জন্য সে দায়ী তার শিক্ষক, স্কুল ও পরিবারের কাছে। একজন স্কুলপড়ুয়ার জীবন কঠোর নিয়মাবলীর এক ব্যবস্থাধীন, স্কুলগামী প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তার মূল অন্তর্বস্তু এখন জ্ঞানার্জন, সকল শিশুরই যা অভিন্ন লক্ষ্য।

শিক্ষার্থী আর শিক্ষকের মধ্যে অত্যন্ত বিশেষ ধরনের এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিক্ষক নিতান্তই এমন একজন প্রাপ্তবয়স্ক নন, শিশু যাঁকে পছন্দ করে অথবা অপছন্দ করে। শিশুর কাছে যেসব সামাজিক দাবি আছে তিনি তার প্রতিভূ। শিশু তার শিক্ষাগত প্রচেষ্টার জন্য যে নম্বর পায় সেটা তার প্রতি এক ব্যক্তিগত মনোভাবের অভিব্যক্তি নয়, বরং তার জ্ঞানের, তার শিক্ষাগত দায়দায়িত্ব সে কীভাবে পালন করেছে, তার একটা বিষয়গত পরিমাপ। বাধ্যতা বা অনুশোচনা কোনোটাই খারাপ নম্বরের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না।

ক্লাসের ভিতরের সম্পর্ক আর কিণ্ডারগার্টেনের গ্রুপে গঠিত সম্পর্কের মধ্যে আমূল পার্থক্য থাকে। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় পাওয়া নম্বর ক্লাসের মধ্যে শিশুর মর্যাদার প্রধান নির্ধারক হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে, কোনো বাধ্যতামূলক কাজে সম্মিলিত অংশগ্রহণ সাধারণ দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে

প্রতিষ্ঠিত এক নতুন ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর শেখার কাজ, অন্তর্বস্তু ও সংগঠন দু'দিক দিয়েই প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুর অভ্যাসগত কাজকর্ম থেকে অনেক আলাদা। জ্ঞানার্জন হয়ে ওঠে একমাত্র লক্ষ্য এবং সামনে উপস্থিত হয় পরিষ্কার ভাবে; খেলার বা উৎপাদনশীল কাজের আড়ালে তা লুকনো থাকে না। এই জ্ঞান শিশুরা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য অর্জন করে। শিশুরা স্কুলে যে জ্ঞানলাভ করে তার চরিত্র বিজ্ঞানসম্মত। শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক কাজের সংগঠনের মূল রূপ হল পাঠ, যার দৈর্ঘ্য মিনিট অবধি হিসাব করা। একটি পাঠে যা অত্যাবশ্যক তা হল সব শিশুই শিক্ষকের শিক্ষাদান অনুসরণ করবে, সেগুলি যথাযথরূপে পালন করবে, অন্যমনস্ক হবে না এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হবে না। শিক্ষার্থীর জীবন ও কাজকর্মের পরিস্থিতির এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিত্ব, তার মনোগত গুণ, জ্ঞান ও দক্ষতার উপরে অনেকখানি দাবি চাপায়।

শিক্ষার্থীকে অবশ্যই শিক্ষার প্রতি দায়িত্বপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করতে হবে, তার সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং স্কুল জীবনের চাহিদা ও নিয়মানুগ হতে হবে। শিক্ষাগতভাবে সফল হতে হলে তাকে হতে হবে উন্নত অবধারণাগত কৌতূহল আর যথেষ্ট বিস্তৃত মানসিক দিগন্তের অধিকারী।

যে গুণাবলীর সমাহার অধ্যয়ন করার সামর্থ্য গঠন করে, শিক্ষার্থীর পক্ষে সেটা একান্তই আবশ্যক। এর মধ্যে

আছে শিক্ষামূলক কাজের অর্থ কী, ব্যবহারিক কাজ থেকে তার পার্থক্য কী সে বিষয়ে বোধ, ক্রিয়া সম্পন্ন করার পদ্ধতি, আর আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-মূল্যায়নের দক্ষতা।

ইচ্ছাশক্তির বিভিন্ন দিকের বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা ছাড়া সে সচেতনভাবে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, আচরণকে স্ববশে রেখে শিক্ষাগত সমস্যা সমাধানের দিকে চালিত করতে পারে না, অথবা ক্লাসে সংগঠিত ধরনে আচরণ করতে পারে না। শিশুর বাহ্যিক আচরণ তো স্বতঃপ্রণোদিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবেই, শুধু তাই নয়, তার মানসিক কাজকর্ম, তার মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তিও স্বতঃপ্রণোদিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তাকে জানতে হবে পর্যবেক্ষণ করতে, শুনতে, স্মরণে রাখতে এবং শিক্ষক তাকে যেসব সমস্যা দেন সেগুলি সমাধান করতে।

প্রত্যেক বিজ্ঞান বাস্তব জগতের যে দিকটি অধ্যয়ন করে সেটিকে আলাদা করে দেখতে না পারলে শিশু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে না। জ্ঞান আহরণের জন্য দরকার হল মততন্ত্রগুলি ক্রমাগতভাবে আয়ত্ত করা এবং তদনুযায়ী বিমূর্ত, যুক্তিসংগত চিন্তাশক্তি বিকশিত করা।

স্কুল শিক্ষার জন্য শিশুর মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতাবস্থা এটা বোঝায় না যে মনস্তাত্ত্বিক যেসব বৈশিষ্ট্য একজন শিক্ষার্থীর পরিচয়বাহী, সেগুলি সে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই তার মধ্যে গড়ে উঠেছে। সেগুলি বিকাশলাভ করতে পারে একমাত্র স্কুল শিক্ষার প্রক্রিয়া চলাকালেই, তার অন্তর্গত

জীবন ও কাজকর্মের প্রণালীর প্রভাবে। শিশুর প্রাক্-স্কুল বিকাশের ফল হল এই বৈশিষ্ট্যগুলির শুধু আবশ্যিক পূর্বশর্ত, স্কুল জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া আর প্রণালীবদ্ধভাবে লেখাপড়া শুরু করার জন্য যা তার পক্ষে যথেষ্ট। এই আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলির মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হল স্কুল যাওয়ার বাসনা, গুরুগম্ভীর কাজকর্মে ব্যাপৃত হওয়া ও শেখার বাসনা, যে বাসনাটা প্রাক্-স্কুল বয়সের শেষ দিকে শিশুদের ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে দেখা দেয়। এটা বিকাশের এক সংকটের সঙ্গে জড়িত, জড়িত এই ঘটনার সঙ্গে যে শিশু অনুভব করতে শুরু করে যে প্রাক্-স্কুল বয়সের একটি শিশু হিসেবে তার অবস্থান তার অধিকতর সাধ্যসামর্থ্যের সঙ্গে আর মানানসই নয়, প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে উপায় খেলার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় সে আর তাতে সন্তুষ্ট নয়। মনস্তত্ত্বগতভাবে সে খেলার স্তর অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠেছে, এবং সে মনে করে যে স্কুলে যাওয়ার পদমর্যাদা বয়ঃপ্রাপ্তির দিকে একটা পদক্ষেপ, শিক্ষালাভ করাটা একটা দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার যাকে প্রত্যেকেই মর্যাদা দেয়।

কিণ্ডারগার্টেনে হাজার হাজার শিশুকে প্রশ্ন করে দেখা গেছে যে তাদের সকলেই, ক্বচিৎ কিছু ব্যতিক্রম বাদে, স্কুলে যাওয়া শুরু করতে চায় এবং কিণ্ডারগার্টেনে থাকতে চায় না। এই বাসনার অনেকগুলি আলাদা আলাদা বুনিয়াদ আছে। অনেক শিশুই বলে যে অনেক কিছু শেখাটা হল স্কুলের একটা আকর্ষণীয় দিক। তারা কেন

স্কুলে যেতে চায় এই প্রশ্নের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণসূচক উত্তর উদ্ধৃত করা হল। 'স্কুলে পড়তে শেখা যায়, অনেক কিছু জানতে পারা যায়,' 'কিণ্ডারগার্টেনে তো আমি থেকেছিই, কিন্তু স্কুলে যাই নি কখনও। ওরা ওখানে কঠিন সব অঙ্ক করতে দেয়, তবে আমি শিখে যাব। বাবাও আমাকে শক্ত শক্ত অংক দেয়, সেগুলি সব আমি... না, সবগুলি আমি করতে পারি না'; 'স্কুলে শেখা যায়, কিন্তু কিণ্ডারগার্টেনে তো শুধু খেলা, বেশি কিছু শেখা যায় না।'

অবশ্য, শুধু শেখার সুযোগই শিশুদের আকর্ষণ করে না। স্কুল জীবনের বাহ্যিক দিকগুলি প্রাক্-স্কুল বয়সের কাছে অত্যন্ত আকর্ষক: ডেস্কের সামনে বসা, ঘণ্টা বাজা, বিরতি, নম্বর, বইখাতার ব্যাগ, পেনসিলের বাক্স প্রভৃতি পাওয়া ইত্যাদি। এই সমস্ত বাহ্যিক বিষয়ে আগ্রহটা শেখার বাসনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এরও ইতিবাচক তাৎপর্য আছে, অন্য লোকদের মধ্যে ও সাধারণভাবে সমাজে শিশুর নিজস্ব পদমর্যাদা পরিবর্তনের সাধারণ বাসনাকে তা প্রকাশ করে।

স্কুলের জন্য শিশুর মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ঐচ্ছিক বিকাশের একটা পর্যাপ্ত স্তর। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে এই স্তরটি পৃথক, কিন্তু সাত বছর বয়সী শিশুদের যেটা বিশিষ্ট লক্ষণসূচক তা হল প্রেষণাগুলির সমন্বয়, যা তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করে তোলে এবং একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকেই তাদের যদি সাধারণ কাজকর্মে যোগ দিতে হয় আর স্কুল ও শিক্ষকের

চাহিদা প্রণালী মেনে নিতে হয় তা হলে তা অত্যাবশ্যক।

অবধারণাগত কাজকর্মের অবাধ চরিত্র যদিও প্রাক্-স্কুল বয়সের শিশুদের মধ্যে গড়ে উঠতে শুরু করে, তবুও শিশু স্কুলে যাওয়া শুরু করার মুহূর্তে তা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় না: অবিচল স্বতঃপ্রবৃত্ত মনোযোগের একটা প্রসারিত কালপর্ব বজায় রাখা, বিপুল পরিমাণ মালমশলা স্মৃতিজাত করে রাখা প্রভৃতি শিশুর পক্ষে দুরূহ হয়। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষণের বেলায় এই বিষয়গুলি গণ্য করা হয় এবং শিক্ষণ সংগঠিত হয় এমন ভাবে যাতে অবধারণাগত কাজকর্মের অবাধ দিকটির উপরে দাবি বাড়ে ক্রমে ক্রমে, শেখার প্রক্রিয়ারই মধ্যে তার ত্রুটিহীনতার সমানুপাতে।

মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুর স্কুলের জন্য প্রস্তুতাবস্থার মধ্যে থাকে অনেকগুলি সংশ্লিষ্ট দিক। যে শিশু প্রথম শ্রেণীতে যাওয়া শুরু করছে তার চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে কিছু পরিমাণ জ্ঞান থাকা দরকার: বস্তুসমূহ ও সেগুলির গুণ সম্পর্কে, চেতন ও অচেতন প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলি সম্পর্কে, মানুষ ও তাদের কাজ সম্পর্কে, সমাজজীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে, ‘কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ’ সে সম্পর্কে, অর্থাৎ আচরণের নৈতিক মান সম্পর্কে। কিন্তু এই জ্ঞানের পরিমাণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার গুণ, প্রাক্-স্কুল শৈশবে গঠিত ভাবধারণাগুলির স্বচ্ছতা ও সামূহিকতা।

প্রত্যেক কাজেরই মর্যাদা আছে। একটি শিশু তার কাজের জন্য যে নম্বর পায় তা হল সে তার শিক্ষাগত

দায়দায়িত্ব কীভাবে পালন করেছে তার পরিমাপ। প্রায়শ্চিত্ত, অনুশোচনা বা অন্যান্য প্রয়াসে সাফল্য কখনোই খারাপ নম্বর পাওয়ার ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারে না। শিক্ষকের প্রশংসাকে বা অঙ্কে প্রকাশিত নম্বরগুলিকে শিশু গ্রহণ করে তার গুণাবলীর সপ্রশংস স্বীকৃতি হিসেবে। শেখার কাজ শিশুর মধ্যে জাগ্রত করে স্কুলে ভালো ফল করার বাসনা, যা তাকে তার চারপাশের লোকের স্বীকৃতি এনে দেয়। জ্ঞানের প্রতীকগুলিকে শিশুরা প্রায়শই জ্ঞানেরই প্রতিকল্প করে তোলে। তারা প্রতীক জড়ো করার চেষ্টা শুরু করে: শুরু করে তাদের পাওয়া তারা আর 'পাঁচের' সংখ্যাগুলি গুনতে (সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫ হল সর্বোচ্চ নম্বর — অনুঃ)। যারা বেশি সফল তারা এতে আনন্দে উদ্বেল হয় আর বড়াই করতে শুরু করে, আর যারা কম সফল তারা মনমরা হয়ে পড়ে, ঈর্ষান্বিত হতে শুরু করে।

স্কুলের কাজকর্মে একটা তাৎপর্যপূর্ণ স্থান পাওয়ার জন্য শিশুর দাবির ফলে কখনও কখনও অসুস্থ বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। অন্যদের অপরিপূর্ণতা, ব্যর্থতা দেখে শিশু বোধ করতে পারে যে সে উঁচু দরের। এই মোহ কাটিয়ে ওঠায়, ব্যর্থতা ও অহমিকা কাটিয়ে ওঠায় শিশুদের পথনির্দেশ করা দরকার বাবা-মার দিক দিক থেকে।

একটি শিশুর জীবনে এই দুরূহ পর্যায়টি সম্বন্ধে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে আমাদের অবহিত থাকতে হবে, এবং নিয়ত প্রস্তুত থাকতে হবে শিশুকে সমর্থন যোগানোর জন্য, নিজের আচরণ বেছে নিতে তাকে আরও ভালো নৈতিক নীতিনির্দেশ দেওয়ার জন্য। স্কুলে একটি শিশুর

ভালো ফল করা বা খারাপ ফল করার ব্যাপারে শিশুর প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের মনোভাবের ভিত্তিটা যদি হয় একটি শিশুর সঙ্গে আরেকটি শিশুর তুলনা করা, তা হলে সেই শিশুটি একান্তভাবে নিজেরই জন্য সাফল্যের লক্ষ্যাভিমুখী হতে পারে এবং ক্লাসের সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এর পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে তার আচরণে। প্রাপ্তবয়স্করা যদি শিশুকে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখায়, অন্যের সাফল্যে অকৃত্রিমভাবে আনন্দিত হতে ও তার ব্যর্থতার দুঃখের ভাগ নিতে শেখায়, তা হলে শিশুর মধ্যে তা সাথিত্ব ও সংহতির প্রয়োজনকে বিকশিত করে।

একটি শিশুর বিকাশ যত কষ্টকরই হয়ে থাকুক না কেন, চূড়ান্ত বিচারে স্বাভাবিক মনোগত বিকাশের উপলব্ধির ভিত্তিতে এক স্থিতিশীল, সুবিবেচিতভাবে পরিচালিত লালন-পালন জয়যুক্ত হবেই। প্রাথমিক স্কুলগামী বয়সের একটি শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্য হল শুধু ভাবাবেগগতভাবেই নয়, 'তত্ত্বগতভাবে'ও নিজেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। এই বয়সে শিশু গৃহীত সামাজিক রীতিপ্রথাগুলির সঙ্গে নিজের ক্রিয়াকে পরস্পরসম্পর্কিত করার দক্ষতা অর্জন করে এবং নিজের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করে বিষয়গতভাবে।

আধুনিক কালের প্রাথমিক স্কুল পড়ুয়া মনস্তাত্ত্বিকভাবে শেখার কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও, এবং স্কুলে ভালো ফল করা তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, স্কুলের বাইরে তার জীবন তখনও চলতে থাকে। শহরের শিশু

তার বন্ধুদের সঙ্গে খেলে তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির অঙ্গনে, তাদের সঙ্গে পথে ঘোরে; গ্রামের শিশু তার সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশা করে নিজের উঠোনে, তাদের সঙ্গে ছুটে যায় মাঠে, বনে বা নদীর দিকে। এই বয়সে সমস্ত শিশু একে অপরের বাড়ি যেতে শুরু করে। মেলামেশা হয় সহজতর, শিশু এখন নিজেই তার পছন্দমতো লোকেদের সঙ্গে নিজের মোকাবিলাগুলিকে সংগঠিত করতে সক্ষম। স্কুলের বাইরে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় শিশুদের পছন্দ-অপছন্দ দিয়ে। একই বয়সের আরেকটি শিশুর প্রতি পছন্দ রীতিমত স্থিতিশীল হয়, এবং এই পছন্দ করার মধ্যে শিশু প্রতিপন্ন করে তার বাছাই আর নিজেকে, দুটোই। আরেকটি শিশুকে ভালো লাগার অধিকারের সপক্ষে সে দাঁড়ায়, এমন কি সে প্রাপ্তবয়স্কদের বিরোধিতাও করতে পারে, যদি তারা তার পছন্দ অনুমোদন না করে। শিশু তার মানবিক অধিকারের ব্যাপারে যে বিশেষ একটা অবস্থান গ্রহণ করে, এর মধ্যে সেটা দেখা যায়।

শিশুর বিকাশ চলাকালে সে অধিকার ও দায়িত্বগুলি ভোগ করে নানাভাবে। শিশু সোৎসাহে তার অধিকারগুলির দিকে মনোনিবেশ করে, এবং প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সেগুলি সীমিত হলে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করে। দায়িত্বের কথা বলতে গেলে, সেগুলি সাধারণত তাকে নিরুৎসাহ করে ফেলে (সে দোকানে যেতে চায় না, সংসারের কাজ করা তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়)। তার অধিকার জাহির করার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত 'আমি' জাহির করা এইভাবে শিশুর মনে নিজের কর্তব্য পালন করে নিজের ব্যক্তিগত

'আমি' জাহির করার চেয়ে অনেক বেশি বোধগম্য। সে প্রায়শই বোধ করে যে দায়িত্বগুলি হল তার ইচ্ছার উপর বলপ্রয়োগ, একটা আবশ্যকতা নয়। অবশ্য স্নেহশীল বাবা-মারা যাদের প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট করেছেন, শুধু সেই সব শিশুই প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্কদের অনুরোধের বিরোধিতা করে। যে পরিস্থিতিতে তার বাবা-মার সত্যিই সাহায্য দরকার, সেখানে সাত বছর বয়সের শিশু তার সাধ্যায়ত্ত দায়িত্বগুলি ভালোভাবেই পালন করতে পারে। এই শিশু জীবনের জন্য নিঃসন্দেহে ভালোভাবে প্রস্তুত, এবং সামাজিকভাবে বেশি বিকশিত।

শিশু যখন তার নিজ লিঙ্গগোষ্ঠী মর্যাদা তুলে ধরতে চেষ্টা করে, তখনও সে তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা প্রতিপন্ন করে। স্কুলগামী বয়সের আগে তারা যেমন করত তার চেয়ে আরও বেশি পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে শিশুরা ছেলে আর মেয়েদের পৃথক পৃথক গোষ্ঠী গঠন করে। শিশুর আভ্যন্তরিক 'আমি' আগেকার বছরগুলির তুলনায় আরও বেশি যথাযথভাবে নির্ধারিত হয় এক বিশেষ লিঙ্গগোষ্ঠী সদস্য হওয়ার অনুভূতি দিয়ে। এই সময়টায় শিশু তার ভক্তিভাজন। কোনো প্রাপ্তবয়স্ককে বা একই লিঙ্গগোষ্ঠী একটু বড় কোনো শিশুকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে নিজের জন্য একটা 'আদর্শ' মডেল খাড়া করে। ভাবাবেগতভাবে যে ব্যক্তিটির প্রতি সে অনুরক্ত তার গুণগুলিকে শিশু নেয় অনুকরণের মধ্য দিয়ে।

এক বিশেষ লিঙ্গ, বয়স ও জাতিসত্তার প্রতিনিধি হিসেবে অন্য লোকেদের মধ্যে নিজের সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে

সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শিশু নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করে টাইপ হিসেবেও ('আমরা ছেলে', 'আমরা ছোট ছেলেমেয়ে', 'আমরা স্কুল পড়ুয়া', 'আমরা রুশ') এবং ব্যক্তিমানুষ হিসেবেও ('আমি', 'আমিই অমুক', 'আমিই হব অমুক')। সে বুঝতে শুরু করে যে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার বহিঃপ্রকাশে আলাদা, কারণ প্রত্যেকেরই জীবন সম্পর্কে নিজস্ব বিশেষ অভিমত আছে। এরই মধ্যে লুকিয়ে থাকে একটা পূর্বলক্ষণ যে, যে কোনো মুহূর্তে তার ভাগ্যে এমন একটা কিছু ঘটবে যা তাকে সক্ষম করে তুলবে আরও ভালোভাবে অন্যদের বুঝতে ও নিজেকে 'চিনতে'।

সামাজিক পদমর্যাদায় যে একজন প্রাথমিক স্কুল পড়ুয়া, সেই শিশুর ব্যক্তিত্বের সমস্ত অর্জিত কৃতিত্বই তার ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় জন্মের অগ্রদূত, যখন গড়ে উঠতে শুরু করবে তার ব্যক্তিগত বিশ্ববীক্ষা আর জীবনে তার গৃহীত অবস্থান।

উপসংহার

জীবনের প্রথম বছরগুলিতে শিশুর বিকাশের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঠিকভাবে বোঝা যেতে পারে একমাত্র তখনই, আমরা যদি তিনটি বিষয়কে গণ্য করি: মানসিক বিকাশ নির্ধারক পূর্বশর্তসমূহ (জন্ম সম্বন্ধীয় টাইপ, সহজাত প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য); সুনির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থার আলোকে পরীক্ষিত মনোগত বিকাশের নিয়মগুলি; শিশুর নিজের আভ্যন্তরিক অবস্থান।

সামাজিক অবস্থা এবং শিশুর যে প্রাতিস্বিক অবস্থান গড়ে উঠছে সেটা স্বাভাবিক শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়ামক।

একটি শিশু মানুষ হয়ে উঠতে পারে তার একমাত্র কারণ সে অন্য লোকেদের সঙ্গে বাস করে। তার চারপাশের লোকেদের প্রতি শিশুর ভাবাবেগগতভাবে রঞ্জিত মনোভাবের পটভূমিতেই আমরা যাকে অর্জন বলে মনে করি, মানব ব্যক্তিত্বের প্রথম জন্ম নির্ধারক সেইসব গুণগুলির গঠন ঘটে।

জীবনের প্রথম বছরগুলি শিশুর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেই সময়েই ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ স্থাপিত

হয়। আমার দুই ছেলের প্রাতিস্বিক বিকাশের দিকে সযত্ন ও সতত মনোযোগ আমাকে সর্বপ্রকার যাথার্থ্যের সঙ্গেই এই কথা বলতে সক্ষম করে তুলেছে যে শৈশবে যেসব ইতিবাচক ব্যক্তিগত গুণাবলী গঠিত হয়েছিল, সেগুলি আজও স্পষ্ট-প্রতীয়মান, এবং আমি আশা করি পরবর্তী জীবনে সেগুলি যথার্থভাবেই তাদের মূল্যাভিমুখিনতা নির্ধারণ করবে। কিন্তু, শৈশবে যেসব খামতির দিকে আমাদের পরিবার বিশেষ মনোযোগ দেয় নি, সেগুলিও আজ স্পষ্ট-প্রতীয়মান। কাউকে তার সুনির্দিষ্ট চরিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি ভিন্ন একটা অবস্থান গ্রহণ করানোটা এই চরিত্রকে শৈশবেই গড়ে-পিটে রূপ দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কাজ।

গঠনকালীন, অপেক্ষাকৃত কম বয়সে একজন মানুষ নিজের জন্য নিজেকে ঢেলে সাজায়: সে গড়ে তোলে তার নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা, নিজের মতপ্রত্যয় রক্ষার জন্য মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে, নিজের আচরণ বেছে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মানুষ লড়াই করে নিজের ব্যক্তিত্বের সত্যিকার উন্মেষের জন্য।

শারীরিক জন্ম ঘটে এক বিশেষ বছরে, বিশেষ মাসে, বিশেষ দিনে ও ঘণ্টায়; কিন্তু ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় জীবনের বহু বছর ধরে, দৈনন্দিন অস্তিত্বের মধ্যে, উত্থানপতনের মধ্যে, অতিক্রম আর প্রশ্রয়ের মধ্যে, নিজের প্রতি সানন্দ সন্তোষ আর নিজের দুর্বলতায় হতাশার মধ্যে।

অতি শৈশবে, শৈশবকালে ও প্রাক্-স্কুল বয়সে শিশুর বিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে এই বইটিতে। অবধারণার প্রক্রিয়ায় বয়ঃগত ও ব্যক্তিগত পার্থক্য, তথা প্রাক্-স্কুল শৈশবে ব্যক্তিত্বের উন্মেষে বৈশিষ্ট্যগুলির দিকেও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে শিশুদের প্রধান ক্রিয়া খেলা নিয়ে, এবং তাদের চিত্রলেখমূলক, শিক্ষামূলক ও ক্রিয়ামূলক কার্যকলাপ। বইটি বিস্তৃত পরিসরের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য লিখিত — প্রাক্-স্কুল শিক্ষায় বিশেষজ্ঞবৃন্দ, শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মনোবিজ্ঞানী, পিতা-মাতা এবং শিশুর বিকাশ সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের সকলের জন্য।